চন্দ্রলেখা অন্তর্ধান রহস্য



অভিরূপ সরকার

চন্দ্রলেখা অন্তর্ধান রহস্য

অভিরূপ সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

CHANDRALEKHA ANTARDHAN RAHASHYA
by
Abhirup Sarkar

রচনাকাল
নভেম্বর, ২০১৮—ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০২০
প্রচ্ছদ : সুমন
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৫

পরন্তপ ও অগ্নিরূপকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শংকর মণ্ডলের আনুকূল্যে গোয়েন্দা উপন্যাস লেখাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গত বছরের বইমেলায় একই মলাটের মধ্যে আমার দুটো গোয়েন্দা উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন তিনি, এবছর আরও একটা প্রকাশ করলেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান উপন্যাসটির একটি প্রাথমিক খসড়ার ওপর আলাদা আলাদা করে অনেকগুলি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন পরন্তপ বসু এবং অগ্নিরূপ সরকার। তাঁদের উপদেশগুলো মেনে নিয়ে উপন্যাসটির বেশ খানিকটা রদবদল ঘটিয়েছি। এই বইটি তাঁদের দুজনকে উৎসর্গ করলাম।

আমার আগের দুটি গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। চারাগাছের মতো নবীন লেখনীও কিছুটা প্রশ্রয়ের অপেক্ষা রাখে।

অবশ্য সমস্ত উৎসাহ-উপদেশ-প্রশ্রয় সত্ত্বেও বর্তমান উপন্যাসে যে ত্রুটিগুলো রয়ে গেল, বলাই বাহুল্য, সেগুলো আমার নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে।

অভিরূপ সরকার

ঝর্ণা দলুই-এর কথা

আমরা, ক্লাশ থ্রি আর ফোরের মেয়েরা, আজ নদীর ধারে বনভোজনে এসেছি। সব সুদ্ধু বাইশ জন মেয়ে। ক্লাশ থ্রির দশ জন, ক্লাশ ফোরের বারো জন। সঙ্গে চার জন দিদিমনি। বড়দিদি, ছোড়দিদি, সোনাদিদি আর মেমদিদি। আমাদের ইস্কুলের নাম বনবীথি। ইস্কুলটা যখন শুরু হয়েছিল তখন বড়দিদি আর ছোড়দিদি এই দুজন দিদিমনিই পড়াত। কেজি থেকে ক্লাশ টু, ওই পর্যন্তই পড়ানো হতো তখন। বড়দিদি আসত হাসনাবাদের ওদিক থেকে, ছোড়দিদি বসিরহাট থেকে। পরে ওপরের দিকে আরও দুটো ক্লাশ বাড়ল। দুজন নতুন দিদিমনিও এল। প্রথমে সোনাদিদি তারপর মেমদিদি। সোনাদিদির বাড়ি সোলাডাঙা। মেমদিদি স্কুলের পেছনেই থাকে। সোনাদিদির হাতের কাজ খুব সুন্দর। সেলাই-ফোঁড়াই, উলবোনা, আলপনা দেওয়া এসব সোনাদিদিই শেখায়। আর মেমদিদি শেখায় ইংরিজি আর অঙ্ক। সবাই বলে মেমদিদি জ্ঞানের পাহাড়। যে অঙ্কই দাও না কেন ঠিক করে দেবে। আর ওর মতো ইংরিজিও কেউ কোনও দিন বলতে পারবে না। তাছাড়া মেমদিদি দেখতে কী সুন্দর, ঠিক মেমদের মতো। মেমদিদির কাছে ইংরেজি শেখার জন্য এখন অনেক মেয়ে এখানে পড়তে আসে। তারা সকলেই খুব গরিব। গরিব না হলে এই ইস্কুলে কেউ ভর্তি হতে পারে না।

নদীর ধারে যেখানে ঘন হোগলার বন আছে তার গায়ে একটু একটু কাশ ফুল ফুটেছে। তার মানে পুজো আর দেরি নেই। হোগলা বনের পাশে মস্ত বালিয়াড়ি। অনেকটা জায়গা জুড়ে শুধু বালি আর মাটি আর ছোট ছোট ঘাস। এখানেই বনভোজন হবে। সত্যিকারের বনভোজন। জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠকুটো নিয়ে আসবে সফিকুলকাকা আর গণেশ। ওরা দুজনেই বনবীথি-তে কাজ করে। সফিকুলকাকার অনেক বয়েস, কিন্তু গায়ে খুব জোর। রাত্তিরে ইস্কুল পাহারা দেয়। সফিকুলকাকা খুব গম্ভীর, একটুও হাসে না। গণেশ আমাদের মতোই ছোট। মেমদিদি বলে, কাজ না করে গণেশের ইস্কুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু বনবীথিতে শুধু মেয়েরা পড়ে। সেখানে গণেশ কী করে পড়বে? আর ছেলেদের জন্য বনবীথির মতো কোনও ইস্কুল এদিকে নেই। তাই সন্ধেবেলা, মেয়েদের ইংরিজি ক্লাশের পরে, মেমদিদি গণেশকে আলাদা করে বাংলা আর অঙ্ক শেখায়। ইংরেজি পড়াতে এখনও শুরু করেনি।

সফিকুলকাকা আর গণেশ ছাড়াও রেনুমাসি আর কল্পনামাসি আমাদের সঙ্গে এসেছে। রেনুমাসি ইস্কুলে মিড ডে মিল রান্না করে, কল্পনামাসি জোগান দেয়। ওরাই বনভোজনের রান্না করবে। খিচুড়ি, বেগুনি, লাবড়া আর শেষ পাতে চাটনি। আমরা সবাই পেট ভরে খাব। ভীষণ মজা হচ্ছে। শুধু একজন আজ আমাদের সঙ্গে বনভোজনে আসেনি। সে গৌরদাদা। গত তিন দিন ধরে গৌরদাদার খুব জ্বর, ইস্কুলেই আসতে পারছে না, বনভোজনে আসবে কী করে? গৌরদাদা ভীষণ ভাল লোক। আমাদের খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে ইস্কুল শেষ হলে আমরা, ক্লাশ ফোরের কয়েকজন মেয়ে, গৌরদাদার সঙ্গে গৌরদাদার বাড়িতে যাই। ইস্কুলের পাশেই গৌরদাদার বাড়ি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গৌরদাদা আমাদের মুড়ি-বাতাসা খাওয়ায়, ভূতের গল্প বলে। খাতায় ছবি এঁকে দেয়। গৌরদাদা খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। বনবীথির আপিসে কাজ করে গৌরদাদা।

ইছামতী নদী এখানে খুব চওড়া। ওপারের গাছপালাগুলো খুব ছোট দেখায়। ওপারে বাংলাদেশ, এপারে ভারত। শুনেছি নদীটা মাঝখান থেকে দুই দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। আমার বাবা নদীতে মাছ ধরে। নৌকো নিয়ে মাঝনদী অব্দি যায়, কিন্তু তার বেশি যায় না। এদিকের মাঝিদের ওদিকের জলে যাওয়া বারণ। আজকাল দাদাও বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যায়। হাসনাবাদে বেচু হালদারের মাছের আড়ত আছে। বাবা আর দাদা সেখানে মাছ বিক্রি করে। বেচু হালদার বাবাকে খুব সম্মান করে। বলে, এ তল্লাটে কিরণের মতো মাছ-

ধরিয়ে আর নেই। দাদাও ভাল মাছ ধরে, তবে বাবার মতো হতে দেরি আছে। দাদা আমার থেকে আট বছরের বড়, আমি বারো, দাদা কুড়ি। পাঁচ বছর আগে আমার কাকা মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। সবাই বলে, স্রোতের টানে কাকা সমুদ্রে চলে গিয়েছে। সমুদ্রে চলে গেলে আর কেউ ফিরতে পারে না। কাকিমা আর ওর ছেলে মন্টু আমাদের সঙ্গে থাকে। কাকিমা মন্টুকে নদীতে যেতে দেয় না। মন্টু বনবিহারীকাকার চায়ের দোকানে কাজ করে।

আমাদের গ্রামের নাম নিমফুল। সবাই বলে খুব সুন্দর নাম। গ্রামে ঢোকার মুখে অনেকগুলো নিমগাছ আছে। হয়ত সেই জন্য এইরকম নাম হয়েছে। গাছগুলো খুব পুরোনো। খুব ছায়া দেয়। আমাদের গ্রামের একদিকে সোলাডাঙা, অন্যদিকে বড়রাস্তা। গ্রাম আর সোলাডাঙার মাঝে আমাদের বনবীথি ইস্কুল। সোলাডাঙা পেরিয়ে আরও কিছুক্ষণ হাঁটলে ইছামতী, আর বালিয়াড়ি, আমরা আজ যেখানে বনভোজন করতে এসেছি। অন্যদিকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে নিমগাছগুলো পেরুলেই বড়রাস্তা। সেই রাস্তা টাকি-হাসনাবাদের দিকে চলে গেছে। আমি হাসনাবাদ অব্দি গেছি। শুনেছি ওই রাস্তাটা ধরে আরও অনেক দূর গেলে কলকাতা পৌঁছে যাওয়া যায়। আমি কখনও কলকাতায় যাইনি। গৌরদাদা গেছে। বলেছে, সে এক আশ্চর্য শহর। পথে এত লোক চলে যে হাঁটতে গেলে গায়ে গায়ে লেগে যায়। গৌরদাদা বলে, রাস্তা কোথাও যায় না, যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। তবে ওই টাকি-হাসনাবাদের রাস্তা ধরে যারা একবার কলকাতা চলে গেছে তারা আর আমাদের গ্রামে ফিরে আসবে না। গৌরদাদা মাঝেমাঝে কী যে বলে আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

আমাদের গ্রামটা আমার খুব ভাল লাগে। বনবীথি ইস্কুলটাও। ইস্কুলে আমার অনেক বন্ধু আছে। টিপিনের সময় আমরা চোর-চোর খেলি, চু কিৎ কিৎ খেলি। বড়দিদি বলেছে কিছুদিন পরে ইস্কুলে একটা ভলিবল কেনা হবে, আমরা ভলিবল খেলব। ইস্কুলের সব ভাল শুধু একটা জিনিস বাদে। সেই জিনিসটার কথা আমি জানি, আমার বন্ধুরা জানে, এমনকি গৌরদাদাও জানে। কিন্তু দিদিমনিরা জিনিসটার কথা স্বীকার করতে চায় না। ব্যাপারটা খুলে বলি।

আসল কথাটা হল, আমাদের ইস্কুলে ভূত আছে। যখন ইস্কুলে ভর্তি হলাম তখন থেকেই এটা শুনে আসছি। যাদের বাড়ি ইস্কুলের কাছে তারা রাত্তিরে অনেক কিছু দেখেছে। অনেক রাত্তিরে ইস্কুলের ভেতরে কাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়। ইস্কুলের বারান্দায় তালগাছের মতো লম্বা আর মোষের মতো কালো কারা যেন হেঁটে বেড়ায়। আগে এসব কথা ততটা বিশ্বাস হতো না, কিন্তু ছন্দা বাগের ঘটনাটার পর থেকে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। ছন্দা আমাদের ক্লাশেই পড়ে। ওর সঙ্গে আমার খুব একটা ভাব নেই, তাছাড়া বয়েসেও ও আমাদের থেকে খানিকটা বড়। ছন্দা খুব খারাপ মেয়ে। পড়াশোনা করে না, খারাপ খারাপ কথা বলে, মাঝে মাঝে ক্লাশে খুব নোংরা ছবি এনে দেখায়। ও নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেটও খায়। আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে আমার বন্ধুরা অনেকে দেখেছে। ছন্দার একটা দল আছে। তারা কেউই আমাদের ইস্কুলের নয়, তবে সবাই খুব খারাপ। সেই দলে কয়েক জন ছেলেও আছে। ছন্দা টিপিনের সময় ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সেই দলের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। ওখানে ওরা বোধহয় সিগারেটও খায়।

আমাদের ইস্কুলটা খুব কড়া। টিপিনের সময় ইস্কুল থেকে বেরোনোর নিয়ম নেই। বেরিয়ে ধরা পড়লে কড়া শাস্তি। কিছুদিন আগে টিপিনের সময় বেরোতে গিয়ে ছন্দা ধরা পড়ে গেল। ব্যাপারটা সফিকুলকাকার প্রথম চোখে পড়ে— ছন্দা পেছনের পাঁচিল টপকে ইস্কুলের বাইরে যাবার চেষ্টা করছে। সফিকুলকাকা ছন্দাকে বড়দিদির কাছে ধরে নিয়ে যায়। আমাদের ইস্কুলের পেছন দিকে বাগানের মধ্যে একটা গুদোম ঘর আছে। সেখানে মিড ডে মিলের চাল ডাল মজুত রাখা হয়। ঘরটা খুব গরম, অনেক ওপরে একটাই জানলা। জানলা না বলে তাকে ঘুলঘুলি বলাটাই ঠিক। মেয়েরা কেউ খুব খারাপ কোনও কাজ করলে তাকে ওই ঘরে আটকে রাখা হয়। তারপর ইস্কুল ছুটির সময় তাকে আবার বাইরে বের করে আনা হয়। ছন্দার নামে অনেকদিন ধরেই অনেক নালিশ বড়দিদির কাছে জমা পড়ছিল। সাধারণত বড়দিদি কাউকে ওই ঘরে আটকে

রাখতে বলে না। কিন্তু ছন্দার ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে বড়দিদি সফিকুলকাকাকে বলল, ইস্কুল ছুটি হওয়া অব্দি ছন্দাকে ওই ঘরে আটকে রাখো।

অন্য কেউ হলে হয়ত কান্নাকাটি করে বড়দিদির কাছে ক্ষমা চাইত। আর বড়দিদিও তাকে মাফ করে দিত। কিন্তু ছন্দার একটা আশ্চর্য জেদ আছে, সে মুখ টিপে সব শাস্তি সহ্য করবে কিন্তু কিছুতেই মাথা নোয়াবে না। সফিকুলকাকার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নিচু করে গুদোম ঘরে গিয়ে ঢুকল, সফিকুলকাকাও বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। আমরা আর তার কোনও সাড়াশব্দ পাইনি।

সবই ঠিকমত চলত যদি ইস্কুল ছুটির পর সফিকুলকাকা গুদোম ঘরের দরজা খুলে ছন্দাকে বার করে আনত। কিন্তু সেদিনই বসিরহাট থেকে সফিকুলকাকার এক বন্ধু এসে হাজির। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সফিকুলকাকা ভুলেই গেল যে ছন্দা ইস্কুলের পেছন দিকের বাগানে গুদোম ঘরে আটকে রয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, বড়দিদিও সেদিন ছন্দার ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়ে ইস্কুল ছুটির পর বাড়ি চলে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে আমরাও সকলে বাড়ি ফিরে গেলাম। সফিকুলকাকার ঘরটা ইস্কুলের মেন গেটের পাশে। সফিকুলকাকা সেখানে রাত্তিরে থাকে, ইস্কুল পাহারা দেয়। সন্ধেবেলা বন্ধু চলে যাবার পর সফিকুলকাকা রান্না চড়াল, খাওয়া দাওয়া সারল, তারপর রোজকার মতো লাঠি ঠকঠক করতে করতে সারা ইস্কুলটা এক পাক ঘুরে নিয়ে গেটের সামনে খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়ল। সফিকুলকাকা যখন টহল দিচ্ছিল, তখন যদি ছন্দা ঘরের ভেতর থেকে চেঁচাত, তাহলে নিশ্চয় সফিকুলকাকার মনে পড়ে যেত ছন্দা ঘরের ভেতর আটকে রয়েছে। কিন্তু ছন্দার জেদ, সে কিছুতেই চেঁচাবে না। তাই সফিকুলকাকারও কিছু মনে পড়ল না। পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছন্দার কথাটা সফিকুলকাকার মনে পড়ল। তখন দরজা খুলে দ্যাখে ছন্দা মেঝের ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে।

পরদিন ইস্কুলে খানিকটা হইচই হল। সকলেই সফিকুলকাকাকে দোষ দিচ্ছে। সে কী করে এইরকম দরকারি একটা ব্যাপার ভুলে যেতে পারল? কেউ কেউ বলল, বড়দিদিরও দোষ আছে। তবে বেশি দূর ব্যাপারটা গড়াল না। গড়াতে পারত যদি ছন্দার বাড়ির লোক এসে ইস্কুলে নালিশ করত। কিন্তু ছন্দার তো বাবা-মা কেউ নেই। এক দাদা-বৌদির সঙ্গে সে থাকে। দাদা পরের জমিতে কাজ করে, ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে যায়। ছন্দার কোনও খবর তার দাদা রাখে না। আর ছন্দার ভাল-মন্দ নিয়ে বৌদিরও কোনও চিন্তা নেই। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই আছে। তাই নিয়েই বৌদি জেরবার। কে আর ইস্কুলে এসে ছন্দার হয়ে নালিশ জানাবে? ব্যাপারটা তাই দুএকদিনের মধ্যেই ধামাচাপা পড়ে গেল।

আসল ব্যাপারটা জানা গেল কয়েক দিন পরে। ছন্দাই তার দুচারজন বন্ধুকে ব্যাপারটা বলল। তাদের থেকে আরও কয়েকজন ব্যাপারটা জানল, কিছুদিন পরে আরও কয়েকজন, আরও কয়েকজন। এমনি করে সারা ইস্কুলেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

সেই রাত্তিরে ছন্দার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অন্ধকার গুমোট ঘর, হাওয়া-বাতাস খেলে না। মাথার অনেক ওপরে ঘুলঘুলির মতো একটাই জানলা, তাই দিয়ে আর কতটুকু হাওয়া ঢুকবে? তার ওপর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সেই কোন সকালে দুগাল পান্তা খেয়ে বেরিয়েছিল, সেসব কখন হজম হয়ে গেছে। ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছন্দা তাও চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করছিল। ঘরের একদিকে চাল-ডালের বস্তা ডাঁই করে রাখা আছে। সেদিকে ইঁদুর-আরশোলাদের বাসা। ওব্যেস মতো তারা রোজ রাত্তিরে বেরিয়ে পড়ে। ছন্দার পায়ের ওপর দিয়ে দুএকটা চলে গেল। অন্য কোনও মেয়ে হলে চিৎকার করে উঠত, ছন্দা দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করল।

এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে একটু ঘুম এসে গিয়েছিল ছন্দা টের পায়নি, হঠাৎ একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা বাইরে থেকে আসছে। মাটির ওপরে খট খট শব্দ। নদীর দিক থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। ঘুলঘুলিটা ছন্দার মাথার অনেক ওপরে, ঘরের মধ্যে পা উঁচু করে দাঁড়ালেও বাইরেটা দেখা যায় না। সে অতি কষ্টে ঘুলঘুলির ঠিক নিচে দুটো চালের বস্তা টেনে নিয়ে এল। বস্তাগুলো বেজায় ভারী।

দুটো বস্তা টেনে আনতে গিয়ে ছন্দা রীতিমত হাঁপিয়ে গিয়েছিল। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে বস্তা দুটোর ওপর উঠে দেখল, ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরেটা বেশ দেখা যাচ্ছে।

আকাশে চাঁদ ছিল। সেই আলোয় ছন্দা যা দেখল তাতে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। তালগাছের মতো লম্বা কয়েকটা ছায়া ছায়া মূর্তি ইস্কুলের পাঁচিল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। তারা এতটাই লম্বা যে তাদের পাঁচিলটা টপকাতে হচ্ছে না। সাধারণ লোক যেমন পা তুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে যায়, এরা তেমনি অনায়াসে পা তুলে পাঁচিল ডিঙিয়ে ইস্কুলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর, কী আশ্চর্য, পাতকুয়োর কাছে যে আমগাছটা আছে সেখানে এসে হঠাৎ যেন মূর্তিগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ছন্দা অনেক চেষ্টা করেও আর তাদের দেখতে পেল না।

ছন্দার ভীষণ ভয় করছিল। ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপছিল। সে বস্তার ওপর থেকে নেমে জবুথবু হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। ঘুলঘুলি দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের একদিকে এসে পড়েছে। যদি ঘুলঘুলি দিয়ে মূর্তিগুলো ঘরের ভেতরে ঢুকে আসে? ওরা সব পারে। তাহলে ছন্দা কী করবে? এই এতক্ষণে তার কান্না পেয়ে গেল। সে তার মায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। বাবার মুখটাও। ওরাই তাকে বাঁচাতে পারবে। বাবা তার খুব ছোটবেলায় মারা গেছে, এক বছর হল মাও চলে গেছে। বাবার মুখটা ছন্দার কিছুতেই মনে পড়ল না। মার ছবিটা মনের মধ্যে একবার আসে আবার ভেঙে যায়, আবার আসে, আবার ভেঙে যায়। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। নদীর দিক থেকে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ছন্দা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছন্দার গল্পটা সারা ইস্কুলে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে ইস্কুলে আসার ব্যাপারে একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ল। ছোট ক্লাশের কিছু মেয়ে ভয়ে ইস্কুলে আসা বন্ধ করে দিল। বড় ক্লাশের মেয়েদেরও কারও কারও বাড়ি থেকে ইস্কুলে মেয়ে পাঠানোর ব্যাপারে আপত্তি দেখা দিল। এইসব দিকের মানুষ ভূত-প্রেত-অপদেবতাকে খুব ভয় পায়। তাই ছন্দার গল্পটা ছড়িয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগল না। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে দিদিমনিদেরও কানে উঠল।

এই সময় একদিন বড়দিদি ছন্দাকে ডেকে বলল, ফের যদি সে ইস্কুলের নামে এইসব আজগুবি গল্প ছড়ায় তাহলে তাকে ইস্কুল থেকে বার করে দেওয়া হবে। পরের দিন ইস্কুল বসার আগে প্রার্থনার সময় বড়দিদি ছন্দাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলের উঠোনে পৌঁছল। উঁচু গলায় ছন্দাকে বলল, তুমি সবাইকে জানিয়ে দাও যে তোমার নামে যে গল্পটা চারদিকে ছড়িয়েছে সেটা একেবারে মিথ্যে। পুরোটাই তোমার মনগড়া। ছন্দা চুপ করে রইল। দিদিমনিরা সকলে মিলে অনেকক্ষণ ধরে ছন্দাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করল যে সে ইস্কুলের নামে একটা মিথ্যে গুজব রটিয়েছে। আসলে সে ভূত-টুত কিছুই দেখেনি। ছন্দার মুখ দিয়ে একটা কথাও বলানো গেল না। পরের দিন প্রার্থনার আগে বড়দিদি সব ছাত্রীদের জানাল, ছন্দাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যদি কেউ ছন্দার মতো ইস্কুলের নামে গুজব ছড়ায়, তাহলে তাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ছন্দা আমার বন্ধু ছিল না। কিন্তু তাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। ছন্দা এখন আর কোনও ইস্কুলে যায় না। বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজ করে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, ছন্দা ইস্কুল ছেড়ে চলে যাবার পর আস্তে আস্তে তার ভূত দেখার গল্পটাও সকলে ভুলে গেল। ইস্কুল আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। সকলের মতো আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, দিদিমনিদের ওপর শোধ নেবার জন্য ছন্দা মিথ্যে গল্প রটিয়েছিল। তারপর সেই দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল।

একদিন সকালে আমরা ইস্কুলে এসে শুনলাম, যে রাস্তাটা ইস্কুলের পেছন দিক দিয়ে এঁকেবেঁকে নদী অব্দি চলে গেছে তার ওপরে একটা পুরোনো অশথগাছের নিচে, একটা লাশ পাওয়া গেছে। পুরুষ মানুষের লাশ, ঘাড় ভাঙা, চোখদুটো নাকি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। লোকটা বোধহয় মরার আগে খুব ভয় পেয়েছিল। লোকটাকে কেউ চিনতে পারল না, হয়ত এদিককার কেউ নয়। পুলিশ এসে লাশ নিয়ে চলে গেছে।

সেদিন সারাদিন ধরে ইস্কুলে আর কোনও কথা নেই। শুধু সেই মরা লোকটার কথা। কেউ কেউ বলল, পুলিশ বলেছে, আজকাল ইছামতী দিয়ে বাংলাদেশ থেকে চোরা কারবারিরা আসে। এই লোকটা তাদেরই কেউ। বখরায় গণ্ডগোল হওয়ায় দলের লোকেরাই নাকি ওকে মেরে এখানে ফেলে রেখে গেছে। আমার কিন্তু মন বলছিল এটা সেসব নয়। ছন্দা যাদের দেখেছিল এটা তাদের কাজ। নাহলে লোকটা মরার আগে অত ভয় পাবে কেন?

বিকেলে আমার বন্ধু লতা আর আমি গৌরদাদার বাড়িতে গেলাম। গৌরদাদার বাড়িতে আর কেউ থাকে না। তাই আমরা মাঝে মাঝে ইস্কুলের ছুটির পরে গৌরদাদার বাড়িতে গল্প করতে যাই। গৌরদাদাকে দেখে মনে হল কোনও কারণে যেন খুব চিন্তায় আছে। আমাদের দেখে বলল, বোসো মামনিরা। মুড়ি মাখি। নারকোল কোরাই। গৌরদাদা মুড়ি মাখল, নারকোল কোরাল। মুড়ি খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গৌরদাদা, তুমি ওই লোকটার ব্যাপারে কিছু জান? যে লোকটার লাশ পাওয়া গেছে? গৌরদাদা বলল, আমি ইস্কুলের সামান্য কেরানি, ওসব লাশ-টাসের ব্যাপারে কী করে জানব? এই কথা বলে গৌরদাদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আমাদের মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেল, গৌরদাদা তবু কোনও কথা বলল না। কথাবার্তা তেমন জমছে না দেখে আমরা উঠে পড়ার তোড়জোড় করছি এমন সময় গৌরদাদা হঠাৎ বলল, মামনিরা সাবধানে থেক। দিনকাল মোটেই ভাল নয়।

গৌরদাদার গলায় কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল। লতা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন গৌরদাদা? কেন একথা বলছ? গৌরদাদা বলল, অত কথা বলতে পারব না মামনি, শুধু বলছি, কটা দিন সন্ধে নামার আগে বাড়ি ফিরে যেও। কেন একথা বলছ? আমরাও ছাড়ব না। অনেক পেড়াপিড়ির পর গৌরদাদা বলল, এই ইস্কুলের ওপর অপদেবতার নজর পড়েছে। রোজ রাত্তিরে তেনারা আসেন। আমার বাড়ি তো ইস্কুলের পেছন দিকে, আমি সব দেখতে পাই। আমরা বললাম, তাহলে ছন্দা যা দেখেছিল সব ঠিক? গৌরদাদা বলল, একদম ঠিক, একেবারে ঠিক।

আর ওই লোকটা? যার লাশ পাওয়া গেছে? তাকে তুমি চেনো? আমি জিজ্ঞেস করলাম। গৌরদাদা একটু ইতস্তত করে বলল, মুখ চিনি। নাম জানি না। ও মাছ ধরার নৌকোতে কাজ করে। পাশে বেগুনফুলি গ্রামে ওর পিসির বাড়ি। মাঝে মাঝে রাত্তিরে এই দিকের ঘাটে নৌকো ভিড়লে, বেগুনফুলিতে গিয়ে পিসির বাড়িতে রাত্তিরটা থেকে যায়। ইস্কুলের পেছনের রাস্তাটাই ওর যাওয়া আসার পথ। আমার মনে হয় সেদিনও ওই রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, ইস্কুলের কাছে এসে তেনাদের নজরে পড়ে যায়।

পুলিশকে এসব বলেছ? লতা জিজ্ঞেস করল। গৌরদাদা আঁতকে উঠল। পাগল? পুলিশকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে আছে? বললে, থানায় ধরে নিয়ে যাবে। আদালতে সাক্ষী দিতে ডাকবে। সে অনেক ঝামেলা। শেষে বলল, দেখো, লোকটার পরিচয় পুলিশ ঠিকই খুঁচিয়ে বার করবে।

আমরা চলে আসার আগে গৌরদাদা বলল, একটা কথা খুব মন দিয়ে শোনো। আমি যে তোমাদের এতসব কথা বলেছি ইস্কুলের দিদিমনিরা যেন কিছুতেই জানতে না পারে। জানলে আমার চাকরিটা আর থাকবে না। আর চাকরি চলে গেলে এই বুড়ো বয়েসে খাব কী? আমরা বললাম, তুমি কিচ্ছু ভেবো না গৌরদাদা। আমরা কাউকে বলব না। তবে তুমি সাবধানে থেক। তোমার বাড়িটা ইস্কুলের ঠিক পেছনেই কিনা। গৌরদাদা বলল, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, দুবেলা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি। তেনারা আমার কিছুই করতে পারবে না।

গৌরদাদার কথাগুলো সত্যি সত্যিই আর কাউকে বলিনি। শুধু স্বপ্নাকে বলেছি। স্বপ্না আমার এত বন্ধু, ওকে না বললে চলে? আমি জানি ও কাউকে বলবে না। লতা কি কাউকে বলেছে? জানি না।

একটু আগে লুচি, আলুর ছক্কা আর বোঁদে দিয়ে জলখাবার খাওয়া হয়েছে। জলখাবার দেবে কেউ জানতামই না। সবাই অবাক। এটা শুনলাম মেমদিদি নিজের পয়সায় খাওয়ালো। আলুর ছক্কাটা খুব ভাল হয়েছিল। বোঁদেটাও দারুণ। লুচি তরকারি যত ইচ্ছে খেতে পার। আমি দশটা লুচি খেয়েছি। ছটা তরকারি

দিয়ে আর চারটে বোঁদে দিয়ে। দুপুরের খিচুড়ি এখনও উনুনে চাপেনি। লাবড়ার তরকারি কাটা হচ্ছে। ক্লাশ থ্রির মেয়েরা ছোটাছুটি করে চোর চোর খেলছে। আমাদের ক্লাশের মেয়েরা দুটো দল করে গোল হয়ে বসে অন্তাক্ষরী খেলছে। আমার অন্তাক্ষরী খেলতে ভাল লাগে না। গানের কথাগুলো কিছুতেই ঠিক সময় মনে পড়ে না। অথচ গানগুলো আমি যে জানি না তা নয়। অন্তাক্ষরী না খেলে আমি একা একা নদীর ধারে হাঁটছি।

এবছর খুব ভারী বৃষ্টি হয়েছিল। ইছামতী নদী এখনও ফুলে-ফেঁপে রয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় নদীর জল বেশ খানিকটা ঢুকে এসেছে ডাঙার ভেতরে। ঘাস-হোগলা-কাশফুলের বন জলে ঢাকা পড়েছে। একটা মাছরাঙা মাছ ধরবে বলে চুপ করে বসে আছে। মাথার ওপরে কয়েকটা গাংচিল উড়ছে। ওদেরও নজর মাছের দিকে। জেলেদের নৌকোগুলো সার বেঁধে মাঝ নদীতে ভাসছে। ওদের মধ্যে হয়ত বাবা আর দাদাও আছে। এখন ইলিশের সময়। আজকাল ছোট ইলিশ ধরা যায় না। সরকারের বারণ আছে। সরকারের হুকুম, জালে ছোট ইলিশ ধরা পড়লে ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের তাহলে চলে কী করে? সব সময় কি বড় ইলিশের ঝাঁক জালে ওঠে?

উত্তর দিকে নদীটা সরু। ওদিকে কচুরিপানা জমে জমে নদীটা প্রায় মজে যেতে বসেছে। এখন বর্ষার জল পেয়ে নদী সেইসব কচুরিপানা আর অন্য সব আবর্জনাগুলো ঠেলে ঠেলে দক্ষিণে সাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে অবশ্য ডাঙার ভিতরে ঢুকে কিছু কিছু জঞ্জাল জমা দিয়ে যাচ্ছে ঘাস-হোগলার জঙ্গলে। কিন্তু জঞ্জালের মধ্যে কী যেন একটা পড়ে রয়েছে না? ঠিক যেন একটা মানুষ। হাঁটুজলের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, মানুষই তো। নীল জামা সাদা হাফপ্যান্ট পরা একজন মানুষ। একটুও নড়ছে না। জলের নিচে মাথা। মাথার পেছনে ঘাড়ের কাছে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। ওর স্থির শরীরের ওপর দিয়ে ইছামতীর জল বয়ে যাচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

'পার্থপ্রতিম সান্যাল বলে কাউকে মনে আছে তোর? বলছে, আমাদের সময় প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়ত। আমাদেরই ইয়ার। তোদের চেনে বলল। আরও অনেককে চেনে।' আদিত্য চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে বলল।

'ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে সায়েন্সের ছেলেদের সঙ্গে ততটা মেলামেশা ছিল না তো।' অমিতাভ একটু ভুরু কুঁচকে খবর কাগজটা নামিয়ে রাখল। তারপর মুচকি হেসে রত্নার দিকে চোরা চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'রত্নার হয়ত মনে থাকতে পারে। কলেজে পড়ার সময় ওর তো প্রধান কাজ ছিল ছেলেদের মাথা খাওয়া।'

রত্না চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিতে দিতে অমিতাভর দিকে মুখ তুলে কটমট করে তাকাল। বলল, 'যত বয়েস বাড়ছে তত তোমার পচা রসিকতা বাড়ছে।' তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার অন্তত পার্থপ্রতিম সান্যাল বলে কাউকে মনে পড়ছে না। তোর চেনা?'

সপ্তমী পুজোর সকাল। নিচে ঢাক বাজছে। অমিতাভ-রত্নাদের হাউসিং সোসাইটিতে বেশ জাঁকজমক করেই পুজো হয়। তবে অমিতাভ-রত্নারা পুজো-টুজোর মধ্যে খুব একটা নেই। পুজোতে কলকাতায় থাকলে তারা সারাদিন বাড়িতেই অলসভাবে সময় কাটায়। যে আলসেমিটা বছরের অন্য সময় তাদের কপালে জোটে না। সোসাইটির পুজোতে একমাত্র টুবলুই ওদের ফ্ল্যাটের প্রতিনিধি। এই বাড়িতে তার অনেক বন্ধু। সকাল থেকে রাত্তির অব্দি সে বন্ধুদের সঙ্গে পুজো মণ্ডপে হইহই করছে, দৌড়দৌড়ি করছে, চোর-চোর খেলছে। ষষ্ঠী থেকে দশমী অব্দি তার পড়াশোনা নেই। খুব মজা। আরও মজা এই কারণে যে, এবার পুজোর চার দিন আদিত্য তাদের বাড়িতে থাকবে। তার মানে রোজ রাত্তিরে আদিত্যকাকুর কাছ থেকে ভূতের গল্প শোনা যাবে।

'আমারও ঠিক মনে নেই। তবে ফিজিক্স যখন বলছে তখন নিশ্চয় একসঙ্গে কেমিস্ট্রির পাস ক্লাশ করতাম। ও যাদের কথা বলল তাদের কাউকে কাউকে অবশ্য আমার বেশ ভালই মনে আছে।'

'এতদিন পরে হঠাৎ এই পার্থপ্রতিম সান্যালটাকে পেলি কোথায়?' অমিতাভ একটা পুজোসংখ্যা হাতে তুলে নিয়ে আলগোছে প্রশ্ন করল। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'কী যে সব ছাইভস্ম লেখা বেরোয়, একবার উল্টে দেখতেও ইচ্ছে করে না।'

'উল্টে দেখতে ইচ্ছে করে না তো হাতে নাও কেন?' রত্না খরখরে গলায় বলল। পুজোসংখ্যাগুলো সে-ই পড়বে বলে কিনেছে।

আবার একটা যুদ্ধের উপক্রম দেখে আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা, পার্থপ্রতিম সান্যালকে না হয় তোদের মনে নেই। কিন্তু চন্দ্রলেখা সেনকে কি মনে আছে? সে-ও আমাদের ইয়ারে ফিজিক্স পড়ত।'

'সকাল থেকে একটার পর একটা কী সব নাম বলে যাচ্ছিস? পার্থপ্রতিম সান্যাল, চন্দ্রলেখা সেন। একজনকেও চিনি না। এরা কারা?' অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। মনে হয়, সিডি প্লেয়ারে কিছু একটা বাজানোর মতলব কষছে।

'অ্যাই এখন গান-টান নয়, শুধু আড্ডা হবে।' রত্না ফতোয়া দিল। তারপর আদিত্যর দিকে ফিরে বলল, 'চন্দ্রলেখা সেনকে আমার বেশ ভালই মনে আছে। সবাই চন্দ্রা বলে ডাকত। আমার পাড়ার বন্ধু পারমিতা, ওর সঙ্গে চন্দ্রা লরেটো হাউসে পড়ত। বেশ ভাল ছিল লেখাপড়ায়। আই এস সি-তে মেলা নম্বর পেয়েছিল।'

আদিত্য বলল 'চন্দ্রাকে আমি অনেকটাই চিনতাম। আলিপুরে ওদের বাড়ির কাছেই ছিল আমাদের বাড়ি। ফার্স্ট ইয়ারে চন্দ্রার সঙ্গে আমার বেশ ভালই বন্ধুত্ব ছিল। মাঝে মাঝে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম, কখনও চন্দ্রাদের গাড়িতে, কখনও আমাদের। নিশ্চয় তোদের মনে আছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে সাহেবি ইস্কুল থেকে আসা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা বোকা-বোকা বন্ডিং থাকত। সেই নিয়মে আমারও চন্দ্রার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। পরে অবশ্য আর ততটা যোগাযোগ ছিল না।'

'কলেজে পার্থর সঙ্গে চন্দ্রার একটা সম্পর্ক হয়েছিল। বেশ গভীর সম্পর্ক।' আদিত্য কেজো গলায় বলল।

'চন্দ্রার সঙ্গে কলেজে একটা ছেলের সম্পর্ক হয়েছিল এটা একটু একটু মনে পড়ছে। তবে ছেলেটার নামটা মনে নেই। কফি হাউসে ওদের একসঙ্গে অনেকবার দেখেছি। দুজনে কফি হাউসের দোতলায় এক কোণে নেই হয়ে বসে থাকত আর মাঝে মাঝে খুব নিচু গলায় কথা বলত। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকারা বলে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলত? হঠাৎ চন্দ্রা আর তার বয়ফ্রেন্ডকে মনে পড়ল কেন?'

ধমক খেয়ে অমিতাভ আবার বসে পড়েছে। নিরীহভাবে বলল, 'রত্না আর আমিও কিন্তু মাঝে মাঝে কফি হাউসের দোতলায় বসতাম।'

'বসতামই তো।' রত্না জোর গলায় বলল। 'তখনই চন্দ্রাকে ছেলেটির সঙ্গে দেখেছি। তোমাকেও অনেকবার দেখিয়েছিলাম। তোমার মনে নেই কেন?' শেষ কথাগুলো অমিতাভকে লক্ষ করে।

'আমি কী আর তোমাকে ছাড়া কখনও অন্য কারও দিকে তাকিয়েছি?' অমিতাভ মুখটা করুণ করে বলল।

'আ হা হা, মরে যাই মরে যাই।' ঠাট্টা হলেও আদিত্যর মনে হল রত্না একটু লজ্জা পেয়েছে। বোধহয় খুশিও হয়েছে। বিয়ের এত বছর পরেও যে ওদের মধ্যে সেই কলেজ জীবনের ছেলেমানুষি প্রেমটা বজায় আছে এটা আদিত্য টের পায়। সে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আর এক রাউন্ড চা হবে নাকি?'

'এবার কফি হোক। কফি পান করতে করতে আদিত্য আমাদের পার্থ-চন্দ্রার উপাখ্যান শোনাবে।' অমিতাভ বলল।

'উপাখ্যানই বটে। রত্না কফির জলটা বসিয়ে আসুক, আমি তারপর শুরু করছি। কিন্তু তার আগে বারান্দায় গিয়ে একটু বিষপান করে আসি।' আদিত্য সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

একটু পরে যখন আদিত্য ফিরে এল তখন বসার ঘরের সেন্টার টেবিলে কফি এসে গেছে, সঙ্গে কিছু নানখাটাই বিস্কুট। আদিত্য জানে, আসল নানখাটাই আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না। পার্ক সার্কাসের এক বৃদ্ধ মুসলমানের বেকারি থেকে এ-বাড়িতে মাসে একবার কি দুবার সত্যিকারের নানখাটাই বিস্কুট আসে। সে একটা বিস্কুটে কামড় দিয়ে বলতে শুরু করল,

'সপ্তাহ দুয়েক আগে একটু রাত্তিরের দিকে একটা ফোন পেলাম। মোবাইলে যে নম্বরটা ফুটে উঠল সেটা দেখে মনে হল ফোনটা বিদেশ থেকে আসছে। ভাবলাম, রং নাম্বার। ওপারের কণ্ঠস্বর অবশ্য আস্বস্ত করল ফোনটা আমারই। পুরুষের গলা, উচ্চারণটা একটু কৃত্রিম। অনেকদিন বিদেশে থাকলে কোনও কোনও বাঙালির যেমন হয়। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, এটা কি আদিত্য মজুমদারের নম্বর? আমি হ্যাঁ বলাতে বাংলায় বলল, আমার নাম পার্থপ্রতিম সান্যাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স পড়তাম। আমাকে কি চেনা যাচ্ছে? কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করেও পার্থপ্রতিম সান্যালকে চিনতে পারলাম না। বললাম, ঠিক মনে পড়ছে না। সে বলল, আমার কিন্তু তোকে বেশ ভালই মনে আছে। আমি অনির্বাণ রায়, সাহানা সরকারদের ক্লাশে পড়তাম। অবশ্য ওদের মতো লেখাপড়ায় অতটা ভাল ছিলাম না। ওই দুটো নামই আমার চেনা। বললাম, সামনা-সামনি দেখলে নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে। কেমন আছিস? সে বলল, একটু গণ্ডগোলের মধ্যে আছি রে। সেইজন্যেই তোকে ফোন করা। কিছুক্ষণ কথা বলার সময় হবে? আমি বললাম, নিশ্চয় হবে। পার্থ বলল, সে একটা বিচ্ছিরি সমস্যায় পড়েছে। বললাম, কী সমস্যা? ও বলল, চন্দ্রলেখা সেনকে মনে আছে? আমাদের সঙ্গেই পড়ত? আমরা যাকে চন্দ্রা বলতাম? আমি বললাম খুব মনে আছে। ও বলল, সমস্যাটা চন্দ্রাকে নিয়ে।

পার্থকে কেউ বলেছে যে আমি এখন একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। দুএকটা কেস সলভ করে খানিকটা সুনামও আমার হয়েছে। তাই পার্থ আমার সাহায্য চায়। ফোনটা পার্থ অ্যামেরিকা থেকে করছিল। বলল, আগামী সপ্তাহে ও কলকাতায় আসছে। তখন ওর সমস্যাটার কথা আমাকে বলবে। একটা তারিখ এবং সময় ঠিক করা হল যেদিন আমাকে ওর হোটেলে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

আদিত্য একটু থেমে কফির কাপে চুমুক দিল। আর একটা বিস্কুট হাতে নিয়ে বলল, 'এই বিস্কুটগুলো একেবারে ইরেজিস্টেবল। সামনে থাকলেই খেতে ইচ্ছে করে। রত্না, তুই বিস্কুটগুলো সামনে থেকে সরা। নাহলে একটার পর একটা খেয়ে যেতে হবে। দুপুরে তোর বাগদা চিংড়ির মালাইকারি খেতেই পারব না।'

রত্না বিস্কুটের প্লেটটা সাইড টেবিলে সরিয়ে রেখে বলল, 'তোকে আর বিস্কুট খেতে হবে না। তুই গল্পটা বল।'

এক চুমুকে কফিটা শেষ করে আদিত্য আবার শুরু করল, 'এয়ারপোর্টের কাছেই হোটেল। কথা মতো নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলা পৌঁছে গেলাম। পার্থ বলেছিল সুইমিং পুলের ধারে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। বেজায় মুটিয়েছে। মাথায় চুল প্রায় নেই। ভারসাম্য রক্ষার জন্য থুতনি জুড়ে গোটি রেখেছে। পার্থর সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। পুরোনো বন্ধুদের কথা হল। পার্থ কুড়ি বছরেরও বেশি দেশে নেই। তাই কে কোথায় ছড়িয়ে গেছে কিছুই জানে না। তারপর সে আসল কথায় এল। সুইমিং পুলের ধারে বসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা হল। টুকরো টুকরো কথা থেকে যে গল্পটা খাড়া করা গেল সেটা আসলে একটা প্রেমের গল্প। তবে মিলনান্ত না বিয়োগান্ত এখনই বোঝা যাচ্ছে না। অদরকারি জিনিসগুলো বাদ দিয়ে আমি মোদ্দা ব্যাপারটা বলছি। রত্না ঠিকই বলেছে, কলেজে পড়ার সময় পার্থর সঙ্গে চন্দ্রার গভীর প্রেম হয়েছিল। দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু একেবারে আলাদা। চন্দ্রার বাবা-ঠাকুর্দা বিলেত ফেরত লইয়ার, আলিপুরে বিশাল বাড়ি, চন্দ্রা কলেজে যাওয়া-আসা করে বাড়ির গাড়িতে। বর্হিজগত সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই সামান্য। উল্টোদিকে পার্থ মফস্বলের ছেলে, বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। তার বাবা বেসরকারি আপিসের কেরানি, দেশভাগের পর কপর্দকহীন অবস্থায় এপারে চলে এসেছিলেন। পার্থ যখন কলেজে পড়ছে তখন তার মাথার ওপর একজন অবিবাহিত দিদি, বাবার চাকরিও খুব বেশি বাকি নেই।'

কলিং বেল বাজল। টুবলু বাড়ি ফিরেছে। তার জল তেষ্টা পেয়েছে। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল বার করে ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে বোতলটাকে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে টুবলু ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। রত্না কিছু বলারই সময় পেল না। অমিতাভ রত্নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চান করেছে?'

'সকালে জোর করে ভাগ্যিস চানটা করিয়ে দিয়েছিলাম। যেভাবে ঠান্ডা জল খেল, আবার গলা ব্যথা শুরু হবে। আমি আর কী করব?' খানিকক্ষণ থেমে রত্না আদিত্যর দিকে ফিরে বলল, 'তারপর কী হল বল।'

'ভাইবোনের মধ্যে পার্থই ছিল বেশি মেধাবী। জেলা ইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল। কলকাতায় যখন হিন্দু হস্টেলে থাকত তখন স্কলারশিপের ওপরেও তিন-চারটে টিউশন করে বাড়িতে টাকা পাঠাত। বলতে গেলে, পুরো পরিবারটাই তাকিয়ে থাকত পার্থর দিকে।'

'এরকম অসম অবস্থায় প্রেম হল কী করে?' এবার অমিতাভর প্রশ্ন।

'সেটাই বলতে যাচ্ছি। চন্দ্রা যখন ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে তখন তার মা হঠাৎ মারা যান। হার্ট অ্যাটাক, একেবারে আনএক্সপেকটেড। চন্দ্রার মা মারা যাবার মাস ছয়েকের মধ্যে তার বাবা আবার একটা বিয়ে করেন। শোনা যায়, চন্দ্রার সৎমায়ের সঙ্গে চন্দ্রার বাবার বেশ কিছুদিন ধরেই লটরপটর চলছিল এবং সেটা কেন্দ্র করেই চন্দ্রার মায়ের অশান্তি, হৃদরোগ এবং অকালমৃত্যু। সে যাই হোক, মায়ের মৃত্যুর পর চন্দ্রার জীবনটা একেবারে বদলে গেল। সৎমায়ের সঙ্গে তার কোনদিনই বনেনি, বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর বাবার সঙ্গেও সম্পর্কটা খুব দূরের হয়ে গেল। বাড়িতে চন্দ্রার নিজের বলতে আর কেউ রইল না। এই সময়েই পার্থ সান্যালের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তৈরি হতে শুরু করে।'

আবার কলিং বেল। না, এবার টুবলু নয়। ফ্ল্যাটের দুজন কিশোরী, সপ্তমীর সকালে সখ করে দুজনেই শাড়ি পরেছে। কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে অভ্যাস নেই। তাদের মধ্যে লম্বা মেয়েটি এক পা এগিয়ে এসে রত্নাকে লক্ষ্য করে বলল,'কাকিমা, আজ দুপুরে তোমরা কতজন নিচে খেতে নামছ ?'

মেয়েটির সঙ্গিনী খাতা ডট পেন বার করে ফেলেছে। রত্না বলল, 'আমরা কেউ আজ নিচে খাব না রে। শুধু টুবলু হাউসিং-এর বন্ধুদের সঙ্গে খেতে নামবে।'

'তার মানে একজন।' সঙ্গিনী খাতায় লিখে নিয়ে বলল, 'আসছি কাকিমা।'

'এত ঘন ঘন বেল বাজলে গল্প শোনা যায়?' রত্না দরজাটা বন্ধ করতে করতে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপর কী হল বল।'

আদিত্যর সত্যি সত্যি খেই হারিয়ে গিয়েছিল। খানিকটা ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল, 'চন্দ্রা নিজের বাবাকে ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সমগ্র বড়লোক জাতটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। এর ফ্লিপ সাইডটা হল, এই সময় থেকেই গরিবদের প্রতি তার একটা আশ্চর্য সহানুভূতি জন্মায়। হয়ত সেই কারণেই সে প্রথম পার্থ সান্যালকে নজর করেছিল। অন্তত পার্থর তাই ধারণা। প্রথম প্রথম ক্লাশ নোট মেলানোর অছিলায় চন্দ্রা পার্থর সঙ্গে কথা বলত, ভাব একটু জমলে কফিহাউস, সিনেমা, গঙ্গার ঘাট, ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্থ বলছে, ইনিশিয়েটিভটা চন্দ্রার দিক থেকেই ছিল। প্রথম প্রথম পার্থ বরং একটু সংকোচ বোধ করত, ভয় পেত। সে নিজে অতি সাধারণ ঘরের ছেলে, মাথার ওপর অনেক দায়িত্ব। তার মনে হতো বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের থেকে দূরে থাকাই ভাল। তাদের কখন কী খেয়াল হয় বোঝা মুস্কিল। তারপর একটু একটু করে তার সংকোচ কাটল। চন্দ্রা তার ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডির কথা পার্থকে জানাল। তাই নিয়ে পার্থর মনে চন্দ্রার প্রতি একটা সিমপ্যাথি তৈরি হল। মনে হল, মেয়েটাকে একটা মানসিক প্রোটেকশন দেওয়া দরকার। সিমপ্যাথি থেকে প্রোটেকশন, প্রোটেকশন থেকে নৈকট্য, নৈকট্য থেকে প্রেম। কিছুদিনের মধ্যেই পার্থ-চন্দ্রার প্রেম বেশ জমে গেল।'

জানলা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক জোলো হাওয়া ঢুকে পড়েছে। জানলার দিকে তাকিয়ে রত্না বলল, 'এ কী রে, বৃষ্টি হবে নাকি?'

অমিতাভ বলল, 'বৃষ্টি হলে আড্ডাটা জমবে ভাল। তবে বাচ্চাগুলোর আনন্দ একেবারে মাটি হয়ে যাবে।'

আদিত্য জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একটা কালো মেঘ আকাশের একদিকটা ঢেকে ফেলেছে। সূর্যটাও মনে হচ্ছে শিগগির ঢাকা পড়ে যাবে। বৃষ্টির সম্ভবনা দেখলে এই বুড়ো বয়সেও তার মনটা মেঘদূতের কামার্ত যক্ষের মতো উড়ু উড়ু করে। আর মনটা উড়ু উড়ু করলেই তার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। এই ঘরে যেহেতু সেটা সম্ভব নয় তাই ইচ্ছেটাকে শাসন করে সে আবার বলতে লাগল, 'আর একটা ব্যাপার পার্থ-চন্দ্রার প্রেমে ক্যাটালিস্টের কাজ করেছিল। সেটা হল অতি বাম মাওবাদী রাজনীতি। পার্থ তার বাবার কাছ থেকে কিছু বামপন্থী বিশ্বাস ইনহেরিট করেছিল। ফলে কলেজে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই সে বেশ সক্রিয়ভাবে অতি বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। চন্দ্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর সে তার বাম বিশ্বাসগুলোর কথা মাঝে মাঝেই চন্দ্রাকে বলত। খুব বেশি বলতে হয়নি, চন্দ্রাও কয়েকদিনের মধ্যে কলেজের মাওবাদীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল, রাজনীতির মধ্যেই এক ধরনের সোলেস, বলা যায়, বেঁচে থাকার একটা সার্থকতা, খুঁজে পেল যার ভেতর কাঁচা বয়েসের আবেগ তো ছিলই কিন্তু তার থেকেও বেশি ছিল নিজের বাবার প্রতি তার তীব্র ঘৃণা।'

রত্না একটু ব্যাঙ্গের সুরে বলল, 'একটা দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। আমরা তখন বি এ পাশ করে গেছি। এম এ পড়ি। চন্দ্রারও এম এস সি পড়ার কথা। কী একটা কারণে কলেজে এসেছিলাম। ও মা! দেখি, চন্দ্রা দলবল নিয়ে প্রিন্সির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে। নেত্রী-নেত্রী ভাব। আমাকে দেখেও দেখল না।'

'তোর ইম্প্রেশনটা পার্থর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এম এস সি পড়ার সময় চন্দ্রা রীতিমত নেত্রী হয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে কী হয়েছিল বলি। থার্ড ইয়ারে পৌঁছে পার্থর মনে হল, রাজনীতিটা তার জন্য নয়। তার মাথার ওপর অনেক দায়িত্ব। বাবা, মা, দিদি সকলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞানচর্চা করতে তার বেশ ভালোই লাগে। অথচ দুএকটা বছর প্রেম এবং রাজনীতির চাপে লেখাপড়া কিছুই করা হয়নি। অতএব এবার তাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে একটু একটু করে রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। মজার ব্যাপার হল, পার্থ যত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, চন্দ্রা ততই গভীরভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে যায়। যেন রাজনীতিটাই তার জীবন, অন্য সব কিছু গৌণ। বিএসসিতে পার্থ বেশ ভালই রেজাল্ট করল, চন্দ্রা একেবারে কান ঘেঁষে একটা ফার্স্ট ক্লাশ। তোদের নিশ্চয় মনে আছে ফিজিক্সে প্রায় সকলেই ফার্স্ট ক্লাশ পেত, অন্তত আমাদের কলেজে, তাই চন্দ্রার রেজাল্টটা সাদামাটাই বলতে হবে। সে যাই হোক, পার্থ এমএসসি পড়তে কানপুর আই আই টি চলে গেল, চন্দ্রা রয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই থেকে পার্থ আর চন্দ্রার ছাড়াছাড়ির শুরু।'

(২)

একটু জিরিয়ে নেবার জন্য আদিত্য কিছুক্ষণ থামল। বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। ঘরে ছাঁট আসছে। সঙ্গে জোলো হাওয়া। আদিত্য জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাইরের ছবিটা হঠাৎ বদলে গেছে। যেন ম্যাজিক। 'সকালবেলার বাদল আঁধারে' শরতের ঝলমলে রোদ্দুর উধাও। তার জায়গায় পরিপূর্ণ বৃষ্টির একটা দিন। শুধু খুব দূর থেকে মাইকের শব্দ ভেসে এসে মনে করিয়ে দিচ্ছিল আজ পুজো। না হলে সেটাও মনে থাকত না। আদিত্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। 'সকালবেলার বাদল আঁধারে' গানটা পুরোনো কার গলায় শুনেছিল? সম্ভবত কনক বিশ্বাস।

অমিতাভ উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'পুজোটা একেবারে মাটি করে দিল রে। কোনও মানে হয়?'

আদিত্য তখনও অন্যমনস্ক। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

রত্না অসহিষ্ণু গলায় বলল, এই রে, মরেছে। আকাশে মেঘ দেখে আদিত্যর মনে ভাব এসেছে।' তারপর গলাটা একটু তুলে ধমকের সুরে বলল, 'এই আদিত্য, তুই গল্পটা বলবি? নাকি আকাশের দিকে চেয়ে থাকবি?'

রত্নার তাড়া খেয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'পার্থ যখন কানপুরে, তখন চন্দ্রা একটা অ্যাকটিভ মাওবাদী দলের সঙ্গে ভালো মতোই জড়িয়ে পড়েছিল। আমরা কলেজে যেরকম মাওবাদী দেখতাম, এরা ঠিক সেরকম গণসঙ্গীত গাওয়া, কফি হাউসে তর্ক জমানো, বড় জোর প্রিন্সিকে ঘেরাও করা নিরীহ টাইপের মাওবাদী নয়। পার্থর ধারণা, এই দলটা বিপ্লবের ছুতোয় মানুষ-টানুষ মারত। পুরুলিয়া-ঝাড়খন্ড বর্ডারে অ্যাকশন করত। দলের অনেকে জঙ্গলে অ্যাবস্কন্ড করে থাকত। একেবারে পুরোদস্তুর উগ্রপন্থীদের একটা দল। কী করে এদের সঙ্গে চন্দ্রার যোগাযোগ হল সেটা অবশ্য পার্থ জানে না। এমএস সি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রা পুরুলিয়ায় সাঁওতালদের গ্রামে লেখাপড়া শেখাতে যেত, তাদের ছোটখাট অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিত, নানারকম পরামর্শ দিত, কখনও অল্পস্বল্প টাকা-পয়সা। হয়ত তখনই ওদের সঙ্গে চন্দ্রার যোগাযোগ হয়। কিংবা হয়ত যোগাযোগটা আগেই হয়েছিল, এবং যোগাযোগ হবার পর ওরাই চন্দ্রাকে পুরুলিয়ায় কাজ করতে পাঠিয়েছিল। দল চন্দ্রাকে দিয়ে আর কী কী করাতো সেসব ডিটেল পার্থ জানে না। তবে ওই দলটার সঙ্গে যে চন্দ্রার ভাল মতোই যোগাযোগ ছিল, সে-ব্যাপারে পার্থ নিশ্চিত। ছুটিছাটায় পার্থ যখন বাড়ি ফিরত তখন চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করার জন্য কলকাতাতেও আসত। হাতে হাজার কাজ থাকলেও চন্দ্রা সব কাজ ফেলে পার্থর সঙ্গে দেখা করত। দেখা হওয়াটা অবশ্য ইনভেরিয়েবলি তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি পর্যন্ত গড়াত। দুজনেই দুজনকে বোঝানোর চেষ্টা করত যে তার পথটাই ঠিক, অন্যজনেরটা ভুল। এইভাবে পার্থ আর চন্দ্রার মধ্যে একটা ড্রিফট তৈরি হচ্ছিল, একটু একটু করে তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে

যাচ্ছিল। আবার এটাও ঠিক যে ভেতরে ভেতরে তাদের পরস্পরের প্রতি খুব গভীর একটা টান তখনও রয়ে গিয়েছিল।

'এম এস সি পাস করার পর পার্থ পি এইচ ডি করার জন্য অ্যামেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ভাল স্কলারশিপ পেল। সে চন্দ্রাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। স্কলারশিপের টাকায় দুজনের মোটামুটি চলে যাবে। তারপর সুযোগ বুঝে চন্দ্রাও নয় কোথাও একটা পি এইচ ডি প্রোগ্রামে ঢুকে পড়তে পারবে। চন্দ্রা রাজি হল না। সমাজ বদলে দেবার ভূত তখন পুরোপুরি তার মাথায় বাসা বেঁধে রয়েছে। অ্যামেরিকা যাওয়া মানে দেশের গরিব লোকগুলোকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, অ্যামেরিকা যাওয়া মানে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া, চন্দ্রা তখন বিশ্বাস করে অ্যামেরিকার ক্যাপিটালিস্টরা সারা পৃথিবীর মানুষকে শোষণ করছে। সে দেশে কি যাওয়া যায়? পার্থ অ্যামেরিকা চলে যাবার আগের দিন সে পার্থকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল, যেটা তার একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু নিজের বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়ল না। পার্থর চোখও ভিজে। সে চন্দ্রাকে অঙ্গীকার করল পড়াশোনা শেষ হলেই দেশে ফিরে আসবে।'

'জম্পেশ ফেঁদেচিস কিন্তু গল্পটা। তুই গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে পট বয়লার লিখলে পারতিস।' অমিতাভ ফোড়ন কাটল।

'খালি বাজে কথা। তুমি থামবে?' রত্না তার স্বামীকে মুখ ঝামটা দিল। সে গল্পটাতে বেশ রস পেয়ে গেছে। বলল, 'তারপর?'

'তারপরের কুড়ি বছর ঠিক কী ঘটেছিল পার্থ জানে না। মানে, পার্থর জীবনে কী ঘটেছিল সেটা নয়, চন্দ্রার জীবনে কী ঘটেছিল সেটার কথা বলছি। পার্থ বিদেশ যাবার পর আস্তে আস্তে চন্দ্রার সঙ্গে তার যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হবার কথাই ছিল। যখনকার কথা বলছি, তখন টেলিফোন এত সস্তা হয়নি। ইমেল অবশ্য এসে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই চন্দ্রা প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায় যেখানে তার ইমেল অ্যাক্সেস থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সব থেকে বড় কথা, দুজনের মানসিকতায়, ভাবনা-চিন্তায় দিন দিন যে তফাতটা তৈরি হচ্ছিল সেটা আর জোড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না।

'এদিকে পার্থর জীবন তখন অন্য খাতে বইছে। বছর দুয়েক ফিজিক্স পড়ে সে বুঝল ফিজিক্সের বাজারটা অত্যন্ত কম্পিটিটিভ। ওখানে টিকে থাকতে গেলে পি এইচ ডির পর অনেকদিন পোস্টডক করতে হবে, প্রচুর পেপার-টেপার ছাপাতে হবে, তারপর যদি একটা পাকাপাকি ফ্যাকাল্টি পোজিশন পাওয়া যায়। কিন্তু অতদিন তার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বাড়ির সবাই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দিদির তখনও বিয়ে হয়নি। বাবা রিটায়ার করেছে। বাবা এক্সপেক্ট করে পার্থই সংসারের হাল ধরবে। কর্নেলে দুবছর ফিজিক্স পড়ার পর পার্থ একটা বড় ডিসিশন নিল। ক্যানাডার মনট্রিয়ল শহরের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে ফিন্যান্স-এ পিএইচ ডি করার জন্য একটা জলপানি জোগাড় করে বিষয়, ইউনিভার্সিটি এবং দেশ তিনটেই পাল্টে ফেলল। মোটামুটি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে, খানিকটা অঙ্ক জানলে আর কিছুটা কম্পিউটারের কোড লিখতে পারলে ফিন্যান্সে চড়চড় করে উন্নতি করা যায়। পার্থর তিনটে গুণই ছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি সে উন্নতি করল। বছর চারেকের মধ্যে পি এইচ ডি শেষ, পি এইচ ডি শেষ করে আবার মার্কিন দেশ, এবার কর্পোরেট সেক্টর, বিস্তর মাইনে, বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাতেও অসুবিধে নেই। এর কিছুদিন পরে স্টেফানি ম্যাকার্ডি বলে এক মার্কিনি মহিলার সঙ্গে পার্থর সম্পর্ক হয়। এতদিন চন্দ্রলেখা সেন যদি বা তার মনের এক কোণে একটুখানি জায়গা জুড়েছিল, স্টেফানির সঙ্গে আলাপ হবার পর সেটুকু জায়গাও আর রইল না।'

'এই বিচ্ছিরি গল্পটা বলার জন্য তুই এতক্ষণ সময় নষ্ট করলি? এর থেকে অমিতাভর খেয়াল গানের সিডিও ভাল ছিল।' রত্না বেশ রেগে গেছে। বিয়োগান্ত গল্প তার একেবারে পছন্দ নয়।

'আরে দাঁড়া না। গল্প এখনই শেষ হয়েছে নাকি?' আদিত্য রত্নাকে আশ্বস্ত করল। 'তবে অনেকক্ষণ বকবক করেছি। একটা সিগারেট এবার খেতেই হবে। আমি বারান্দা থেকে সিগারেটটা খেয়ে আসি। তুই বরং

আরেক প্রস্থ চায়ের ব্যবস্থা কর।'

'সেই ভাল। আর একবার চা হোক।' অমিতাভ চায়ের প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানাল।

বারান্দায় এসে আদিত্য দেখল বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে আবার। শরৎকালের বৃষ্টি বেশিক্ষণ চলার কথাও নয়। তবে অল্প সময়ের জন্য হলেও বৃষ্টির বেগটা ছিল মারাত্মক। রাস্তার ওপর বৃষ্টি তার চিহ্ন রেখে গেছে। জায়গায় জায়গায় জমা বৃষ্টির জল। তার মধ্যেই ভীড় বাড়ছে রাস্তায়। এক ঝলক তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় ভীড়ের বেশিরভাগ মফস্বলের মানুষ। ঠাকুর দেখতে কলকাতায় এসেছে। এরা বৃষ্টির সময় কোথায় ছিল কে জানে। হয়ত কোনও দোকানে বা গাড়িবারান্দার নিচে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করছিল। সিগারেটে আরও দুটো-তিনটে সুখটান বাকি আছে, এমন সময় ঘর থেকে অমিতাভ ডাকল, 'চলে আয়, চা এসে গেছে।'

চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে আদিত্য আবার শুরু করল, 'কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করার পর পার্থ স্টেফানিকে বিয়ে করল। মেম বউ নিয়ে একবার দেশেও এসেছিল সে। তবে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। আসলে, চন্দ্রার সামনা-সামনি দাঁড়ানোর সাহস তো দূরের কথা, চন্দ্রা কোথায় থাকে, কী করে সেটুকু খোঁজ নেবার মতো নৈতিক জোরও তার ছিল না। বস্তুত, নিজের বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকা দেবার জন্য সে চন্দ্রাকে একেবারে ভুলে যেতে চেয়েছিল। যাই হোক, মেমসাহেবের সঙ্গে পার্থর বিয়েটা বছর দশেক টিকেছিল। তারপর ডিভোর্স। ভাগ্যক্রমে ওই বিয়েতে পার্থর কোনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। বিয়ে ভেঙে যাবার কিছুদিন পর থেকে পার্থ আবার একা-একা বোধ করতে লাগল। আবার তার চন্দ্রার কথা মনে পড়তে লাগল। তার মতো দুর্বল চরিত্রের পুরুষদের যেমন হয়।

'একা থাকতে থাকতে পার্থর মনে হতো চন্দ্রার সঙ্গে আবার দেখা হলে সে তার সব দোষ স্বীকার করে নেবে। সব দোষ স্বীকার করে নিয়ে সে চন্দ্রাকে বলবে তার আর যাবার কোনও জায়গা নেই। তাই সে চন্দ্রার কাছে ফিরে এসেছে। তখন চন্দ্রা কি তাকে ফিরিয়ে নেবে না? কিন্তু চন্দ্রার ঠিকানা বা ফোন নম্বর সে পাবে কোথায়?'

'তুই যে এত সেন্টু দিয়ে গল্প বলতে পারিস আগে জানা ছিল না।' অমিতাভ মুচকি হাসল।

'আমি সেদিন পার্থর মুখে যা যা শুনেছি ঠিক সেটাই রিপিট করছি।' আদিত্যকে রক্ষণাত্মক শোনাল।

'তুমি আদিত্যর পেছনে লাগছ কেন? গল্পটা তো বেশ জমে উঠেছে। আদিত্য তুই বলে যা।'

'বছর কয়েক এইভাবে কেটে যাবার পর, প্রায় অলৌকিকভাবে পার্থ চন্দ্রার টেলিফোন নম্বরটা পেয়ে গেল। কীভাবে পেল সেটা আরেকটা গল্প, আমাদের মূল গল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া সেই গল্পটা পার্থ আমাকে বলেওনি। তাই তার মধ্যে আর যাচ্ছি না। কেমন করে দুরুদুরু বুকে পার্থ একদিন চন্দ্রাকে ফোন করে ফেলল, অতদিন পরে পার্থর গলা শুনে চন্দ্রা কী বলল, আরও কতদিন সে অভিমান করে রইল, কেমন করে পার্থ তার অভিমান ভাঙাল এসবের ডিটেল বর্ণনা অবশ্য সেদিন পার্থ আমাকে দিয়েছিল। আমি সেসবের মধ্যেও যাচ্ছি না। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, পার্থর সঙ্গে চন্দ্রার আবার ভাব হয়ে গেল। পার্থ ঠিক করল দেশে ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের একটা কন্সাল্টেন্সি ফার্ম শুরু করেছিল। তার অনেক ক্লায়েন্টই মাল্টিন্যাশানাল, তারা ভারতে ব্যবসা করে। পার্থ ঠিক করল তার হেড অফিসটা ব্যাঙ্গালোরে সরিয়ে আনবে। আস্তে আস্তে বিদেশের ব্যবসাটাও গুটিয়ে নিয়ে আসবে।'

'এ তো পুরো হ্যাপি এন্ডিং। পার্থর সমস্যাটা তাহলে কী?' রত্নার গলাটা বিভ্রান্ত শোনাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার সমস্যার কথাটা বলি।' আদিত্য একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'পার্থ যখন পি এইচ ডি করছে বা ফ্লরিডায় পড়াচ্ছে বা মেমসাহেব বউএর সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে ডিভোর্স করার মতলব আঁটছে, তখন চন্দ্রা কী করছিল, পার্থ অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি। চন্দ্রার জীবনের দশ-পনের বছর তার কাছে অন্ধকারেই থেকে গেছে। শুধু এইটুকু জানতে পেরেছে যে, কোনও একটা সময় খুনোখুনির বামপন্থী রাজনীতিতে চন্দ্রা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। যাকে বলে কমপ্লিটলি ডিসইলিউশন্ড। এতটাই যে

কিছুদিন আগে সে তার দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে ইছামতীর ধারে একটা ছোট্ট গ্রামের ইস্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছে। আসলে মাওবাদীদের সংস্রব ত্যাগ করলেও কিছু কিছু বামপন্থী বিশ্বাস সম্ভবত তার ভেতরে রয়ে গিয়েছিল। ফলে, সে আর কলকাতায় তার বাড়িতে ফিরে আসেনি। তার বাবা আগেই গত হয়েছেন। আলিপুরের বাড়িতে শুধু তার সৎমা। বাবা তার জন্য ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। আলিপুরের বাড়িতেও তার অর্ধেক ভাগ। অতএব চাইলে সে অনায়াসেই কলকাতায় এসে আরামে দিন কাটাতে পারত। কিন্তু একে বাম-আদর্শ, তার ওপর সৎমার সঙ্গে তার মোটেই বনে না।'

'মাওবাদীদের হাত থেকে চন্দ্রা অত সহজে মুক্তি পেল কী করে? শুনেছি উগ্রপন্থীদের দলে একবার নাম লেখালে আর বেরোনো যায় না।' অমিতাভ জিজ্ঞেস করল।

'আমিও এই প্রশ্নটা পার্থকে করেছিলাম। উত্তরটা পার্থর জানা নেই। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। তার আগে বলা দরকার, এই ইস্কুলটাতে চন্দ্রা গত পাঁচ-ছ মাস পড়াচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই ইস্কুলটার প্রতি চন্দ্রার একটা গভীর মমত্ব তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে এই কারণে যে, ওখানে যারা পড়তে আসে তারা সকলেই হতদরিদ্র ঘর থেকে আসে। পার্থ কয়েকবার চন্দ্রার সঙ্গে ওখান থেকে ঘুরেও এসেছে।'

'পার্থ এখন কী করতে চাইছে?'

'পার্থ চন্দ্রাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বিদেশ যেতে চন্দ্রা কিছুতেই রাজি নয়। মূলত সেই কারণেই পার্থ পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পরেও যদি পার্থকে চন্দ্রার থেকে দূরে থাকতে হয়, তাহলে দেশে ফিরে এসে লাভ কী? অনেক বোঝানোর পর অবশেষে চন্দ্রা ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। বিয়ের পর সে পার্থর সঙ্গে তার নতুন কর্মস্থলে চলে যাবে। ওখানে গরিব বাচ্চাদের জন্য একটা ইস্কুল করবে। আমাদের দেশে তো গরিবের অভাব নেই। এটা অবশ্য মাস দেড়েক আগেকার কথা।'

'তাহলে আর সমস্যা কী? সবই তো মিলে গেল।' রত্না এখনও বিভ্রান্ত।

'সমস্যা আছে, সমস্যা আছে। সবই যখন ঠিকঠাক চলছিল তখন হঠাৎ কিছু দিন আগে বলা নেই কওয়া নেই চন্দ্রা তার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে। কাউকে কিচ্ছু বলে যায়নি। পার্থকেও না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারাও এখন পর্যন্ত কমপ্লিটলি ক্লু লেস। চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার কাজটা পার্থ আমাকে দিয়েছে। তার ভয়, চন্দ্রা হয়ত আর বেঁচে নেই। হয়ত চন্দ্রার পুরোনো দলই তাকে শেষ করে দিয়েছে। হয়ত অমিতাভর ধারণাটাই ঠিক। একবার দলে নাম লেখালে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।'

আদিত্য থামল। ঘড়িতে দেড়টা। ঘরের আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ সকলে নীরব। তারপর নীরবতা ভেঙে রত্না স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা চান করতে যাও। আমি ততক্ষণ খাবার গরম করি। আচ্ছা তার আগে একবার নিচে গিয়ে দেখবে ছেলেটা খেতে বসল কিনা? আমাদের পুজো কমিটির যা ব্যাপার, হয়ত প্রথম ব্যাচটাই এখনও বসেনি।'

অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। আদিত্যও উঠে দাঁড়িয়েছে। অমিতাভ আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কিছু ভেবেছিস কী করবি?'

'এখনও জানি না কী করব। কালী পুজো নাগাদ পার্থ একবার দেশে আসবে বলেছে। তার মানে নভেম্বরের মাঝামাঝি। ওরা ভেবেছিল ডিসেম্বরের গোড়ায় একটা ছোটখাট অনুষ্ঠান করে বিয়েটা সেরে ফেলবে। কিন্তু চন্দ্রা বেঁচে আছে কিনা সেটাই তো কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছে না। যদি বেঁচে থাকে, ডিসেম্বরের আগে চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। হাতে খুব বেশি সময় নেই। তবে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে চন্দ্রা বেঁচে আছে। মাওবাদীরা যদি দল ছেড়ে দেবার জন্য চন্দ্রাকে মারবেই তাহলে তারা পাঁচ-ছয় মাস অপেক্ষা করবে কেন?'

রত্না বলেছিল সন্ধেবেলা সেজেগুজে নিচে নামবে। সন্ধেটা পুজোমণ্ডপে কাটাবে। এই বাড়িতে রত্নার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব না হোক অন্তত চেনা পরিচিত আছে। একটা সন্ধে তাদের সঙ্গে বসে মেয়েলি গল্প করা রত্নার পক্ষে খুব শক্ত নয়। আসলে, হাউসিং সোসাইটির মহিলাদের সঙ্গে একটু আধটু না মিশলে সবাই নাক উঁচু মনে করে। তাই পুজোর সময় একদিন অন্তত নিচে নামা দরকার। কিন্তু হাউসিং সোসাইটিতে অমিতাভর এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারে। মুখচেনা দুচারজন আছে বটে, তবে তাদের সঙ্গে মিনিট দু-তিনের বেশি কথা বলা অমিতাভর পক্ষে অসম্ভব। তার ওপর এখন আদিত্য এসেছে। তাই অমিতাভ আগেই বলে দিয়েছিল সে আর আদিত্য সারাটা সন্ধে বাড়িতে বসে গান শুনবে। সারা সন্ধে শোনার মতো কয়েকটা গান বেছেও রেখেছিল। সম্প্রতি পুনে, বরোদা আর কলকাতা থেকে এগুলো সে বহুকষ্টে সংগ্রহ করেছে।

সরোদে একটা জয়জয়ন্তী চালিয়ে দিয়ে অমিতাভ বলল, 'কলকাতা দিয়ে শুরু করি। এটা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মাঝ-বয়েসের বাজনা। কলকাতায় বাজানো। শুনে দ্যাখ কী অসাধারণ।'

বাজনা খানিকটা এগোনোর পরে অমিতাভ বলল, 'জয়জয়ন্তী নিয়ে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর গল্পটা মনে আছে তোর?'

'খুব মনে আছে। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ভাল করে না শিখে রেডিয়োতে জয়জয়ন্তী বাজানোর পর রাধুবাবুর কাছে প্রচণ্ড ঝাড় খেয়েছিলেন। তারপর আসল জয়জয়ন্তী শেখা।'

আদিত্যর কথার মাঝখানেই সুর মধ্যম-গান্ধার হয়ে খুব সহজভাবে রেখাবে গিয়ে দাঁড়াল আর অমনি আদিত্যর মনে হল খুব দ্রুত একটা কাহিনি তৈরি হচ্ছে। যেন একটা ক্লান্ত মানুষের ঘরে ফিরে আসার কাহিনি। পথে কত নদী, কত পাহাড়, কত রাস্তা সে পেরিয়ে এসেছিল। কত দুঃখ, কত মনোরম বেদনা পেরিয়ে সে ঘরে ফিরে আসছে। এটা কি পার্থর গল্প? পার্থ কি ফিরে আসতে পারবে? সুর একবার মধ্যম-গান্ধার হয়ে রেখাবে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আবার কখনও কোমল নিষাদ ধৈবত বেয়ে পঞ্চমে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড বিশ্রাম নিচ্ছে। গান-বাজনা জানা পণ্ডিতেরা কীভাবে চিন্তা করে আদিত্য জানে না, কিন্তু তার মনে হয় জয়জয়ন্তী রাগে অবরোহণ অর্থাৎ ফিরে আসাটাই আসল। পঞ্চমে কিংবা রেখাবে ফিরে আসা। নিজের অজান্তেই আদিত্যর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কী বাজাচ্ছে রে!'

ঘন্টাখানেক পরে, যখন জয়জয়ন্তী সদ্য শেষ হয়েছে, পাশের ঘর থেকে অমিতাভর মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। পাশের ঘরে গিয়ে অমিতাভ মোবাইলে কী কথা বলল আদিত্য খেয়াল করেনি, তার মাথায় তখনও জয়জয়ন্তী বাজছে। একটু পরে অমিতাভ ফিরে এসে বলল, 'রত্না ফোন করেছিল। সর্বনাশ হয়েছে। ওর এক ইস্কুলের বন্ধু তার স্বামী এবং দুটি বাচ্চাকে নিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসছে। এপাড়ায় ঠাকুর দেখতে এসেছে। সিংঘি পার্ক, একডালিয়ার ঠাকুর দেখে আমাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে। তারপর দেশপ্রিয় পার্কের দিকে ঠাকুর দেখতে যাবে। অর্থাৎ আমাদের গান শোনার দফা রফা। রত্না এখনই ওপরে আসছে। আমি একা তো আর ওদের সামলাতে পারব না।'

মিনিট পাঁচেক পরে রত্না নিপুণ হাতে প্লেটের ওপর কিছু মিষ্টি সাজাতে সাজাতে বলছিল, 'গার্গী মানুষটা মোটেই খারাপ নয়। শুধু একটু বেশি কথা বলে। আর ওর স্বামীও মানুষ ভাল, তবে তোদের মতো আঁতেল নয়।' তারপর নিজের স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কিন্তু ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।'

''আমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেছি?' অমিতাভ নিরীহ গলায় বলল, 'যদিও তোমার বন্ধু এসে আমাদের গান শোনাটা একেবারে মাটি করে দিল।'

'সারা পুজো ধরেই তো গান শুনবে। একটা সন্ধে না হয় না শুনলে। তাছাড়া গার্গী আর ওর স্বামীকে তো তুমি চেন।' রত্নার কথা শেষ হতে না হতে দরজায় বেল।

গার্গী বিশ্বাস ও তার স্বামী মৈনাক বিশ্বাস, দুজনেই ব্যাঙ্কে চাকরি করে। গার্গী ফর্সা, মোটাসোটা, গিন্নিবান্নি, মুখশ্রী চমৎকার, তিরিশ দশক হলে অনায়াসে সুন্দরী বলা যেত, এখন অবশ্য সুন্দরের ধারণা পালটেছে। তার

স্বামী কালো, রোগা, লম্বা, চুলে সামান্য পাক ধরেছে, যদিও মুখ দেখলেই বোঝা যায় বয়েস বেশি নয়। তাদের ছেলে দুটো পিঠোপিঠি, একজন ক্লাশ থ্রি, একজন ফাইভ। ওরা টুবলুর সঙ্গে নিচে সোসাইটির ঠাকুর দেখতে গেল। রত্নার আশঙ্কা ঠিক, গার্গী অনর্গল কথা বলছে।

গার্গী বলছিল, 'রাস্তায় কী প্রচণ্ড ভিড় রে বাবা। সকালে বৃষ্টি হল বলে ভাবলাম ভিড়টা একটু কম হবে। কোথায় কম! হাঁটাই যায় না। খালি ভয় হচ্ছিল, ভিড়ের চাপে ছেলে দুটো বুঝি হাত ছেড়ে চলে যাবে। আমি তো ওদের বাবাকে বারবার বলছিলাম, ছেলেদের ওপর নজর রেখো। এমন জানলে বেরোতামই না।'

'বেরোলি বলে তাও দেখা হল। তোর ছেলেদের সেই কবে দেখেছিলাম।' রত্না আন্তরিকভাবে বলল।

'আসলে আমার কর্তার খুব ঠাকুর দেখার শখ। সে-ই ছেলেদের তাতায়। আমি মোটা মানুষ অত হাঁটতে পারি নাকি?'

আদিত্য দেখল মৈনাক বিশ্বাস মিটিমিটি হাসছে। সে তার স্ত্রীর ঠিক উলটো, কথা প্রায় বলেই না। রত্না হঠাৎ খেয়াল করল তার অতিথিদের সঙ্গে আদিত্যর আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি।

গার্গী বলেই যাচ্ছিল, কাল আবার বাবা-ছেলেদের নর্থ ক্যালকাটায় ঠাকুর দেখার প্ল্যান। আমার ভাবতেই গায়ে জ্বর আসছে। আমি তো ভাবছি দাদার ওখানে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রত্না বলল, তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি, ইনি আদিত্য মজুমদার, আমাদের কলেজের বন্ধু, পুজোর কটা দিন আমাদের বাড়িতে থাকছেন।'

আদিত্য হাত তুলে নমস্কার করল। গার্গী আদিত্যকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনিও রত্নাদের মতো কোথাও পড়ান নাকি?'

পেশা নিয়ে প্রশ্ন হলে আদিত্য এখনও খুব বিব্রত বোধ করে। সে যে একজন পেশাদার বেসরকারি গোয়েন্দা এটা অচেনা কাউকে বলতে তার ভীষণ সংকোচ হয়। তার অস্বস্তিটা আন্দাজ করতে পেরে রত্না তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা গার্গী, তুই স্কটিশে কেমিস্ট্রি পড়তিস না?'

'পড়তামই তো।'

'তারপর কলকাতায় এম এস সি পড়েছিলি?'

'ভর্তি হয়েছিলাম। এক বছর ক্লাশও করেছিলাম। তারপর ব্যাঙ্কের চাকরিটা পেয়ে গেলাম। অতএব উচ্চশিক্ষায় ইতি।'

'আচ্ছা, চন্দ্রা বলে একজন আমাদের সময় প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়ত, কলকাতায় এম এস সি পড়েছিল। নকশাল করত। তুই চিনতিস?'

'নকশাল চন্দ্রা? প্রেসিডেন্সিতে পড়ত?' গার্গী বিশ্বাস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর অনিশ্চিত গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে মনে করতে পারছি। তবে চেনার কথা নয়। চন্দ্রা তো ফিজিক্স পড়ত আর আমি কেমিস্ট্রি। তাও কলেজ আলাদা। আসলে কেয়া বলে আমার এক বন্ধু স্কটিশে ফিজিক্স পড়ত। পরে এমএসসি পড়তে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে চন্দ্রার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কেয়াই চন্দ্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। দুএকবার কেয়ার সঙ্গেই চন্দ্রাকে দেখেছি। কিন্তু চন্দ্রার কথা হঠাৎ উঠল কেন?' গার্গী খানিকটা অবাক।

'কেন উঠল বলছি।' রত্না উত্তর দিল। 'তুই তো জানিস চন্দ্রা একসময় নকশাল করত। তারপর কী হল সব ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে ও একটা ইস্কুলে পড়াচ্ছিল। মাস খানেক হল চন্দ্রা নিখোঁজ হয়ে গেছে। পুলিশও তার হদিশ করতে পারছে না। তাই ভাবছিলাম, তুই চন্দ্রার কোনও হদিশ দিতে পারিস কিনা।'

'আমি তো চন্দ্রাকে ভাল করে চিনতামই না। কী করে তার হদিশ দেব?' গার্গীর অবাক ভাব এখনও কাটেনি।

'আপনি কি এমন কারও হদিশ দিতে পারেন যে চন্দ্রার খবর জানে? ওই যে কেয়া না কার কথা বললেন?' আদিত্য একটু উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কেয়া, মানে কেয়া বাগচির ফোন নম্বর দিতে পারি। কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল হত।' আদিত্যর দিকে তাকিয়ে খানিকটা উদ্ধতভাবেই বলল গার্গী বিশ্বাস।

'আদিত্য আমাদের মতো মাস্টারি করে কিনা জিজ্ঞেস করছিলি না?' রত্না আদিত্যর সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। 'আদিত্য মাস্টারি করে না। আদিত্য একজন পেশাদার বেসরকারি গোয়েন্দা। চন্দ্রলেখা সেনকে খুঁজে বার করার কাজটা ও পেয়েছে।'

'বেসরকারি গোয়েন্দা!' এতক্ষণ পরে মৈনাক বিশ্বাসের গলা শোনা গেল। গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়। স্বামী-স্ত্রী একজন বেসরকারি গোয়েন্দার অস্তিত্বটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। তাদের ঘোর কাটতে কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর গার্গী বলল, 'চন্দ্রার সম্বন্ধে ভাল করে জানতে গেলে কেয়া বাগচির সঙ্গেই কথা বলতে হবে। কেয়া এখনও বিয়ে করেনি, বাগবাজারে একটা মেয়েদের হস্টেলে থাকে। ওর সঙ্গেই চন্দ্রার যোগাযোগ সব থেকে বেশি। আমি কেয়ার ফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছি।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

আজকাল শহরের রাস্তায় রাস্তায় দৈত্যাকার সব মুদিখানা হয়েছে। এদের এক সময় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স বলা হত, এখন মার্কিনি কায়দায় বলা হয় সুপার মার্কেট। সাবান-পাউডার থেকে বেডকভার, কেক-বিস্কুট থেকে কাটোয়ার ডাঁটা, লম্বা হাতলওলা আধুনিক ন্যাতা ও সম্মার্জনী থেকে শুরু করে ককটেল সসেজ—জগতের হেন জিনিস নেই সেখানে পাওয়া যায় না। পাড়ার পুরোনো মুদিখানাগুলো ভয়ে ভয়ে আছে, এই বুঝি তাদের ঝাঁপ একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু এখন অব্দি তারা টিকেই রয়েছে, সম্ভবত এই কারণে যে, আদিত্যর মতো কোনও কোনও খদ্দের এখনও মহাবিপনীর আন্তর্জাতিক পরিবেশে অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। আদিত্যর মেসবাড়ির কাছে পাড়ার মুদিখানা বলতে একটাই, দুই ভাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সেটিকে চালু রেখেছে। বড় ভাই গোপাল গম্ভীর স্বভাবের, কথা বলে কম। ছোট নেপাল হড়বড় করে কথা বলে, তার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না। এরই মধ্যে, মাস ছয়েক হল, বড় রাস্তার ওপরে তিনটে তলা জুড়ে মাথা তুলেছে নতুন একটা সুপার মার্কেট। ছোট ভাই নেপাল আজকাল প্রায়শই উৎকণ্ঠিত হয়ে আদিত্যকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা দাদা, আপনারা তো অনেক লেখাপড়া করেছেন, পাঁচটা জায়গায় যান, পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলেন। আপনার কি মনে হয়, আমরা আর ব্যবসা-পত্তর চালাতে পারব?' আদিত্য তাকে এই বলে আস্বস্ত করে যে, এই গরিব দেশে যতই সুপার মার্কেট গজিয়ে উঠুক, পাড়ার মুদিখানা অত সহজে বন্ধ হবার নয়।

এসব নিয়ে অবশ্য আজকাল খবর কাগজে পোস্ট-এডিট ছাপা হচ্ছে, টেলিভিশনের টক-শোতে পণ্ডিতেরা এসে তুমুল তর্কাতর্কি করছে। আদিত্য টিভি তেমন একটা দেখে না, খবর কাগজের পোস্ট-এডিটগুলোও মন দিয়ে পড়ে না। তাছাড়া অর্থনীতির সূক্ষ্ম যুক্তি-টুক্তিতেও তার তেমন উৎসাহ নেই। সে শুধু লক্ষ করেছে, এই আশ্চর্য দেশে দুটো-তিনটে শতাব্দী কেমন অনায়াসে পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। বস্তির পাশে বিরাজ করছে হাইরাইজ, সরু গলির মধ্যে হাতে-টানা রিক্সার পেছন পেছন গজেন্দ্রগমনে চলেছে মার্সিডিস বেনজ। তাহলে সুপার মার্কেটের পাশাপাশি সনাতন মুদিখানাই বা চলবে না কেন? আদিত্যর একটা সামন্ত্রতান্ত্রিক সত্তা আছে যার ফলে ধোপা-নাপিত-মুদির ক্ষেত্রে একটু ব্যক্তিগত ছোঁয়া না থাকলে তার ভাল লাগে না। এই ব্যক্তিগত ছোঁয়ার লোভে সে নেহাত অপ্রয়োজনেই গোপাল-নেপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলে। তাদের খোঁজখবর নেয়। আর পারতপক্ষে বড়রাস্তা পেরিয়ে সুপার মার্কেটে জিনিসপত্র কিনতে যায় না।

একটাই সমস্যা। রবিবার সন্ধেবেলা গোপাল-নেপালের দোকানটা বন্ধ থাকে। সপ্তাহের মধ্যে ওই একটা বেলা দুভাই বাড়ি বসে বিশ্রাম নেয়। তখন হঠাৎ কিছুর দরকার পড়লে সুপার মার্কেট ছাড়া গতি নেই। অমিতাভ-রত্নার বাড়ি থেকে পুজোর ছুটি কাটিয়ে আদিত্য যেদিন মেসে ফিরে এল সেদিন একে রবিবার, তায় লক্ষ্মী পুজো। ঘড়িতে সন্ধে সাতটা বেজে গেছে। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। দোকানপাট সব বন্ধ। সাধারণ রবিবারে মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপর তবু দুএকটা সবজিওলা বসে, ঠেলাগাড়ি দাঁড় করিয়ে দুএকজন পকৌড়া বিক্রি করে। আজ তারাও কেউ নেই। মেসে ফিরে আদিত্য দেখল টুথপেস্ট ফুরিয়ে গেছে, সাবানের অবস্থাও তথৈবচ। তাছাড়া কিছু বিস্কুট আর এক কৌটো কফি কিনে রাখলেও ভাল হয়। কিছুদিন হল সে দুটো ইলেকট্রিক কেটলি কিনেছে, একটা বাড়ির জন্য, একটা আপিসের জন্য। চা-কফি নিজেই বানিয়ে নিচ্ছে।

রাস্তার ওপারে সুপার মার্কেট। আদিত্য রাস্তায় বেরিয়ে দেখল সেটা তখনও খোলা রয়েছে। বিপনীতে ঢোকার মুখে নীল ইউনিফর্ম পরা একটি নিপাট ভালমানুষ চেহারার যুবক তার হাতের যান্ত্রিক ডাণ্ডাটা

আদিত্যর আপাদমস্তক বোলাতেই যন্ত্রটা থেকে নানারকম ধাতব শব্দ বের হতে লাগল। তাতে যুবকটি কী বুঝল সেই জানে। আদিত্য ধরে নিল, যুবকটি বুঝে গেছে, আদিত্যর কাছে বোমা-ছুরি-পিস্তল ইত্যাদি ভয়ঙ্কর কিছু নেই। কারণ সে একগাল হেসে বলল, 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম স্যার।' আদিত্যর মনে পড়ে গেল তার এক বন্ধুর গল্প। বন্ধুটি প্রথম মার্কিন দেশে পৌঁছনোর কয়েকদিন পর ইউনিভার্সিটির বাসে উঠে টাল সামলাতে না পেরে এক মেমসাহেবের পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ'।

সুপার মার্কেটটি একটি নাম করা চেন। জিনিসপত্রে ঠাসা, তবে এই লক্ষ্মী পুজোর রাত্তিরে প্রায় খদ্দেরহীন। আদিত্য দেখল, এক কোণে একটি পরিবার, অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী এবং বাজার করার ঠেলাগাড়ির ওপর উপবিষ্ট তাদের বছর তিনেকের মেয়ে, শাক-সব্জীর বাজার করছে। আর একটু দূরে মাঝবয়সী এক মহিলা পসরা উপচে পড়া ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেছেন। মনে হয় তাঁর আরও কিছু সওদা করার মতলব আছে। নিজের জিনিসগুলো খুঁজে নিতে আদিত্যর খুব বেশি সময় লাগল না। জিনিসগুলো একটা বাস্কেটে ভরে সে কাউন্টারের দিকে এগোতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে একটি মেয়ের গলা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইন্সট্যান্ট নুডলস কোনদিকে আছে, জানেন?'

আদিত্য পেছন ফিরে দেখল বছর পঁচিশের একটি ছোটখাট শ্যামবর্ণ মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটির বয়কাট চুল, ছোট নাক, চোখের দৃষ্টিতে সারল্য, দুষ্টুমি এবং অকৃত্রিম বিস্ময়ের চমৎকার মিশেল ঘটেছে। প্রচলিত অর্থে সুন্দরী হয়ত নয়, তবে নিঃসন্দেহে অ্যাট্র্যাক্টিভ। মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরটা আদিত্যর জানার কথা ছিল না, কারণ এই বিপনীতে মাত্র দু-একবারই সে এসেছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কয়েক মিনিট আগে স্ট্যাক থেকে বিস্কুট তুলতে গিয়ে সে খেয়াল করেছিল বিস্কুটের ঠিক উল্টোদিকে নুডল, ম্যাকারনি, স্প্যাগেটি ইত্যাদি রয়েছে। তাই বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলল, 'সামনের দুটো আইল ছেড়ে তৃতীয়টার বাঁদিকে।'

একটাই কাউন্টার খোলা। সেখানে পৌঁছে আদিত্য দেখল সেই মাঝবয়সী মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে উপুড়-চুপুড় ঠেলাগাড়ি থেকে একটা একটা করে জিনিস কাউন্টারে নামিয়ে রাখছেন। তার মানে ঝাড়া পাঁচ মিনিটের ধাক্কা। আদিত্য ভদ্রমহিলার পেছনে লাইন দিল, তারপর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর তার মনে পড়ল কিছুদিন হল শ্যাম্পুটা ফুরিয়েছে, অবিলম্বে একটা নতুন বোতল কেনা দরকার। সে খেয়াল করেনি ইতিমধ্যে সেই শ্যামলা মেয়েটি তার পেছনে এসে লাইন দিয়েছে। সে মেয়েটিকে 'আপনি এগিয়ে যান' বলে শ্যাম্পুর খোঁজে লাইন থেকে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন শ্যাম্পুর বোতল এবং নেহাতই অদরকারি এক প্যাকেট পট্যাটো চিপস নিয়ে ফিরে এল, তখন শ্যামলা মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে ক্রেডিট কার্ড বার করে দাম মেটাচ্ছে।

কেনা জিনিসগুলো ব্যাগে নিয়ে আদিত্য বাইরে এসে দেখল এক কাণ্ড ঘটেছে। সেই শ্যামলা মেয়েটি বিপনীর মূল ফাটকের সামনে পড়ে গেছে। তার প্লাস্টিক ব্যাগের জিনিসপত্র ব্যাগ থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আদিত্য এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করল। তারপর সে আর মেয়েটি মিলে মাটিতে ছড়ানো জিনিসগুলো এক এক করে আবার ব্যাগে তুলে ফেলল। সুবিধের ব্যাপার প্লাস্টিকের ব্যাগ বৃষ্টিতে ভিজলেও ছিঁড়ে যায় না।

'আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব।' মেয়েটি একটু ধাতস্থ হয়ে বলল। 'বৃষ্টির জলে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।' নিজের দুর্গতিতে মেয়েটি নিজেই হাসল।

'সাবধানে থাকবেন। বাড়িতে আর্নিকা থাকলে কয়েকটা খেয়ে নিতে পারেন। নাহলে হয়ত দেখবেন কাল সকালে গায়ের ব্যথায় উঠতে পারছেন না।' আদিত্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল।

'বাড়িতে এক শিশি আর্নিকা আছে বোধহয়।' মেয়েটি অনিশ্চিত গলায় বলল।

বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে ছাতা নেই, এখন ফিরতে গেলে একেবারে ভিজে যেতে হবে। সারা পুজো জুড়ে বৃষ্টিটা জ্বালিয়েছে, লক্ষ্মী পুজোতেও রেহাই দিচ্ছে না। দোকানের বাইরে শেডে আদিত্যর পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি অপেক্ষা করছে।

'কী বিচ্ছিরি বৃষ্টি বলুন তো, সেই ষষ্ঠীর দিন থেকে শুরু হয়েছে।' মেয়েটি বলল।

মুখ দিয়ে একটা সম্মতিসূচক শব্দ করল আদিত্য।

'আপনি কি এই পাড়াতেই থাকেন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে একটা গলি ঢুকে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। ওই গলিটা দিয়ে দুপা গেলেই শংকর হোটেল। তার তিনতলায় আমি থাকি।'

'হোটেলে থাকেন?' মেয়েটি বেশ অবাক হয়েছে।

'ওটা পুরোপুরি হোটেল নয়। তিনতলার গোটাটাই মেস। ওই মেসে একটা ঘর নিয়ে আমি থাকি।' মেয়েটির গায়ে-পড়া ভাবে আদিত্যর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।

মেয়েটি যেন আদিত্যর মনের ভাব বুঝতে পারল। মুখে বলল, 'নিশ্চয় ভাবছেন এত প্রশ্ন কেন করছি। আসলে মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল কলকাতায় এসেছি। সেক্টর ফাইভে নতুন চাকরি। কলকাতা বলতে গেলে চিনিই না। আমার বাড়ি রায়গঞ্জে। তাও ঠিক রায়গঞ্জ শহরে নয়, শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মালদা আর রায়গঞ্জের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। আমি অবশ্য রায়গঞ্জ শহরে পড়াশোনা করেছি। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি থেকে অঙ্ক অনার্স, তারপর ওখান থেকেই কম্পিউটার সায়েন্স-এ মাস্টার্স। ওই যে দূরে হাইরাইজ বাড়িটা দেখছেন? ওটার পাঁচতলায় আমার কাকার একটা ফ্ল্যাট আছে। কাকা-কাকিমা দিল্লিতে থাকে। ফ্ল্যাটটা ফাঁকাই পড়েছিল, তাই আমাকে থাকতে দিয়েছে। আমারও সুবিধে হল আর কাকাও ফ্ল্যাট দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক পেয়ে গেল।' মেয়েটি থামল। বৃষ্টিটা এক নাগাড়ে হয়েই চলেছে।

'ওই দেখুন আমার নামটাই বলা হয়নি। আমার নাম নূপুর, নূপুর মণ্ডল। কলকাতায় প্রায় কাউকেই চিনি না। একটা দুটো চেনা ভাল লোক কাছে-পিঠে না থাকলে আমার খুব ভয় করে। তাই আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমালাম।'

'ভাল করেছেন। কিন্তু আমি ভাল লোক বুঝলেন কী করে?'

'আমি পড়ে যেতে আপনি যেভাবে সাহায্য করলেন! আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আপনি ভদ্রলোক। খুব বনেদি বাড়ির লোক। আমি মানুষ চিনতে কখখনো ভুল করি না।'

'আপনি বুঝি অনেক মানুষ দেখেছেন?' আদিত্য মজা করার গলায় বলল।

'খুব বেশি দেখিনি অবশ্য, তবে বুঝতে পারি।' মেয়েটি হাসল।

আদিত্য খেয়াল করল মেয়েটি হাসলে তার চোখ দুটোও হাসে। সে বুকের কাছে দুই হাত জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলল, আমার নাম আদিত্য মজুমদার। কোথায় থাকি সেটা তো আগেই বলেছি।'

বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে। একেবারে যে থামেনি সেটা রাস্তার আলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়। এর থেকে কম বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে গেলে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে। আদিত্য বলল, 'বৃষ্টিটা ধরেছে মনে হচ্ছে। এগোবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন, চলুন। এর থেকে আর কমবে না।' মেয়েটি মাটিতে নামিয়ে রাখা বাজারের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। তারপর সেটা আবার নামিয়ে রেখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ, আমাকে আপনি বলবেন না। নাম ধরে ডাকবেন। আমি তো আপনার থেকে কত ছোট! আপনার ছোট বোনের মতো।'

ছোট বোন! আদিত্য একটু অপ্রস্তুত। সে বলল, 'অনুমতি দিলে তাই ডাকব।' এর থেকে উপযুক্ত কোনও উত্তর তার মাথায় এল না।

হ্যারিসন রোড একেবারে ফাঁকা। দুজনে সহজেই বড় রাস্তা পেরিয়ে গেল। মেসের গলির মুখে পৌঁছে আদিত্য বলল, 'আমার মোবাইল নম্বরটা বলছি। ওই নম্বরে একটা ফোন করলে আমিও আপনার, মানে,

তোমার নম্বরটা সেভ করে নিতে পারব। আজ এগোচ্ছি। কোনও দরকার হলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফোন কোরো। আর আর্নিকাটা অবশ্যই খেয়ে নিও।'

নিজের ঘরে ফিরে তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল মুছতে মুছতে আদিত্য ভাবছিল, গ্রামের মেয়েরা এত সহজে দাদা-বোন পাতিয়ে ফেলে নাকি? ঠিক যেন পঞ্চাশ দশকের বাংলা সিনেমা। তাছাড়া মেয়েটাকে খুব গ্রাম্য বলে তো মনে হল না। গ্রামের মেয়েদের কি বয়কাট চুল হয়? তারা কি ইন্সট্যান্ট নুডল খায়? মেয়েটা দিব্যি তো ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বাজার করছিল। হয়ত শহরের অভ্যেসগুলো আজকাল গ্রামেও পৌঁছে গেছে। নাকি এর মধ্যে অন্য কিছু আছে?

(২)

আদিত্যর পুলিশ বন্ধু গৌতম দাশগুপ্ত, আই পি এস, বছর খানেক হল ডেপুটেশনে দিল্লি গেছে। এর ফলে আদিত্যর বেশ অসুবিধে হচ্ছে। তার কাজে পুলিশের কাছ থেকে সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। প্রায়শই এটা-ওটা জানবার দরকার হয়ে পড়ে। গৌতমের কাছ থেকে যেসব গোপন তথ্য সে সহজেই পেয়ে যেত, এখন সেগুলো পেতে গেলে কিছুটা চেষ্টা করতে হয়, সব সময় যে পাওয়া যায় তাও নয়। অবশ্য গৌতম যাবার আগে লালবাজারে দুএকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে গেছে। খুব অসুবিধে না হলে, তারা আদিত্যকে সাহায্যই করে। তাছাড়া কয়েকটা জটিল রহস্যের সামাধান করে পুলিশ মহলে তার মোটামুটি নামও হয়েছে। কিন্তু গৌতম লালবাজারে থাকার সুবিধেটা ছিল অন্যরকম।

আদিত্য তার আপিসে বসে ভাবছিল। চন্দ্রা সম্বন্ধে পুলিশের খাতায় কী তথ্য আছে সেটা জানা দরকার। নকশাল করলে পুলিশের খাতায় নাম থাকাটা সম্ভব। তবে পুলিশের খাতায় নাম থাকতে গেলে মাওবাদী ইনভলভমেন্ট কিছুটা গভীর হতে হবে। চন্দ্রার কতটা ইনভলভমেন্ট ছিল, জানা নেই। জানতে হবে। কার সঙ্গে কথা বলবে? গৌতম যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে? নাকি প্রথমে গৌতমের সঙ্গে কথা বলে নেবে?

সাত-পাঁচ ভেবে গৌতমের নম্বরটাই ডায়াল করল আদিত্য। রিং টোন খানিকক্ষণ কিশোরকুমারের গলায় 'জীবন সে ভরি তেরি আঁখে' শোনানোর পর নিজে থেকেই থেমে গেল, অর্থাৎ গৌতম ফোনটা ধরল না। হয়ত ফোনটা সাইলেন্ট করে মিটিং করছে। আদিত্য মোবাইলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটের প্যাকেটে আজকাল ধূমপায়ীদের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সব বার্তা দেওয়া থাকে। কর্কটাক্রান্ত ফুসফুসের কিছু সিনিস্টার ছবিও থাকে। আদিত্য যত ভাবে প্যাকেটের দিকে তাকাবে না, তবু বারবার চোখ পড়ে যায়। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে সে প্যাকেটটাকে টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল যাতে আর সেটাকে দেখতে না হয়। তারপর মোবাইলটা তুলে নিয়ে আর একবার গৌতমের নম্বরটা লাগাল। এবারেও কিশোরকুমার খানিকক্ষণ 'জীবন সে ভরি' শোনালেন, কিন্তু গৌতম ফোনটা ধরল না। গৌতম নিশ্চয় ব্যস্ত আছে, নাহলে ফোনটা অবশ্যই ধরত। গৌতমকে একটা মেসেজ করতে করতে আদিত্যর খেয়াল হল, 'জীবন সে ভরি' গানটা রাগেশ্রীর ওপর। গানটা সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু আগে কখনও খেয়াল করেনি। চমৎকার সুর, সুরটা সে গুনগুন করছে এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। গৌতম ফোন করছে।

'একটা মিটিং চলছে। তোকে ঘন্টাখানেক বাদে ফোন করছি।' গৌতম ফিসফিস করে বলল।

'নো প্রবলেম। তাড়া নেই। সময় পেলে একটা ফোন করিস।' ফোনটা নামিয়ে রাখল আদিত্য।

গৌতম ফোন করল প্রায় দুঘন্টা বাদে, ঘড়িতে তখন দেড়টা বেজে গেছে। 'একটা ম্যারাথন মিটিং চলছে রে। এতক্ষণে লাঞ্চ-ব্রেক হল। আড়াইটেতে আবার শুরু হবে। ভাবলাম, খেতে যাবার আগে তোর সঙ্গে কথাটা সেরেনি। বল কী বলছিলি।'

'খুব তাড়াতাড়ি বলছি যাতে তুই লাঞ্চটা মিস না করিস। তোর কি মনে আছে চন্দ্রা বলে একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়ত, নকশাল করত?'

'ঠিক মনে পড়ছে না।' গৌতম খানিকটা ভেবে বলল। 'আসলে সায়েন্সের মেয়েদের আমি ততটা চিনতাম না।'

'চন্দ্রা পুরুলিয়ার গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করত। গরিব মেয়েদের পড়াত। সেই কাজ ছেড়ে সে কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে একটা ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ওপর ভার পড়েছে তাকে খুঁজে বার করার। আমি জানতে চাই নকশাল হিসেবে পুলিশের খাতায় চন্দ্রার নাম আছে কিনা। এটা তোর সাহায্য ছাড়া জানা অসম্ভব। তুই কি লালবাজারে কাউকে বলে দিতে পারিস, যে আমাকে এই ব্যাপারে একটু হেল্প করতে পারে?'

গৌতম আবার খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'তুই আকাশ শ্রীবাস্তব বলে একজনের সঙ্গে কথা বল। আমি ফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ফোন করে বলেও দিচ্ছি। আকাশ বেশ কিছুদিন পুরুলিয়ার এস পি ছিল। সম্প্রতি লালবাজারে বদলি হয়ে এসেছে। পুরুলিয়া-ঝাড়খন্ড বর্ডারের মাওবাদীদের বিষয়ে ওর থেকে ভাল আর কেউ জানে না। আমি ওর নম্বরটা তোকে এস এম এস করে দিচ্ছি। তুই সন্ধে ছ'টার পর ওকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিস। আমি ওকে সেই রকমই বলে রাখব।'

'তুই কি আর এর মধ্যে কলকাতায় আসছিস?'

'নভেম্বরের শেষে আসার প্ল্যান আছে। আমার এক ভাইজির বিয়ে।'

'তখন তো দেখা হবেই। কিন্তু তার আগেই তোকে ফোন করে চন্দ্রার উপাখ্যানটা ডিটেলে জানিয়ে দেব। মনে হয়, তোর ইন্টারেস্ট হবে। এখন রাখছি। টা টা।'

'ওকে। টা টা।'

(৩)

আকাশ শ্রীবাস্তব সেই ধরনের আই পি এস অফিসার যাঁরা নিজেদের পদমর্যাদা নিয়ে সদা সচেতন। অর্থাৎ গৌতমের ঠিক উল্টো। উত্তরপ্রদেশের লোক, ওয়েস্ট বেঙ্গল কাডার বলে বাংলাটা কিছুটা বলতে পারে, তবে টান আছে। গৌতম বলে না দিলে আকাশ শ্রীবাস্তব আদিত্যর সঙ্গে কথা বলত বলে মনে হয় না। সেটা টেলিফোনে কথোপকথনের সময় রাখঢাক না করে আদিত্যকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল সে। বলল, প্রাইভেট জাসুসদের সঙ্গে সে কথা বলে না। কিন্তু গৌতম দাশগুপ্ত তার থেকে বেশ কয়েক বছরের সিনিয়র অফিসার, পদমর্যাদাতেও চার ধাপ উঁচুতে। তিনি অনুরোধ করেছেন বলে সে আদিত্যকে সময় দিচ্ছে। বড়জোর মিনিট দশেক সময় দিতে সে রাজি আছে, তার বেশি নয়। দুপুর সাড়ে তিনটেতে লালবাজার আসতে হবে। গেটে আদিত্যর নাম বলা থাকবে। দেরি যেন একদম না হয়।

শ্রীবাস্তবের কথা বলার ভঙ্গীতে আদিত্য রীতিমত অপমানিত বোধ করছিল। একটা পরীক্ষা পাশ করে আই পি এস হয়ে এরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কিন্তু ভিখিরিদের তো আর অত বাছবিচার করলে চলে না। তাকে এখানে ভিখিরিই বলতে হবে, তথ্যের ভিখিরি। সাড়ে তিনটের মিনিট দশেক আগেই লালবাজারে পৌঁছে গেল আদিত্য। তারপর প্রায় দেড় ঘন্টা বসে থাকতে হল। বোঝা গেল, সময় রক্ষার দায়টা তার একার, যেহেতু দরকারটাও তারই। শ্রীবাস্তব নিজের ইচ্ছে মতো দেরি করতেই পারে। অপেক্ষা করতে করতে যখন আদিত্য ভাবতে শুরু করেছে আজ আর শ্রীবাস্তবের দেখা পাওয়া যাবে না, তখন এক প্লেন ড্রেসের পুলিশ এসে তার নাম ধরে ডাকল।

আকাশ শ্রীবাস্তবের চেহারাটা লম্বা চওড়া, তার ওপর নাকের নিচে এক জোড়া জাঁদরেল মিলিটারি গোঁফ। গলার বাজখাঁই আওয়াজটাও চেহারার সঙ্গে মানানসই। আদিত্য ঘরে ঢুকে দেখল শ্রীবাস্তব ফাইল ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্যকে একবারও বসতে বলল না, এতক্ষণ যে আদিত্যকে অপেক্ষা করিয়েছে তার জন্যেও ক্ষমা চাইল না। শুধু কেজো গলায় বলল, 'উই হ্যাভ সাম ইনফরমেশন অন দি মাওইস্ট গার্ল ইউ ওয়ান্টেড টু নো অ্যাবাউট। হিয়ার ইজ দ্যা ফাইল। বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যা টাইম টু টক টু ইউ নাউ। আমার একজন অফিসার আপনার সোঙ্গে কোথা বোলে লিবেন।'

বলতে বলতে উর্দি পরা ছিপছিপে চেহারার একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকলেন। এরও গোঁফ আছে, তবে শ্রীবাস্তবের মতো অত প্রবল নয়। বয়েস, আদিত্য আন্দাজ করল, বছর তিরিশ।

'ইনি ইন্সপেক্টার সমাদ্দার হচ্ছেন' শ্রীবাস্তব বলল, 'হি উইল টেল ইউ এভরিথিং।' তারপর সমাদ্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিস ইজ আদিত্য মজুমদার, দ্য পার্সন হু ওয়ান্টস টু নো অ্যাবাউট দ্য মাওইস্ট গার্ল। হি ইজ দাশগুপ্তা সাহাব'স খাস দোস্ত। সো প্লিজ হেল্প হিম অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান। আউর ইয়ে ফাইল আপ সাথ মে লে কে যাইয়ে। দিস ইজ চন্দ্রা সেন'স ফাইল।'

আদিত্যর মনে হল এর থেকে বেশি ভদ্র ব্যবহার আকাশ শ্রীবাস্তবের পক্ষে করা সম্ভব নয়। 'আসুন স্যার।' ফাইল নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সমাদ্দার বলল।

সমাদ্দারের বসার জায়গাটা ইংরেজি করে বললে কিউবিকল, কিন্তু আসলে একটা খুপরি। খুপরির মধ্যে একটা টেবিল, তার ওপর অগোছালোভাবে কিছু ফাইল, কিছু ফাইল মেঝেতেও নামানো রয়েছে। সমাদ্দার তার হাতের ফাইলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। টেবিলের একদিকে একটা চেয়ার রয়েছে সমাদ্দারের বসার জন্য, উল্টোদিকে একটাও চেয়ার নেই। ভিজিটারদের জন্য অন্তত একখানা চেয়ার থাকা উচিত ছিল।

'কে যে চেয়ারগুলো নিয়ে চলে যায়!' সমাদ্দার বিরক্ত গলায় বলল। তারপর পাশের কিউবিকল থেকে একটা চেয়ার টানতে টানতে নিয়ে এসে আদিত্যর সামনে রেখে বলল, 'বসুন স্যার।'

আদিত্য সমাদ্দারের দিকে তাকিয়েছিল। সমাদ্দারকে বেশ চেনা চেনা লাগছিল তার। সে বলল, 'আপনি কি গৌতম দাশগুপ্তর টিমে ছিলেন?'

'অবশ্যই ছিলাম স্যার। আপনি কি আমাকে মনে করতে পারছেন? আপনাকে কিন্তু আমি খুব ভাল করে চিনি স্যার। অবশ্য আপনাকে লালবাজারে এখন অনেকেই চেনে। অনেকেই জানে আপনিই চৌধুরি বাড়ির কেসটা সলভ করেছিলেন। তার আগে সেই ভূতুড়ে টেলিফোনের ব্যাপারটাও। আসলে, শ্রীবাস্তব সাহেব লালবাজারে নতুন তো, তাই আপনার কথা জানেন না। ভেবে খারাপ লাগছে, আপনাকে আজ অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি স্যার।'

আদিত্য স্বস্তি পাচ্ছিল। বিদেশ-বিভুঁইএ চেনা লোক দেখলে মানুষ যেমন স্বস্তি পায়। কিম্বা তার থেকেও বেশি। তার ভাবতে ভাল লাগছিল তাকে লালবাজারে অনেকে চেনে। কথাটা সত্যি কিনা কে জানে? হয়ত সত্যি নয়, আবার সত্যি হতেও তো পারে! আদিত্যর মধ্যে একটা ছেলেমানুষ আছে যে প্রশংসা শুনলে এখনও খুব খুশি হয়। বিশেষ করে আকাশ শ্রীবাস্তবের নাক-উঁচু ব্যবহারের পর প্রশংসাটা শুনতে বেশ ভাল লাগছে। অপেক্ষা করতে করতে সে বেশ দমে গিয়েছিল, প্রশংসাটা খানিকটা টনিকের কাজ করল। সে মুখে অবশ্য বলল, 'আমাদের মতো বেসরকারি গোয়েন্দাদের অত মান-অপমানের কথা ভাবলে চলে না। দরকার পড়লে তো বসে থাকতেই হবে।' তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, 'যে কাজটার জন্য এসেছি সেটা বলি।'

'জানি স্যার। আপনি চন্দ্রা বলে একটি মহিলার খোঁজ করছেন। এক সময় মাওবাদীদের সঙ্গে মহিলার যোগাযোগ ছিল। গত কয়েক বছর ধরে তিনি পুরুলিয়ায় একটা স্কুলে পড়াচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে সেই চাকরিটা ছেড়ে তিনি বসিরহাটের কাছে আর একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যান। মাস খানেক হল তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি আমাদের কাছে ঠিক কী জানতে চান?'

'প্রথমত জানতে চাই, মাওবাদী হিসেবে পুলিশের খাতায় চন্দ্রার নাম আছে কিনা। থাকলে, পুলিশের ধারণা অনুযায়ী, সে মাওবাদীদের সঙ্গে কতটা ইনভলভড ছিল।'

'আর কী জানতে চান?'

'দ্বিতীয়ত জানতে চাই, চন্দ্রা নিখোঁজ হয়ে যাবার পরে পুলিশ যে তদন্ত করেছিল বা এখনও হয়ত করছে, সেটা থেকে কী জানা গেছে?'

'আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা যতটা ভাল দিতে পারব, দ্বিতীয়টা ততটা পারব না। আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে শুরু করছি। তার আগে বলি, দাশগুপ্ত সাহেব দিল্লি চলে যাবার পর কিছুদিন আমি পুরুলিয়ায়

ছিলাম। এটা ঠিক রেগুলার বদলি নয়, কলকাতা পুলিশ থেকে জেলায় সাধারণত বদলি হয় না, আমি ছিলাম একটা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অংশ যাদের কাজ ছিল পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড বর্ডারে মাওবাদীদের বশে আনা। আমরা ঝাড়খণ্ড পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্সের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছিলাম। ওই সময় আমি ওই অঞ্চলের মাওবাদীদের সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পেরেছিলাম।'

'কিন্তু আপনি যখন পুরুলিয়া গেলেন তখন চন্দ্রা তো পুরুলিয়াতেই ছিল।'

'হ্যাঁ, তখনও ছিল। কিছুদিন পরে চলে গেল। কিন্তু দলটা তখনও রয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্বন্ধে ভাল করে না জানলে চন্দ্রার পুরো গল্পটা জানা যাবে না।'

'আপনি প্রথম থেকে বলুন।'

'তাই বলছি। তার আগে একটু চা বলি।'

মিনিট পাঁচেক পরে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে সমাদ্দার চন্দ্রার ফাইলটা খানিকক্ষণ পড়ে দেখল। তারপর বলতে শুরু করল, 'পুলিশ ফাইলে একটা মাওবাদী দলের কথা আছে যারা পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ডের বর্ডারে অপরেট করত। বেশ পুরোনো দল। নব্বই দশকের সেকেন্ড হাফ থেকে এদের নানারকম সাবভারসিভ অ্যাক্টিভিটির কথা পুলিশ রেকর্ডে রয়েছে। অ্যাক্টিভিটি বলতে, মূলত গ্রামের অবস্থাপন্নদের থেকে এক্সটরশান, ডাকাতি, দরকার হলে দু-একটা খুন, এছাড়া জঙ্গলের মধ্যে কিংবা হাইওয়েতে, যেখান দিয়ে পুলিশের গাড়ি যাবার কথা সেখানে, মাইন পেতে রাখা। দলটা অসম্ভব ধূর্ত। পুরুলিয়ায় অপকর্ম করে ঝাড়খণ্ডে পালায় আবার ঝাড়খণ্ডে গণ্ডগোল পাকিয়ে পুরুলিয়া ফিরে আসে। তখনও অবশ্য বিহার-ঝাড়খণ্ড ভাগাভাগি হয়নি, পরে হল। এই রাজ্যের পুলিশ আর তখনকার বিহার পুলিশ একত্র হয়েও দলটাকে ধরতে পারছিল না।'

কথা বলতে গিয়ে সমাদ্দারের চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সেটাকে এক চুমুকে গিলে নিয়ে সমাদ্দার একটা মুখবিকৃতি করল। 'এই চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে একদম খাওয়া যায় না স্যার।' সমাদ্দার তার মুখবিকৃতির কারণ দর্শাল, যদিও তার কোনও দরকার ছিল না। আদিত্য আগেই তার চা-টা খেয়ে নিয়েছে। সে তার নোট বইটা বার করে মনোযোগী ছাত্রের মতো নোট নিচ্ছিল।

সমাদ্দার আবার বলতে শুরু করল, 'দলটাকে ধরতে না পারার প্রধান কারণ, গ্রামের গরিব মানুষ দলের লোকদের খুব প্রোটেকশন দিত। দরকার পড়লে মাওবাদীরা গ্রামের মানুষদের সঙ্গে এমন করে মিশে যেত যে পুলিশ তাদের আলাদা করতে পারত না। এইভাবে বহু পুলিশ রেড ফেল করেছে। উল্টোদিকে মাওবাদীরা গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াত, ছোটখাট অসুখ-বিসুখে তাদের ওষুধ দিত, বড় কিছু হলে তাদের সঙ্গে নিয়ে সদর হাসপাতালে যেত, কখনো-সখনও টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করত। ওখানকার গ্রামের লোক খুব গরিব স্যার। মানুষ যে এতটা গরিব হতে পারে সেটা ওখানকার গ্রামের লোকদের নিজের চোখে না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতো না। সেই গরিব মানুষরা একটু-আধটু সাহায্য পেলেই কেনা গোলাম হয়ে থাকে।'

সমাদ্দার থামল। এদিক ওদিক তাকাল। আদিত্য অনুমান করল সমাদ্দারের চা-পিপাসু মন আবার চায়ের সন্ধান করছে। যে ছেলেটি তাদের চা এনে দিয়েছিল তাকে যখন ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না তখন সমাদ্দার তার টেবিলের গায়ে লুকোনো একটা বোতাম টিপল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যিনি আবির্ভূত হলেন তিনি যে একজন বেয়ারা সেটা বোঝার জন্য খুব একটা কল্পনাশক্তি লাগে না। সমাদ্দার তাকে বলল, 'জনার্দনকে দেখতে পেলে এখানে দুটো চা দিতে বোলো তো। আর বোলো, একটু আগে সে যে চা-টা দিয়েছিল সেটা একেবারে জুড়িয়ে গেছিল।' 'জুড়িয়ে গেছিল' কথাটা আদিত্যর কানে লাগল। আজকাল বেশিরভাগ লোকই বোধহয় বলবে 'ঠান্ডা হয়ে গেছিল'। 'জুড়িয়ে গেছিল' খুব একটা কেউ আর বলে না। আদিত্যর বাবা বলত।

সমাদ্দার আবার বলতে শুরু করেছে, 'ক্রমশ পুলিশ জানতে পারল দলটির অপরেশানাল মাথা অভিজিৎ সিং বলে এক ব্যক্তি। অভিজিতের বাবা-মা অরিজিনালি বিহারের হলেও অভিজিৎ বড় হয়েছে পুরুলিয়ায়। তাই হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাটাও মাতৃভাষার মতো বলে। ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিও বলতে পারে। একটা

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার। তাই এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারটা খুব ভাল বোঝে। এই অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে চন্দ্রলেখা সেনের একটা সম্পর্ক ছিল। অবশ্য চন্দ্রা সেন কোনও সাবভারসিভ অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে সরাসরি জড়িত আছে এমন কোনও এভিডেন্স পুলিশ কখনও পায়নি। সে স্থানীয় একটা ইস্কুলে গরিব মেয়েদের পড়াত, গ্রামে গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিলি করত, প্রয়োজনে গ্রামের গরিব মানুষদের অর্থসাহায্য করত আর কখনও কখনও অভিজিৎ সিং-এর দলের ছেলেমেয়েদের থিওরেটিকাল ক্লাশ নিত।'

সমাদ্দার আবার থামল কারণ জনার্দন আবার চা এনেছে। 'ঠান্ডা নয় তো?' সমাদ্দার তাকে শাসানোর ভঙ্গীতে বলল।

'এবার আর ঠাণ্ডা হবে না। এইমাত্র করে এনেছি।' চা টেবিলে রেখে জনার্দন ফাঁকা কাপদুটো নিয়ে চলে গেল।

সত্যিই চা এবার ঠাণ্ডা নয়। চুমুক দিয়ে সমাদ্দার একটা তৃপ্তির অতি প্রলম্বিত 'আঃ' ধ্বনি উচ্চারণ করল। তারপর বলল, 'মাওবাদী এই দলটা একটা গোটা আর্মি ট্রাক উড়িয়ে দিয়েছিল। তিরিশ-চল্লিশজন জওয়ান মারা গিয়েছিল। এরপর কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়।'

'তারপর?'

'আমি সেই টাস্ক ফোর্সের পার্ট হিসেবে পুরুলিয়া গেলাম। কয়েকজন খুব ভাল ইনফর্মার পেয়ে গেলাম আমরা। তাদের দেওয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে জঙ্গলে জঙ্গলে চিরুনি তল্লাসি চলল। দলটার সঙ্গে বেশ কয়েকটা এনকাউন্টার হল। অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে, বাঘমুন্ডির জঙ্গলে, সুবর্ণরেখার ধারে, কংসাবতীর ধারে, হাজারিবাগের জঙ্গলে। দুপক্ষেরই ক্যাসুয়্যালটি বাড়তে লাগল। দিল্লি, কলকাতা আর রাঁচি থেকে আমাদের রিএনফোর্সমেন্ট এল। আস্তে আস্তে দলটাকে আমরা কব্জা করে ফেললাম। তাদের কিছু মারা পড়ল, বেশ কিছু ধরা পড়ল আর কয়েকজন পালিয়ে গেল। অভিজিৎকে আমরা ধরতে পারলাম না। তবে আমাদের স্থির বিশ্বাস এনকাউন্টারের সময় সে দলের সঙ্গেই ছিল এবং সে এখনও বেঁচে আছে।'

'এইসব সময়ে চন্দ্রা কি পুরুলিয়ায়?'

'দাঁড়ান, এটা একটু ভেবে বলতে হবে। যখন এনকাউন্টারগুলো হচ্ছে মোটামুটি তখনই চন্দ্রা সেন পুরুলিয়া ছেড়ে চলে যায়। এটা খানিকটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি কারণ চন্দ্রার ওপর পুলিশের কন্সট্যান্ট নজর ছিল।'

'চন্দ্রলেখা সেন যে ইস্কুলে পড়াত তার নাম ঠিকানা কি আপনাদের ফাইলে নোট করা আছে?'

'আছে স্যার। ইস্কুলটার নাম নীপবীথি, গরিব মেয়েদের ইস্কুল। আদ্রা থেকে রঘুনাথপুর যেতে জয়চণ্ডী পাহাড় পড়ে, ইস্কুলটা তার খুব কাছে। ওখানে একটা রেল স্টেশনও আছে। আমরা এইটুকুই জানি যে একটা এন জি ও ওই ইস্কুলটা চালায়।'

'এন জি ও-টার সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি?'

'আপত্তিকর কিছু জানা যায়নি। তারা পশ্চিমবঙ্গে গরিব মেয়েদের জন্য এরকম আরও ইস্কুল চালায়।'

'আচ্ছা, চন্দ্রার সঙ্গে অভিজিতের কোনও যোগাযোগ এসট্যাবলিস করা যায়নি?'

'গিয়েছিল। অভিজিৎ নিয়মিত চন্দ্রার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। একটা সময় পুলিশের মনে হত দুজনের মধ্যে সম্ভবত একটা রোমান্টিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু অভিজিতের বিরুদ্ধেও অনেক দিন অব্দি তেমন কোনও ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স পুলিশ যোগাড় করে উঠতে পারেনি। যখন জোগাড় করতে পারল ততদিনে অভিজিৎ উধাও হয়ে গেছে। তারও আগে একদিন কোনও কারণে অভিজিতের সঙ্গে চন্দ্রার ঝগড়া হয়ে গেল। চন্দ্রা পুরুলিয়া ছেড়ে বসিরহাটে চলে গেল।'

'চন্দ্রা বসিরহাট চলে যাবার পরেও কি পুলিশ তার ওপরে নজর রাখছিল?'

'না স্যার। চন্দ্রা পুরুলিয়া ছেড়ে চলে যাবার পরে পুলিশের নজরদারি অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছিল।'

সমাদ্দার ফাইলটা বন্ধ করল। আদিত্য বলল, 'চন্দ্রার নিখোঁজ হয়ে যাবার ব্যাপারে পুলিশ কতটুকু জানতে পেরেছে?'

'ও হ্যাঁ, এটাই তো আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল। চন্দ্রার হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারে পুলিশ এখন পর্যন্ত প্রায় কিছুই জানতে পারেনি। সত্যিটা হল, বেশ কিছুদিন লালবাজার জানতেই পারেনি যে চন্দ্রা সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। বসিরহাটে একটা এফ আই আর অবশ্য করা হয়েছিল এবং তার ওপর ভিত্তি করে বসিরহাট পুলিশ স্টেশনের একজন এস আই, লালবাজারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে, ব্যাপারটা অত্যন্ত ধীর গতিতে ইনভেস্টিগেট করছিলেন। তারপর কিছুদিন আগে, চন্দ্রা সেনের এক বান্ধবী ব্যাপারটা আমাদের নজরে আনেন। ব্যাপারটা জানার পর আমরা কেসটা এক্সপিডাইট করার জন্যে বসিরহাট পুলিশকে চাপ দেয়েছি। আমাদের এখান থেকে একটা টিম বসিরহাটে গিয়েছিল। হয়ত আবার যাবে। তবে একেবারে লেটেস্ট সিচুয়েশনটা বসিরহাটের লোকাল পুলিশই বলতে পারবে।'

'চন্দ্রা সেনের বান্ধবীর নাম কী? যিনি খবরটা দিয়েছিলেন?'

'দাঁড়ান, ফাইলটা দেখে নিয়ে বলছি।' সমাদ্দার আবার ফাইলটা খুললেন, 'বান্ধবীর নাম কেয়া বাগচি। পুলিশের ওপর মহলে ভদ্রমহিলার জানাশোনা ছিল। তাই তিনি লালবাজারে সরাসরি এন্ট্রি পেয়েছিলেন। আমার সঙ্গেই তাঁর কথা হয়েছিল।'

'একটা শেষ প্রশ্ন। ঠিক প্রশ্ন নয়, অনুরোধ। কয়েক দিন বাদে আমি পুরুলিয়া যাব ভাবছি। ওখানে গেলে আপনাদের ইনফর্মারদের সঙ্গে কি একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব স্যার। আপনি শুধু যাবার আগে আমাকে একটু জানাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।' আদিত্য নোটখাতা বন্ধ করল।

'ধন্যবাদ দেবেন না স্যার, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলাটাই আমার সৌভাগ্য। গৌতম দাশগুপ্ত শুধু আমার সুপিরিয়ারই ছিলেন না, নিজের হাতে আমাকে তৈরি করেছিলেন। আর আমি জানি, দাশগুপ্ত সাহেব আপনাকে কী চোখে দেখেন। ভাল থাকবেন। আর দরকার হলেই আমাকে ফোন করবেন। আমার ফোন নম্বরটা সেভ করে নেবেন? আমার পুরো নাম সঞ্জয় সমাদ্দার।' সমাদ্দার পকেট থেকে মোবাইল বার করল।

লালবাজারে ঢোকার মুখে মোবাইল জমা রাখতে হয়। মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল। বেরোবার সময় আদিত্য মোবাইল ফেরত নিয়ে দেখল দুজন ফোন করেছিল। শেষ ফোনটা একটা অচেনা নম্বর থেকে এসেছে। এটা নিশ্চয় সমাদ্দারের নম্বর। তার আগে একই ফোন থেকে দুবার ফোন এসেছিল, ফোন করেছিল নূপুর মণ্ডল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

আদিত্য খাটে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। ঘন্টা খানেক হল সে মেসে ফিরে এসেছে। তার হাতে এখন অনেকগুলো কাজ। বসিরহাটে চন্দ্রা যে ইস্কুলে পড়াত সেখানে যেতে হবে। একবার পুরুলিয়াতেও যাওয়া দরকার। কিন্তু সবার আগে পার্থ সান্যালের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে। পার্থ বলেছিল, কলকাতায় চন্দ্রার দুএকজন বন্ধু আছে যাদের সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখত। তাদের নাম ঠিকানাগুলো হয়ত পার্থ দিতে পারবে। চন্দ্রাদের আলিপুরের বাড়িটাতে এখন কে থাকে? ওখানেও একবার গেলে ভাল হয়। তাছাড়া নূপুর মণ্ডলকে একবার কল ব্যাক করা উচিত। নূপুর কেন ফোন করেছিল কে জানে? নূপুর মণ্ডল চরিত্রটা এখনও তার কাছে ধোঁয়া-ধোঁয়া। তার সম্বন্ধে আর একটু খবর নিতে হবে। হয়ত সমাদ্দার হেল্প করতে পারে। হাতে আরও কিছু কাজ আছে, এখনই মনে পড়ছে না। নিশ্চয় পরে মনে পড়বে। যে কাজগুলোর কথা মনে হল সেগুলো খাতায় লিখে রাখার জন্য আদিত্য উঠে বসল। খাটের ওপর বসে টেবিলের ওপর থেকে নোটখাতাটা খুঁজে বার করল। অনেক কাজ। অথচ হাতে সময় খুবই কম। এসব কাজ বিমলকে দিয়ে হবে না। নিজেকেই করতে হবে। এইসব সময়ে আদিত্যর মনে হয় তার একটা নির্ভরযোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে খুব সুবিধে হতো।

আদিত্য চেয়ার-টেবিলে না বসলে লিখতে পারে না। ছোটবেলার এই একটা সাহেবি অভ্যেস তার রয়ে গেছে। চেয়ারের ওপর যে দুটো আধময়লা প্যান্ট রাখা ছিল, সেগুলোকে সরিয়ে ঘরের একদিকে টাঙানো নাইলনের দড়িতে সে ঝুলিয়ে রাখল। আদিত্যর ঘরে কোনও আলমারি বা ওয়ার্ডরোব নেই। রাখার জায়গাও নেই। শুধু একটা দুইতাকওলা বেঁটে মতন হোয়াট-নট আছে যেটা এতই বেঁটে যে সেখানে জামা-প্যান্ট ঝুলিয়ে রাখা অসম্ভব। হোয়াট-নটের নিচের তাকে আদিত্যর বই ও কাগজপত্র থাকে, ওপরের তাকে গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার- রুমাল-পাজামা ছাড়াও সেইসব জামা-প্যান্টগুলো থাকে যেগুলো ধোপার বাড়ি থেকে সদ্য কেচে এসেছে। সৌভাগ্যবশত, এসব জিনিস আদিত্যর খুব বেশি নেই। থাকলে হোয়াট-নটে ধরানো যেত না। একবার-পরা জামা প্যান্ট তাই সে দড়িতেই ঝুলিয়ে রাখে। তবে আলস্যের কারণে বাড়ি ফিরেই ছাড়া জামা-প্যান্ট দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়ে ওঠে না। সাময়িকভাবে তাদের জায়গা হয় চেয়ারের ওপর।

আদিত্য চেয়ারে বসতে না বসতে তার মোবাইলটা বেজে উঠল। নূপুর মণ্ডল আবার ফোন করেছে। সে ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতে না বলতে ওপার থেকে নূপুরের রিনরিনে গলা ভেসে এল, 'আদিত্যদা চিনতে পারছ? আমি নূপুর। সেদিন সুপার মার্কেটে আলাপ হয়েছিল, মনে আছে?'

আদিত্য খেয়াল করল তাকে তুমি বলার লিবার্টিটা নূপুর নিজে নিজেই নিয়ে নিয়েছে। সে একটু ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অবশ্যই মনে আছে। তারপর? কেমন চলছে? কলকাতা ধাতস্থ হল?'

'কলকাতা তেমন একটা চেনা হয়নি। খুব বেশি জায়গায় তো যেতে হয় না। বেশিরভাগ দিনই বাড়ি থেকে আপিস আর আপিস থেকে বাড়ি।'

'চিনে যাবে, আস্তে আস্তে চিনে যাবে।' আদিত্য অলসভাবে বলল।

'আদিত্যদা, একটা বিপদে পড়ে তোমাকে ফোন করছি। এই শহরে আর বিশেষ কাউকে চিনি না তো।' আদিত্যর মনে হল নূপুরের গলার উৎকণ্ঠাটা বানানো নয়।

'বিপদ? কী হল আবার?' আদিত্য আন্তরিকভাবেই বলল।

'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। সামনা-সামনি কথা হলে ভাল হয়। কাল সকালের দিকে আমাকে একটু সময় দিতে পারবে? বেশি নয়, এই ধরো মিনিট পনেরো। আমার ডিউটি বেলা দুটো থেকে শুরু হয়। চলে রাত্তির দুটো অব্দি। আউটসোর্সিং-এর কাজ তো। কম্পানির গাড়িই বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়। রাত্তিরে একদম সময় পাই না। সকাল এগারোটা, সাড়ে এগারোটা নাগাদ তোমার একটু সময় হবে?'

আদিত্য খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। কাল সকাল এগারোটা। আমি কি তোমার বাড়িতে চলে যাব?'

'না, না। আমার বাড়িতে একটু অসুবিধে আছে। আমার বিপদের কথাটা বললেই সব বুঝতে পারবে। আমিই তোমার কাছে চলে আসছি। কোথায় আসব? তোমার মেসবাড়িতে?'

'আরে না, না। এটা পুরুষদের মেস। সম্পূর্ণ নারী বিবর্জিত। তুমি এখানে ঢুকলে ঢি ঢি পড়ে যাবে।' আদিত্য শঙ্কিত গলায় বলল।

'তাহলে কোথায় যাব?' নূপুরকে কিছুটা বিভ্রান্ত শোনাল।

'তুমি আমার আপিসে চলে এস। তোমার বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়।'

'কীভাবে যাব?'

'বলছি কীভাবে আসবে। ওই অফিস টাইম-এ ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত হবে। তুমি বরং ট্রামে এস। তুমি কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে এসপ্লানেডগামী ট্রামে উঠে বৌবাজারের মোড়ে নামবে। বৌবাজারের এখন নাম হয়েছে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট। ট্রাম থেকে নেমে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে বিবাদী বাগের দিকে তোমাকে খানিকটা হাঁটতে হবে। কিছুটা হাঁটলে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পড়বে। সেটা খুব বড় একটা রাস্তা। সেটা পেরিয়ে ওই বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরেই আরও মিনিট তিনেক হাঁটলে তোমার ডানদিকে পড়বে বিনানি ম্যানসন। পাঁচতলা বাড়ি। দোতলায় আমার আপিস। ঢোকার মুখে দেখবে একজন সিকিউরিটি বসে আছে। ওর নাম শ্যামল। আমার নাম বললে ও তোমাকে আমার আপিসটা দেখিয়ে দেবে। আমি বলে রাখব। আমার পুরো নামটা মনে আছে তো? আদিত্য মজুমদার।'

'তোমার পুরো নাম আমার খুব ভালই মনে আছে। কিন্তু তুমি যেদিকটা যেতে বলছ আমি ওদিকটা একেবারেই চিনি না। তুমি আর একবার থেমে থেমে ডিরেকশনটা বলবে প্লিজ? আমি তাহলে লিখে নেব। দাঁড়াও আগে একটা কাগজ আর পেন নিয়ে আসি।'

নূপুর কাগজ-কলম নিয়ে আসার পর আদিত্যকে আবার খুব থেমে থেমে ডিরেকশনটা বলতে হল। ডিরেকশনটা দিয়ে সে বলল, কখনও যদি মনে হয় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ, আমাকে ফোন করবে। আমার মোবাইল তো খোলাই থাকবে।'

'ঠিক আছে আদিত্যদা, তাহলে কাল এগারোটায় দেখা হচ্ছে।' নূপুর ফোন কেটে দিল।

(২)

মাত্র মাস দেড়েক হল আদিত্য একটা স্মার্ট ফোন কিনেছে। তার আগে যে মোবাইলটা সে ব্যবহার করত সেটা সাদা-কালো, আজকের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় অ্যান্টিক। কিন্তু একে তো ফোনটার ওপর আদিত্যর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল, তার ওপর ফোনটারও নিশ্চয় আদিত্যর ওপর কিছুটা মায়া পড়েছিল। কারণ সেটা, আদিত্যকে ছেড়ে যাবার ভয়েই বোধহয়, কিছুতেই খারাপ হচ্ছিল না। আর খারাপ না হলে আদিত্য তাকে বাতিল করে কী করে?

শেষে একদিন রত্না আদিত্যর ফোনটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'আমি এই ফোনটা আমাদের রান্নার মাসিকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই তো নিজে থেকে নতুন ফোন কিনবি না। আমিই না হয় তোকে একটা নতুন স্মার্ট ফোন কিনে দেব।'

এরপর আর নতুন ফোন না কিনে উপায় আছে? তবে আদিত্য এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে একটা স্মার্ট ফোন থাকার অনেক সুবিধে। এখন সে মোবাইলেই ই-মেল চেক করতে পারে। আগে ই-মেল দেখার

জন্য ল্যাপটপটা খুলতে হত, কিন্তু খুললেই যে ই-মেল দেখা যেত তা নয়। আদিত্যর ব্রডব্যান্ড কানেকশন নেই, একটা ডঙ্গল দিয়ে কাজ চালাতে হয়। আর সেই ডঙ্গলটা অসম্ভব স্লো। তাই অনেক সময় ধরে কম্পিউটারটা বাফার করে যায়, ফলে ল্যাপটপে ই-মেল বা ইন্টারনেট দেখার ধৈর্য থাকে না। এখন যে শুধু মোবাইলে চট করে ই-মেলটা চেক করে নিতে পারে তাই নয়, নেট সার্ফ করারও বেশ সুবিধে হয়েছে। সব থেকে বড় সুবিধে, সে এখন হোয়াটস অ্যাপ দিয়ে নিখরচায় পৃথিবীর যে কোনও যায়গায় ফোন করতে পারে। যেমন এখন সে পার্থ সান্যালকে একটা ফোন করবে ভাবছে।

আদিত্য মেসবাড়ির খাবার ঘরে রাত্তিরের খাবার খেতে যায়। তাদের মেসে সপ্তাহে দুদিন মাছ, দুদিন ডিম, দুদিন নিরামিষ আর একদিন চিকেন খাওয়ানো হয়। এটা রাত্তিরের মেনু। দুপুরে দুদিন বাদ দিয়ে রোজই নিরামিষ। তবে অনেকেই কাজের দিনে দুপুরটা বাইরে খায়। আদিত্যও বছর দেড়েক তাই করছে। আজ রাত্তিরে নিরামিষ ছিল। দুরকমের বিস্বাদ তরকারি, ডাল আর তিনটে রুটি দিয়ে নিরানন্দ নৈশাহার সেরে একটু আগে আদিত্য তার ঘরে ফিরে এসেছে। মেসের মূল পাচক ভানু ঠাকুর কিছুদিনের জন্য দেশে গেছে। তার পরিবর্তে এখন যে রান্না করছে তার মতো খারাপ রাঁধুনি আদিত্য জীবনে দেখেনি। ভানু ঠাকুর না ফেরা অব্দি আদিত্যর মনে সুখ নেই।

মার্কিন দেশে চারটে টাইম জোন। পার্থ আছে পূর্ব উপকূলে, জর্জিয়ার অ্যাটলান্টাতে। তার সঙ্গে ভারতীয় সময়ের তফাৎ সব থেকে কম। কিন্তু এক ফ্যাকড়া, ওসব দেশে শীতকালে সময় এক ঘন্টা পিছিয়ে যায়, গ্রীষ্মে এগিয়ে আসে। আদিত্য ইন্টারনেটে দেখে নিয়েছে এই বছর নভেম্বরের প্রথম রবিবার মার্কিন দেশে শীতকালীন সময় শুরু হবে। তার মানে শীতকালীন সময় এখনও শুরু হয়নি। অর্থাৎ কলকাতার সঙ্গে অ্যাটলান্টার সময়ের পার্থক্য এখন সাড়ে ন-ঘন্টা। আদিত্য দেখল তার হাত ঘড়িতে রাত্তির পৌনে দশটা বেজেছে। তার মানে, আদিত্য হিসেব করে দেখল, পার্থদের ওখানে এখন বেলা সোয়া বারোটা। হয়ত পার্থ লাঞ্চ খেতে বেরিয়েছে। এখন তাকে ফোন করা যেতেই পারে।

আদিত্যর ভাগ্য ভাল ফোনটা একবারেই লেগে গেল। ওদিক থেকে পার্থ বলল, 'বল। নতুন কোনও খবর আছে?'

'নতুন খবর নেই। তবে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু কাজ এগোতে গেলে আরও দুএকটা জিনিস জানা দরকার। তুই কি এখন সেগুলো জানাতে পারবি?'

'আমি দুজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বাইরে এসেছি। অফিসে ফিরে এক ঘন্টার মধ্যে তোকে ফোন করছি। তুই জেগে আছিস তো?'

'আমি এখনও ঘন্টা তিনেক জেগে আছি। তুই ধীরেসুস্থে অফিসে ফিরে আমাকে একটা ফোন করিস।' আদিত্য ফোন রেখে দিল। সে সমাদ্দারের কাছ থেকে যে তথ্যগুলো জানতে পেরেছে, ইচ্ছে করেই পার্থকে কিছু জানাল না। ওগুলো পুলিশের গোপন তথ্য, স্ট্রিক্টলি কনফিডেনশিয়াল। নিজের ক্লায়েন্টকেও সেই তথ্য জানানোর অধিকার আদিত্যর নেই।

পার্থর ফোনের আশায় এখন বিরহিনী রাধার মতো অপেক্ষা করতে হবে। হাতে কাজ অবশ্য অনেক আছে। টুকিটাকি অন্য কাজ, যার সঙ্গে চন্দ্রার উধাও হয়ে যাবার কোনও সম্পর্ক নেই। একটা ফিনান্সিয়াল কম্পানির হয়ে সে একটা জালিয়াতির তদন্ত করেছিল, তার রিপোর্টটা লেখা একটু বাকি আছে। কিছু মেলেরও উত্তর দিতে হবে।

আর একটা খুব দরকারি কাজ আছে। মেসের চাকর বলরাম তার ছেলের জন্য কয়েকটা ইংরেজি এসে এবং বাক্য রচনা লিখে দিতে বলেছে। এই কাজটা আদিত্যকে করতেই হবে। মাঝে মাঝেই করতে হয়। মেসবাড়িতে তার আপনজন বলতে বলরাম ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বলরামের কথা সে ফেলতে পারে না। বলরামের ছেলে-বউ থাকে দেশের বাড়িতে, সে ছুটি-ছাটায় বাড়ি যায়। আদিত্যর হাজার বারণ সত্ত্বেও অনেক টাকা খরচ করে ছেলেকে প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে ভর্তি করেছে বলরাম, বাংলা ইস্কুলে

নাকি লেখাপড়াই হয় না। কিন্তু বলরামের বাড়িতে ইংরেজি জানা কেউ নেই। কে তার ছেলেকে ইংরেজি পড়াবে? অতএব আদিত্যই একমাত্র ভরসা। আদিত্য ইংরেজিতে এসে, বাক্য রচনা বা প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়। সেটা হোয়াটস অ্যাপ করে তার বউকে পাঠিয়ে দেয় বলরাম। তারপর সেগুলো কী হয় আদিত্য জানে না। টেকনোলজির কী বিচিত্র ব্যবহার! আদিত্যকে বলরামের ছেলের ইংরেজি পাঠ্যবই এক কপি কিনতে হয়েছে।

সাড়ে এগারোটার একটু আগে পার্থ ফোন করল। বলল, 'রাত হয়ে গেল নাকি?'

'আরে না, না। এখনও সাড়ে এগারোটাই বাজেনি। কাগজে দেখছিলাম এবার আমেরিকায় তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। তোদের ওখানে কেমন ঠাণ্ডা এখন?'

'এমনিতে তো অ্যাটলান্টাতে এই সময় ততটা ঠাণ্ডা পড়ে না। তবে এবছর একটু পড়েছে। কাল রাত্তিরে হঠাৎ দশ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। দুপুরেও বাইরে বেরোতে গেলে একটা গরম জামা লাগছে। অক্টোবর মাসে এটা ভাবাই যায় না।'

'শোন, আগে কাজের কথাগুলো সেরে নিই।' এত রাত্তিরে আদিত্য ঠিক আড্ডা মারার মুডে নেই। 'আমার কয়েকটা জিনিস জানার আছে। এক এক করে জিজ্ঞেস করছি। প্রথমত, তুই বলেছিলি কলকাতায় চন্দ্রার দুএকজন বন্ধু আছে যাদের সঙ্গে ওর নিয়মিত কথা হয়। তারা কারা? কোথায় থাকে?'

'আমি খুব ভাল জানি না। তবে একজনের কথা চন্দ্রা খুব বলে। ওদের সঙ্গে কলকাতায় এম এস সি পড়ত। নাম কেয়া বাগচি। কেয়া নিয়মিত চন্দ্রার খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু সে কোথায় থাকে বলতে পারব না। আরও দুএকজনের কথাও চন্দ্রা বলত। নামগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। সরি টু বি অফ সো লিটল হেল্প।'

'নো প্রবলেম। আমি কেয়া বাগচির কাছ থেকে নামগুলো জোগাড় করে নেব। কেয়া বাগচির ঠিকানাটাও জোগাড় করে ফেলতে পারব মনে হচ্ছে। আচ্ছা, চন্দ্রা কি ফেসবুকে আছে?'

'আছে। তবে খুব অ্যাক্টিভ নয়। এটা কিন্তু ভাল বলেছিস। ফেসবুক থেকে ওর কিছু বন্ধুদের হদিশ পাওয়া যেতেই পারে।'

'আমার পরের প্রশ্ন, চন্দ্রাদের আলিপুরের বাড়িতে এখন কে থাকে? ওখানে গেলে কার সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'আমি যত দূর জানি, আলিপুরের বাড়িতে চন্দ্রার সৎমা একাই থাকেন। তাছাড়া নিচের তলায় সার্ভেন্টস কোয়াটারে এক নেপালি দরোয়ান তার পরিবার নিয়ে থাকে। সে ওদের বহুদিনের পুরোনো লোক। সে-ই বাড়িটা দেখাশোনা করে। আর বাড়ির বাগানে একটা আউটহাউস মতো আছে। সেখানে বুড়ো ম্যানেজারবাবু থাকেন, তার তিনকুলে কেউ নেই। তিনিও বহুদিনেরলোক, চন্দ্রাকে জন্মাতে দেখেছেন। চন্দ্রার সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। ব্যাঙ্কে যাওয়া, টাকা তোলা, ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করলে রিনিউ করা, বাড়ির ট্যাক্স জমা দেওয়া এইসব কাজ তিনি করেন। চন্দ্রা ম্যানেজারবাবুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। আমার ধারণা চন্দ্রার সৎমাও ম্যানেজারবাবুকে মোটের ওপর বিশ্বাস করেন। আলিপুরের বাড়িতে গেলে এদের সকলের সঙ্গেই কথা বলা যাবে। তাছাড়া ওদের আরও কাজের লোক আছে, বড়মানুষদের যেমন থাকে। তুই বাড়িটা চিনিস তো?'

'অনেকদিন আগে গেছি। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে। তবে মনে হয় যেতে পারব।'

'আর কিছু জানতে চাস?'

'হ্যাঁ। আমাকে খোঁজখবর করার জন্য চন্দ্রার ইস্কুলে যেতে হবে। তুই কি সেখানে কখনও গেছিস?'

'আমি বেশ কয়েকবার গেছি। কয়েকবার তো চন্দ্রার সঙ্গেই গিয়েছিলাম। আর শেষ গেলাম এই কিছুদিন আগে, তোর সঙ্গে কথা বলার পর। তোর কথা আমি ওদের বলে এসেছি। ওখানে গেলে তোর কোনও অসুবিধেই হবে না।'

'তার মানে আমি ওখানে একজন বেসরকারি গোয়েন্দা হিসেবেই যাচ্ছি, আমার নিজের পরিচয়ে, তাই তো?'

'সেভাবে যাওয়াই তো ভাল, না কি?'

'ভাল মন্দ পরের কথা, তুই যখন আমার কথা বলেই রেখেছিস তখন অন্য কোনও আইডেন্টিটিতে যাবার আর অপশানও তো নেই। যাই হোক, জায়গাটা ঠিক কোথায় বলত?'

'জায়গাটা বসিরহাটের সাউথ-ইস্টে, ইছামতি নদীর ধারে, একেবারে বাংলাদেশের বর্ডারে। সোলাডাঙা বলে একটা জায়গা আছে তার কাছে। ইস্কুলটা খুব পুরোনো নয়, সরকারি সাহায্যও পায় না। একটা এন জি ও ইস্কুলটা চালায়। গরিব মেয়েদের এখানে প্রাইমারি ক্লাশ অব্দি পড়ানো হয়। ইস্কুলের নাম বনবীথি। চন্দ্রাকে নিয়ে সবসুদ্ধ চারজন দিদিমনি আছেন। আর আছেন একজন ক্লার্ক। তিনি পুরুষ মানুষ। তাঁকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয়। সকলেরই নামমাত্র মাইনে। চন্দ্রার না হয় পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে মোটা ইনকাম আছে। অন্যদের যে কী করে চলে, মা ভবানীই জানেন।'

'এখান থেকে সেখানে যাবার উপায় কী?'

'শুনেছি শেয়ালদা থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়। আমি অবশ্য প্রত্যেকবার একটা গাড়ি ভাড়া করে নিই। তুইও তাই নিবি। এটা তো তোর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টে যাবে। আর একটা কথা। তোর ব্যাঙ্ক ডিটেলটা আমাকে মেল করে দিস। ইনিশিয়াল খরচের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। তোর চেকের একটা স্ক্যানড কপি পাঠালেই হবে। আমার জি-মেল অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক ডিটেলটা পাঠাস। অফিসের ই-মেলটা আজকাল মাঝে মাঝে ওভার ফ্লো করে। তবে অফিসের মেলে পাঠালেও ওটা অটোম্যাটিকালি আমার জি-মেলে চলে আসবে।'

বনবীথি নামটা আদিত্যর চেনা চেনা লাগছে। আগে কোথায় যেন শুনেছে। সে বলল, 'এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে ইস্কুলের সন্ধান চন্দ্রা পেল কী করে?'

'এটার উত্তর আমার জানা নেই। তবে ওখানে পড়িয়ে চন্দ্রা খুব খুশি ছিল। ওর মনে হতো গরিব মেয়েদের জন্যে ও একটা কিছু করছে।'

'আমাকে একবার পুরুলিয়াতেও যেতে হবে। ওখানেও চন্দ্রা একটা ইস্কুলে পড়াত না?'

'পড়াত বলেই তো জানি। তবে তার বেশি আর কিছু জানি না। পুরুলিয়ার কথা চন্দ্রা একদম বলতে চায় না। আমি দুএকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, পুরুলিয়ার কথা থাক।'

'ঠিক আছে রে। আজ এই অব্দি থাকুক। আমি দরকার হলে আবার তোকে ফোন করব।'

'ওক্কে। নতুন কিছু জানতে পারলে জানাস। গুড নাইট।'

আদিত্য মোবাইলটা বন্ধ করে দেখল প্রায় বারোটা বাজে। এখনও ঠিক ঘুম পায়নি। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে বসল। ফেসবুকে গিয়ে চন্দ্রলেখা সেন-এর হোমপেজটা খুলে দেখল তার বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার মধ্যে তিন চারজন চন্দ্রার পোস্টগুলোতে নিয়মিত লাইক দেয়, কমেন্ট করে। এদের মধ্যে কেয়া বাগচি ছাড়াও রয়েছে মধুমিতা দাশগুপ্ত, মৌ সরকার এবং বর্ণালি দত্ত। বর্ণালি দত্ত আবার আদিত্যরও ফেসবুক ফ্রেন্ড, সে আদিত্যদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়ত। ভালই হল। একজন কমন ফ্রেণ্ড থাকার ফলে আদিত্য চন্দ্রার অন্য ফ্রেন্ডদের হোম পেজে যেতে পারল। এদের হোম পেজে গিয়ে আদিত্য জানতে পারল, মৌ সরকার অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, গ্রিন্ডলেস ব্যাঙ্কে চাকরি করে, মধুমিতা দাশগুপ্ত থাকে নয়ডায়, হোমমেকার। এরা দুজনেই লরেটো হাউসে পড়েছে, মনে হয় চন্দ্রার ইস্কুলের বন্ধু। বর্ণালি দত্ত তো আদিত্যরও ফ্রেন্ড, সে এখন থাকে শিকাগোতে, সেখানে ফার্মি ল্যাবে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো।

কেয়া বাগচি। এই নামটাই তো গার্গী বিশ্বাস বলেছিল। ফোন নম্বরটাও দিয়ে দিয়েছে। কেয়া বাগচি কলকাতাতেই থাকে। সে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি এস সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস

সি করেছে। একটা স্কুলে পড়ায়। আদিত্য লক্ষ করল, ফেসবুকে কেয়ার বন্ধুর সংখ্যা গিনিস বুকে ওঠার মতো। সে ফেসবুকে রীতিমত অ্যাক্টিভও বটে।

আদিত্য একটা হাই তুলে ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিল। ঘুম পাচ্ছে।

(৩)

নূপুর বলেছিল এগারোটায় আসবে। এগারোটা বাজতে পাঁচে আদিত্য আপিসে পৌঁছে দেখল নূপুর তার আপিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?' আদিত্য দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল।

'বেশিক্ষণ না, এই মিনিট দশেক। কিন্তু তোমার কোনও দোষ নেই, আদিত্যদা। তুমি তো ঠিক সময়েই এসেছ। আমিই আগে আগে পৌঁছে গেছি। আসলে বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। সেটা আগে আগে পৌঁছে দিল। আমার মা বলতেন, দেরিতে পৌঁছনোর থেকে আগে আগে পৌঁছে যাওয়া ঢের ভাল।' তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্র করার স্বরে নূপুর বলল, 'আদিত্যদা, তুমি তো বলোনি তুমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ?'

আদিত্য এই প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল। নূপুর এই আপিসে এলে দরজায় লাগানো নেমপ্লেটটা তার চোখে পড়বে না এটা হতেই পারে না। আর বলাই বাহুল্য, নেমপ্লেট দেখলেই সে আদিত্যর পেশাটা জানতে পারবে। সে সহজ গলায় বলল, 'ভেতরে এসে বোসো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ।'

কিছুক্ষণ পরে কেটলিতে জল গরম করতে দিয়ে আদিত্য বলল, 'আমি কি তোমাকে একবারও বলেছি আমি গোয়েন্দা নই, অন্য কিছু? তুমি কি কখনও জিজ্ঞেস করেছ আমি কী কাজ করি, যে বলব?'

আদিত্য লক্ষ করল সেদিনের তুলনায় নূপুরকে একটু রোগা দেখাচ্ছে। মুখেও একটা চিন্তার ছাপ রয়েছে। সে নূপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এখানে কিন্তু দুধ-চিনি ছাড়া কফি। তোমার চলবে তো?'

'আমিও চা বা কফিতে দুধ-চিনি খাই না। কিন্তু তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কফি পরে খেলেও চলত।'

'কফিটা আসলে আমার নিজের দরকার। সকালে আপিসে এসে একটা কফি না খেলে কাজ শুরু করতে পারি না। যাই হোক তোমার বিপদটা কী বল।' আদিত্য গুঁড়ো কফির ওপর গরম জল ঢালতে ঢালতে বলল।

'আমার বিপদটা নেহাতই সাদামাটা। গোয়েন্দার কাছে আসার মতো মোটেই নয়। কিন্তু তাই বলে ভেবো না বিপদের মাত্রাটা কিছু কম।' নূপুর চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে আদিত্যর হাত থেকে কফির কাপটা নিল। তারপর জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, বিপদ একটা নয়, দুটো।'

দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। আদিত্য 'খোলা আছে' বলতেই শ্যামল দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। দুটো চিঠি আদিত্যর টেবিলে রেখে বলল, 'লাঞ্চ আনতে হবে?'

আদিত্য নূপুরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'লাঞ্চ খাবে?'

'না, না। আমাকে দুটোর মধ্যে অফিস পৌঁছতে হবে। এক্ষুনি চলে যাব। লাঞ্চ খাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে আমার একার জন্যই নিয়ে এস। আমি যেটা খাই, সেটা। একটা সাদা ধোসা, একটা দইবড়া আর একটা শসা।' আদিত্য শ্যামলের দিকে একটা একশ' টাকার নোট এগিয়ে দিল।

শ্যামল দরজা বন্ধ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নূপুর বলল, 'আমার প্রথম বিপদ, এই শহরে আমার থাকার কোনও জায়গা নেই। আমার মতো একা মেয়ের পক্ষে নিরাপদ কোনও জায়গা তোমার সন্ধানে আছে? খুব বেশি ভাড়া কিন্তু দিতে পারব না। কারও বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকতে পারলে সব থেকে ভাল হয়।'

'কেন? তোমার কাকার বাড়ি কী হল?'

'কাকা আমাকে বলেছিল বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে আছে। আমি যতদিন খুশি থাকতে পারি। কিন্তু কাকিমার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি। এমনই কপাল, কাকিমার এক ভাই এখন বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে। কাকিমা সুযোগ পেয়ে গেছে। তাকে বলেছে ওই বাড়িতে থাকতে। কাকা কাকিমার ওপর কথা বলতে পারে না।

তিনদিন আগে মালপত্তর নিয়ে সেই ভাই এসে হাজির। সঙ্গে তার স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা। বলল, এই বাড়িতেই তার থাকার কথা। আমি ঘাবড়ে গিয়ে দিল্লিতে কাকাকে ফোন করলাম। কাকা সব শুনে আমতা আমতা করতে লাগল। কাকিমা কাকার কাছ থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে বলল, শোনো নূপুর, ওই বাড়িতে আমার ভাই তার পরিবার নিয়ে থাকবে। তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে অন্য একটা থাকার জায়গা দেখে নাও। আমি তো আর কাকিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। আর করে লাভও নেই। আমার কলিগদের বলেছি, যদি কেউ কোনও বাড়ির সন্ধান দিতে পারে। এখন অব্দি কেউ কিচ্ছু দিতে পারেনি। সবাই বলছে, ডিসেম্বরে অনেক বাড়ি খালি হবে। ডিসেম্বরে খালি হলে আমার কী লাভ? এই কটা দিন আমি থাকব কোথায়? তারপর হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। মনে হল, তোমার সন্ধানে হয়ত কিছু থাকতে পারে।'

আদিত্য দেখল নপূরের চোখদুটো ছলছল করছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে নূপুরের অবস্থাটা প্রায় সেরকম। সে বলল, 'দ্যাখো নূপুর, তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমি একজন অবিবাহিত পুরুষ মানুষ। আমার কাছে বড়জোর দুএকটা পুরুষদের মেসবাড়ির খবর থাকতে পারে। কিন্তু মেয়েদের জন্য পিজি, হস্টেল বা নিরাপদ বাড়ির সন্ধান আমি কোথা থেকে দেব?' বলতে বলতে আদিত্যর কী যেন মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'দাঁড়াও, একটা জায়গায় জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।'

সে মোবাইলটা তুলে নিয়ে রত্নার নম্বরটা ডায়াল করল।

'কি রে? সেই যে লক্ষ্মী পুজোর দিন উধাও হলি, আর সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা কী?' ওদিক থেকে রত্নার গলা শোনা গেল।

'ওই নতুন কাজটা ধরেছি। তোদের বললাম তো সেদিন। কটা দিন তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তুই কি এখন কলেজে?'

'না, না। বাড়িতে আছি। কলেজ তো সেই ভাইফোঁটার পর খুলবে। আমাকে অবশ্য ছুটির মধ্যেও সপ্তাহে দুতিনদিন যেতে হয়। তবে আজ কলেজ যাইনি।'

আদিত্যর মনে পড়ে গেল, বছর খানেক হল রত্না প্রিন্সিপাল হয়েছে। তার মানে কাজও নিশ্চয় বেড়েছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রত্না ওপার থেকে বলল, 'তোর কী খবর বল। চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া গেল?'

'এত সহজে খুঁজে পাওয়া গেলে তো সমস্যাই ছিল না। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।' আদিত্যর গলাটা বিষণ্ণ শোনালো। তারপর গলার সুর পালটে সে বলল, 'আমি কিন্তু তোকে সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে ফোন করেছিলাম। পুজোর সময় যখন তোদের বাড়িতে থাকছিলাম তখন একদিন ওভারহিয়ার করলাম তুই তোদের হস্টেল সুপারের সঙ্গে কথা বলছিস। মনে হল তুই সুপারকে বলছিলি তোদের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাশের কয়েকটি মেয়ে, হস্টেলে জায়গা না পেয়ে, কজন মিলে পার্ক সার্কাসের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করেছে। বাড়িটা ভাল কিন্তু ওদের আন্দাজে একটু বড়। তাই ওরা আরও একজনকে খুঁজছে যে ওদের সঙ্গে বাড়িটা শেয়ার করতে পারে। আমি ঠিক বলছি তো?'

'একদম ঠিক বলছিস। ওরা এখনও কাউকে পায়নি। কালই ওদের একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তোর চেনা কেউ আছে নাকি? স্টুডেন্ট হলে সব থেকে ভাল হয়। ওরা ইন ফ্যাক্ট স্টুডেন্টই খুঁজছে।'

'আমার চেনা একজন আছে কিন্তু সে স্টুডেন্ট নয়। সেক্টর ফাইভে কাজ করে। খুব ডেসপারেটলি তার একটা মাথা গোঁজার জায়গা দরকার। ওরা কি ওয়ার্কিং গার্ল নেবে?'

'সেক্টর ফাইভের একটা প্রবলেম হল এদের বাড়ি ফিরতে গভীর রাত্তির হয়ে যায়। তাতে এই মেয়েগুলো আনসেফ বোধ করতে পারে। যাইহোক তুই ওই মেয়েটাকে বলতে পারিস আমার ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু মেয়েটা কে?'

'মেয়েটা আমাদের পাড়ার। বাজার করতে গিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ। রায়গঞ্জের মেয়ে। কলকাতায় চাকরি করতে এসেছে। কাউকে চেনে না। কাকার বাড়িতে থাকত, এখন আর সেখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।'

'তুই আবার ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস না তো?'

'ডুবে ভেসে কোনওভাবেই জল খাচ্ছি না। মেয়েটি আমার সঙ্গে দাদা-বোনের সম্পর্ক পাতিয়েছে। তুই আমায় ভাবিস কী?' বলতে বলতে আদিত্য একবার আড়চোখে নূপুরের দিকে দেখে নিল। নূপুরের চোখদুটো হাসছে।

'ঠিক আছে, তোকে বিশ্বাস করলাম। আমার কাছে ওখানকার একটি মেয়ের ফোন নাম্বার আছে। ও-ই দিয়ে রেখেছে, যদি আমি কাউকে জোগাড় করে দিতে পারি, এই আশায়। আমি নাম্বারটা টেক্সট করে দিচ্ছি। তোর বোনকে তাড়াতাড়ি ফোন করতে বলিস। নইলে কিন্তু বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'আমি আজকেই ফোন করতে বলছি। আর এই উইকএন্ডেই হয়ত তোদের বাড়িতে যাব। তোকে বলে রাখলাম। অমিতাভকেও বলিস। এখন রাখছি।'

আদিত্য ফোন রাখতে না রাখতেই টুং করে মেসেজ এল। রত্না ফোন নম্বরটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

নূপুর চলে যাবার আধঘন্টা পরে আদিত্যর দুপুরের খাওয়া নিয়ে এল শ্যামল। খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ জানলার দিকে তাকিয়ে আদিত্য সিগারেট ধরাল। তারপর উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াল সে। নিচে রাস্তায় বউবাজারের জনস্রোত। অক্টোবর যত শেষ হয়ে আসছে তত নরম হচ্ছে রোদ্দুর। সামনে দেয়ালি। ঘড়ির দোকানে মেগা সেল চলছে। ঘন্টা বাজাতে বাজাতে একটা ফাঁকা ট্রাম কলেজ স্ট্রিটের দিকে চলে গেল। কলেজ স্ট্রিট হয়ে বেলঘরিয়া যাবে। আজকাল ট্রামে বোধহয় বিশেষ কেউ চড়ে না।

চন্দ্রার নিখোঁজ হয়ে যাবার রহস্যটা আরও জটিল হয়ে উঠছে। পার্থর সঙ্গে কথা বলেও কয়েকটা খটকা লাগছে। পার্থর যতটা উদ্বিগ্ন হবার কথা, তাকে ততটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে কি? নূপুরের চালচলনও একটু অদ্ভুত। তার যে একটা বাড়ি দরকার সে কথাটা অনায়াসে টেলিফোনে বলা যেত। তার জন্যে ঠেঙিয়ে আদিত্যর আপিস অব্দি আসতে হল কেন? সেটা কি শুধু তার তীব্র অসহায়তাটা বোঝানোর জন্য? নূপুর এখনও তার দ্বিতীয় বিপদের কথা বলেনি। শুধু বলে গেছে, প্রথম বিপদটা সামলে উঠলে, দ্বিতীয়টার কথা বলবে।

আদিত্য সিগারেট শেষ করে চেয়ারে এসে বসল। মোবাইলে সঞ্জয় সমাদ্দারের নম্বরটা লাগাল।

'বলুন স্যার' সমাদ্দারের গলায় আন্তরিকতা স্পষ্ট।

'একটা রিকোয়েস্ট ছিল সমাদ্দার সাহেব।'

'নিশ্চয়, বলুন।'

'একটি মেয়ে সম্বন্ধে ইনফর্মেশান দরকার। যতটা ইনফর্মেশান পাওয়া যায়। মেয়েটির নাম নূপুর মন্ডল। আপনি একটা কাগজে নোট করে নেবেন?'

'নিচ্ছি স্যার। এক মিনিট দাঁড়ান, একটা কাগজ নিয়ে আসি।'

কিছুক্ষণ পরে আবার সমাদ্দারের গলা শোনা গেল, 'বলুন স্যার।'

'হ্যাঁ। মেয়েটির নাম নূপুর মন্ডল। বয়েস তেইশ-চব্বিশ। বড়জোর পঁচিশ। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি থেকে অঙ্ক অনার্স নিয়ে বি এস সি করেছে, তারপর ওখান থেকেই কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স। বাড়ি রায়গঞ্জ শহর থেকে খানিকটা দূরে। আপনাদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই মেয়েটির সম্বন্ধে যতটা জানা যায় জেনে দেবেন? বিশেষ করে জানতে হবে পুলিশের খাতায় মেয়েটির নাম আছে কিনা।'

'কোনও প্রবলেম হবে না স্যার। কয়েকদিনের মধ্যে জেনে নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেব। আর কিছু?'

'আপাতত এইটুকুই। পরে হয়ত আবার আপনাকে বিরক্ত করতে পারি।'

'বিরক্ত বলবেন না স্যার। আপনার জন্যে কিছু করা মানে দাশগুপ্ত সাহেবের জন্যে করা। ভাল থাকবেন স্যার। আমি খবর পেলেই আপনাকে জানাব।'

বাকি দিনটা আদিত্যর এটা-ওটা ভাবতে ভাবতে কেটে গেল। রাত্তিরে মেসে ফিরে আবার সেই নিরানন্দ ডিনার। তরকারির সঙ্গে আজ একটা ডিমও ছিল। কিন্তু এত ঝাল দিয়েছে, ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যায়। কবে

যে ভানু ঠাকুর ফিরে আসবে!

দশটা নাগাদ নূপুরের ফোন। গলায় খুশি ঝরে পড়ছে।

'আদিত্যদা, থাকার জায়গা পেয়ে গেছি। কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব!'

'কী হল খুলে বল।'

'আমি প্রথমে ওই নম্বরে ফোন করলাম। বললাম রত্নাবলী মিত্রর কাছ থেকে নম্বরটা পেয়েছি। তুমি যেমন বলতে বলেছিলে। বললাম আমি চাকরি করি, থাকার জায়গা খুঁজছি, শুনেছি তোমাদের ওখানে একটা জায়গা খালি আছে। তবে সেক্টর ফাইভে চাকরি করি প্রথমে বলিনি। ওরা ওদের ওখানে যেতে বলল। আমি সন্ধে সাতটা নাগাদ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়িটা পার্ক সার্কাস কানেক্টারের ধারে। আমার অফিস থেকে যাওয়া খুব সুবিধে।'

নূপুর একটু থামল। আদিত্য বলল, 'তারপর?'

'মেয়েগুলো খুব ভাল। আমার থেকে দুএক বছরের ছোট। সকলেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। তবে আমি সেক্টর ফাইভে কাজ করি শুনে বেশ গাঁইগুঁই করছিল। বলল, অত রাত্তিরে বাড়ি ফিরলে ওদের ঘুম ভেঙে যাবে। পরদিন সকালে উঠে ক্লাশ করবে কী করে? অনেক কথাবার্তার পর ঠিক হল, বাড়িতে যে খুব ছোট একটা ঘর আছে, যেটাকে এখন ওরা স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করছে, সেখানে একটা খাট ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আমি সেখানে একা থাকব। তাহলে রাত্তিরে আমি ফেরার সময় কেউ বিরক্ত হবে না। ঘরটাতে জানলা নেই, পাখাও নেই। কিন্তু ওটুকু আমি সহ্য করে নেব। এখন তো শীত আসছে। পাখার অতটা দরকার হবে না। আর নেহাত দরকার পড়লে না হয় একটা টেবিল ফ্যান কিনে নেওয়া যাবে। সব মিলিয়ে আমি খুব খুশি। কাল শনিবার আমার ছুটি। সকালেই মালপত্তর নিয়ে শিফট করে যাচ্ছি। তোমার জন্যই একটা মাথা গোঁজার জায়গা পেলাম। কী উপকার যে হল। বলেছিলাম না আমি লোক দেখে ঠিক বুঝতে পারি সে কেমন। তোমাকে দেখেই ভালো লোক মনে হয়েছিল।'

নূপুর মন্ডলের উচ্ছ্বাস আর থামে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলটা আদিত্যর পছন্দ। বাগবাজারে ছিল আদিত্যর মামার বাড়ি, শ্যামবাজারে মাসির বাড়ি। খুব ছোটবেলায়, যখন আদিত্যর মা বেঁচে, তখন প্রায় প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মার সঙ্গে সে মামার বাড়ি যেত। আর মামার বাড়ি গেলে একবার মাসির বাড়ি যাওয়া হতোই। বৃহস্পতিবার করে মামার বাড়ি যাওয়া হতো, কারণ ওই দিনটাই আদিত্যদের মিশনারি ইস্কুলে ছুটি থাকত। মামার বাড়িতে আদিত্যর দুই দিদি তার থেকে অনেকটাই বড়। কাজেই সেখানে তার বিরাট খাতির। আর মাসির ছেলেমেয়েই ছিল না। তাই মাসির বাড়ি গিয়ে যা খুশি দৌরাত্ম্য করার অধিকার ছিল তার। বলরাম ঘোষ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আদিত্যর এইসব পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

আদিত্যকে যেতে হবে বাগবাজারের নিবেদিতা লেনে। রত্নার বন্ধু গার্গী বিশ্বাসের কাছ থেকে কেয়া বাগচির ফোন নম্বর পেয়ে আদিত্য তাকে ফোন করেছিল। কেয়া বাগচি সন্ধে ছটায় সময় দিয়েছে। সে থাকে নিবেদিতা লেনে একটা মেয়েদের মেসবাড়িতে। কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে বাস ধরে আদিত্য ফড়েপুকুরের মোড়ে বেশ আগে আগেই নেমে পড়েছিল। ইচ্ছে, ছেলেবেলার ওই পুরোনো রাস্তাগুলো দিয়ে একটু হাঁটবে। ইচ্ছে হলে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চা খাবে, রাস্তা দেখবে।

পুরোনো দোকানগুলো কিছু আছে, বেশিরভাগই নেই। মাসির বাড়ি গেলে বিকেলবেলা মালঞ্চ রেস্টোরেন্ট থেকে কাটলেট আসত। সেই মালঞ্চ কবে উঠে গেছে। মালঞ্চর উল্টো ফুটপাথে ছিল জোনাকি রেস্টোরেন্ট, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হতো, সেটাও আর নেই। অরফানের চায়ের দোকানটা অবশ্য এখনও রয়েছে, কিন্তু তার পাশে দত্ত বেকারি উধাও। বলরাম ঘোষ স্ট্রিট ধরে আদিত্য হাঁটছিল। আদিত্যর মাসি-মেসোর বনেদি বাড়িটা শরিকি মামলায় জর্জরিত হয়ে পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে আছে, মাসি-মেসো বহুদিন গত হয়েছেন। শ্যামপুকুর থানা পেরিয়ে, ডাফ ইস্কুলের সামনে দিয়ে, সরস্বতী ইস্কুলের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউতে পড়ল আদিত্য। ডাফ ইস্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময় বাবার কাছে শোনা সেই পুরোনো গল্পটা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে যারা ডাফ সাহেবের ইস্কুলে পড়ত তারা একটু বেশি শিখত, জানত, কথাও বলত একটু বেশি। তাদের বলা হতো ডেফো। এই 'ডেফো' থেকেই 'ডেঁপো' শব্দটার উৎপত্তি।

ভূপেন বোস এভিনিউ যেখানে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে মিশেছে সেখানে ডাইনে বেঁকে আরও খানিকটা হাঁটলেই রাস্তার মাঝখানে গিরীশ ঘোষের বাড়ি। বাড়ির দুপাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। গিরীশ ঘোষের বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়ে নিবেদিতা লেন চিৎপুরের দিকে চলে গেছে। সরু গলি। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে গত একশ-দেড়শ বছরে কলকাতার কোনও পরিবর্তনই হয়নি। গলি ধরে একটু এগোলে নিবেদিতা ইস্কুল, তাকে বাঁয়ে রেখে আরও কিছুটা হাঁটলে, যেখানে রাস্তাটা চিৎপুর রোডে গিয়ে পড়েছে প্রায় সেখানে, কেয়া বাগচির মেস।

চাকুরে মেয়েদের মেসবাড়ি। দুটো সিঁড়ি ভেঙে সদর দরজা, সিঁড়ির দুপাশে রোয়াক। একজন জাঁদরেল চেহারার কাজের মাসি রোয়াকের ওপর পা ছড়িয়ে বসে চুল বাঁধছিল। আদিত্য তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কেয়া বাগচি থাকেন?'

সে উঠে গিয়ে সদর দরজা খুলে হাঁক পাড়ল, 'অপু দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে লোক এয়েচে গো।' তারপর গলাটা একটু নামিয়ে আদিত্যকে বলল, 'আপুনি বাইরের ঘরে বোসো, অপু দিদিমণি নিচে নামছে।'

আদিত্য ধরে নিল কেয়া বাগচির ডাক নাম অপু।

মাসির পেছন পেছন আদিত্য সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা উঠোন, তার এককোণে একটা চৌবাচ্চা, গায়ে টুলু পাম্প লাগানো। উঠোনের বাকি অংশ জুড়ে সারি সারি ফুলগাছের টব। একটা বেগুনি রঙের ডালিয়া বেশ বড় হয়েছে। আর একটা টবে লাল-সাদা বোগেনভেলিয়া। আদিত্যর মনে পড়ল, এর পোষাকি নাম মারি পামার, আদিত্যদের আলিপুরের বাড়িতে খুব হত। দেখে মনে হয়, উঠোনের গাছগুলো বেশ যত্ন পায়।

উঠোন ঘিরে গোটা চারেক ঘর, তার একটাতে মাসি আদিত্যকে নিয়ে গিয়ে বসাল। আদিত্য আন্দাজ করল এটা ভিজিটার্স রুম, বিশেষ করে পুরুষ ভিজিটার এলে এখানে বসানো হয়, যেহেতু দোতলায় মেয়েদের ঘরে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। ঘরে কয়েকটা পুরোনো যুগের হাতলওলা চেয়ার, একদিকে একটা তক্তোপোশ, তার ওপর কয়েকটা ছোট ছোট তাকিয়া, মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিলের ওপর কয়েকটা বাংলা ম্যাগাজিন। আদিত্য লক্ষ করল দেয়ালে তিনটে ছবি টাঙানো রয়েছে, বিসর্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, বুকের ওপর দুই হাত মুড়ে বিবেকানন্দ, আর ঈষৎ অপটু হাতে আঁকা একটা সিনারি, নদীর ধারে সূর্য উঠছে। শেষোক্ত ছবিটা মনে হয় মেসবাসিনীদের কারও শিল্পকীর্তি।

কেয়া বাগচি ঘরে ঢুকল মিনিট কয়েক পরে, আদিত্য তখন একটা পুরোনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

'আপনি আদিত্য মজুমদার? আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন?' কেয়া বাগচি একটু জোরে কথা বলে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

আদিত্য লক্ষ করল, কেয়া বাগচির রঙ ফরসা, ছিপছিপে গড়ন, বাঙালি মেয়েদের আন্দাজে লম্বাই বলতে হবে। নাক-মুখ-চোখের আদলও খারাপ নয়। এমন মেয়ে বিয়ে করেনি কেন?

'বসুন, বসুন।' আদিত্যকে বসতে বলে কেয়া বাগচিও একটা চেয়ারে বসল। 'গার্গীও আমাকে ফোন করেছিল। বলল, আপনি একজন ডিটেকটিভ, চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। চন্দ্রাকে নিয়ে আমাদের ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। বলা নেই, কওয়া নেই, জ্বলজ্যান্ত মেয়েটা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! ওর স্বভাবটা কিন্তু মোটেই এরকম নয়।' কেয়া বাগচি শুধু যে জোরে কথা বলে তাই নয়, খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে।

'আপনি ঠিকই শুনেছেন, আমি একজন পেশাদার ডিটেকটিভ। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। শুধুমাত্র একজন পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে চন্দ্রাকে খুঁজছি না, চন্দ্রার সঙ্গে আমি একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। এক সময় আমরা বেশ বন্ধু ছিলাম। চন্দ্রার জন্য আমারও একটা বিশেষ উৎকণ্ঠা রয়েছে।'

'আপনি চন্দ্রার বন্ধু হলে আমারও বন্ধু। আমি আর চন্দ্রা একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। আপনিও কি ফিজিক্স?'

'না, না। আমি প্রেসিডেন্সিতে অঙ্ক পড়তাম। চন্দ্রার সঙ্গে পাশ ক্লাশ করতাম। তাছাড়া চন্দ্রাদের পাড়াতেই আমাদের বাড়ি ছিল। অনেক সময় একসঙ্গে বাড়ি ফিরতাম।'

'দাঁড়ান একটু চা বলে আসি।' কেয়া উঠে দাঁড়াল।

'ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু আগেই চা খেয়েছি।'

'আর একবার খান। আমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই, এই সময় আমাদের এখানে এমনিতেই চা হয়।' কেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে কাউকে কিছু একটা বলল। তার কথাগুলো আদিত্য ঠিক ধরতে পারল না, তবে আন্দাজ করে নিল, কেয়া চা দেবার কথা বলছে।

'আপনাদের এখানে কতজন থাকেন?' কেয়া ফিরে আসার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'একতলায় কেউ থাকে না। দোতলায় চারটে ঘর, দুটো বড়, দুটো ছোট। বড় ঘরগুলোতে দুজন করে থাকে, ছোট ঘরগুলোতে একজন করে। তিনতলাতেও ঠিক একই রকম, ছ'জনের থাকার ব্যবস্থা। এই মুহূর্তে সব সিট ভর্তি, অর্থাৎ বারোজন থাকেন এই বাড়িতে।'

'আর একতলায়?'

'একতলার চারটে ঘরের মধ্যে একটা খাবার ঘর, একটা রান্নাঘর, এই ঘরটা, এটাতে ভিজিটারদের বসানো হয়, আর একটা ঘর আছে যেটাতে আমাদের তিনজন রাতদিনের মাসি থাকে, তাদের মধ্যে দুজন কাজের মাসি আর একজন রান্নার মাসি।'

'চমৎকার ব্যবস্থা। আপনার এখানে কতদিন থাকা হল?'

'সে অনেকদিন। আমার বাড়ি বহরমপুর। ইস্কুল পাশ করার পর থেকে বাড়ি ছাড়া। হস্টেলে হস্টেলে মানুষ। কলেজে পড়ার সময় স্কটিশের হস্টেলে থাকতাম, তারপর এম এস সি পড়ার সময় ইউনিভার্সিটির হস্টেলে। এম এস সি পাশ করেই স্কুলের এই চাকরিটা পেয়ে গেলাম। চাকরি পাবার পর প্রথম পাঁচ-ছ' মাস গ্রে স্ট্রিটের কাছে একটা বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ছিলাম, তারপর থেকে এখানে। কুড়ি বছর হতে চলল। এখন এখানকার আমি সেকেন্ড সিনিয়রমোস্ট মেম্বার। দেশের বাড়িতে আর কেউ নেই, তাই যাওয়াই হয় না। এটাই এখন আমার বাড়ি।' কেয়া বাগচি হাসল। তার হাসিটা খুব খোলামেলা। মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আদিত্যর আবার মনে হল এই মহিলা বিয়ে করেননি কেন?

সেই কাজের মাসি, যে রোয়াকে বসে চুল বাঁধছিল, যে আদিত্যকে এই ঘরে এনে বসিয়েছে, ট্রেতে করে চা নিয়ে এল। সঙ্গে কিছু থিন অ্যারারুট বিস্কুট। চায়ের কাপগুলোকে প্রায় সৌখিন বলা চলে। বিস্কুটের প্লেটটাও বেশ নতুন ধরনের। সব মিলিয়ে মেসবাড়ি হলেও একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। আদিত্য ভাবছিল এই লক্ষ্মীশ্রীটা মেয়েলি স্পর্শ ছাড়া সম্ভব নয়, এটা কোনও পুরুষদের মেসবাড়িতে কখনও পাওয়া যাবে না। সে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'চন্দ্রা কখনও এখানে এসেছে?'

'অনেকবার এসেছে। আপনি তো জানেন আলিপুরে ওদের বিশাল বাড়ি। কিন্তু ওই বাড়িতে থাকতে চন্দ্রার ভাল লাগত না। তবু যতদিন ওর বাবা বেঁচে ছিলেন ততদিন কলকাতায় এলে ও আলিপুরের বাড়িতেই থাকত। বাবা মারা যাবার পর কিন্তু কলকাতায় যতবার এসেছে, আমার ঘরে রাত্তিরে থেকে গেছে। সৎমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একেবারেই ভাল ছিল না। আসলে চন্দ্রার বন্ধু বলতে বোধহয় একমাত্র আমিই ছিলাম।'

'তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন চন্দ্রা ওর পুরোনো বন্ধু এবং সহপাঠী পার্থ সান্যালকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল? ইন ফ্যাক্ট, এই ডিসেম্বরেই ওদের বিয়ে হবার কথা, এটাও নিশ্চয় জানেন?'

প্রশ্নটা শুনে কেয়া বাগচি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর থেমে থেমে বলল, 'আমি সবই জানি। আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে চন্দ্রার সঙ্গে আমার বিরাট কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল। কথা কাটাকাটির পর রাত্তিরে চন্দ্রা আমার সঙ্গে আর একটাও কথা বলল না। তারপর ভোরে উঠে ব্যাগ গুছিয়ে চলে গেল। চা-টুকু খেল না। তারপর আর চন্দ্রার সঙ্গে দেখা হয়নি। কদিন পরেই শুনলাম চন্দ্রাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' বলতে বলতে কেয়ার গলা ধরে এল।

'ঠিক কী নিয়ে আপনাদের মনোমালিন্য হয়েছিল বলতে অসুবিধে আছে কি?' আদিত্য একটু সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল।

'এমনিতে বলতাম না। কিন্তু যখন চন্দ্রাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তো সব কথা বলতেই হবে।' কেয়া একটু থামল। আদিত্য তাকে তৈরি হবার সময় দেবার জন্য নিজে চুপ করে রইল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল। একটা বিস্কুটে কামড় বসাল।

একটু পরে কেয়া নিজে থেকেই শুরু করল, 'এটা মাস খানেক আগেকার ঘটনা হবে। আমার তারিখ একদম মনে থাকে না, তাই আন্দাজে এক মাস বললাম। এটুকু মনে আছে ঘটনাটা মহালয়ার আগের। চন্দ্রা ফোন করে বলেছিল কলকাতায় আসবে। কলকাতায় এলে ইদানীং আমার সঙ্গেই চন্দ্রা থাকত, তাই আমাদের রান্নার মাসিকে বলে দিলাম আমার বন্ধু রাত্তিরে এখানে খাবে। আমার ঘরটা তিনতলায়। ওয়ান-সিটার হিসেবে বেশ বড়, দুজনের থাকতে কোনও অসুবিধে হয় না। চন্দ্রার পৌঁছতে পৌঁছতে সাধারণত রাত্তির সাড়ে আটটা-নটা বেজে যায়। সেদিন চন্দ্রার পৌঁছতে আরও দেরি হয়ে গেছিল। আমি বারবার ফোন

করছিলাম, কিন্তু চন্দ্রার মোবাইলে কানেক্ট করতে পারছিলাম না। চন্দ্রা এল প্রায় সাড়ে নটায়। তখন খাবার ঘরে ডিনার শুরু হয়ে গেছে। চন্দ্রাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বলল, ট্রেন লেট ছিল, তাই দেরি। আমি বললাম, তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর খুব খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে যা। খেতে খেতে চন্দ্রা প্রায় কোনও কথাই বলল না। আমিই একতরফা বকবক করে গেলাম। মনে হল, কিছু একটা নিয়ে চন্দ্রা খুব ডিসটার্বড আছে।

'খাবার পরে আমরা আমার ঘরে গেলাম। আমি শোবার জন্য বিছানা করতে যাচ্ছি, চন্দ্রা বলল, একটু পরে বিছানা করিস। আগে তোর সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। চন্দ্রার গলার স্বরে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, ও একটা গভীর সমস্যার মধ্যে আছে। আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে ও বলল, আমি বিয়ে করছি। ওখানে আর থাকা যাচ্ছে না। থাকাটা নিরাপদ নয়। বিয়ে করে অনেক দূরে চলে যাব। যা ভেবে শুরু করেছিলাম সেটা হল না। জীবনটা আর নষ্ট করতে চাই না। আমি বললাম, আমি তোর কথার একবর্ণও বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবি? চন্দ্রা বলল, শোন, আমি বুঝিয়ে বলছি। আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব। এই ডিসেম্বরেই বিয়ে। আমি বললাম, কাকে বিয়ে করবি? চন্দ্রা বলল, আমার পুরোনো বন্ধুকে। সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরোনো বন্ধু মানে কোন পুরোনো বন্ধু? চন্দ্রা জানাল, এ সেই ছেলেটি যে ওকে ছেড়ে বিশ বছর আগে অ্যামেরিকায় চলে গিয়েছিল। তার নাম শুনলাম পার্থ সান্যাল। হয়ত আগেও চন্দ্রা নামটা বলেছিল, আমার মনে ছিল না।

(২)

কাজের মাসি এঁটো চায়ের কাপ-ডিশ, বিস্কুটের প্লেট তুলে নিয়ে গেল। আশেপাশে কোনও বাড়িতে কোনও মেয়ে বেসুরো গলায় গান গাইছে। প্রতিবেশিদের বিড়ম্বনা। কান পেতে শুনলে বোঝা যায় ইমন গাওয়ার চেষ্টা করছে। পুরোনো গান। শিক্ষার্থীরা প্রথমেই শেখে। পিয়াকে নজরিয়া যাদু ভরি। এত খারাপ করেও গানটা গাওয়া যায়!

কেয়া আবার বলতে শুরু করেছে। 'আমি জানতাম অভিজিৎ সিং বলে একটি নকশাল ছেলের সঙ্গে চন্দ্রার অনেকদিনের সম্পর্ক। সেসব ছেড়ে এখন সে পার্থ সান্যালকে বিয়ে করতে চায় শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। পার্থ সান্যালকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু চন্দ্রার মুখে তার কীর্তিকলাপের কথা অনেক শুনেছি। আমি বললাম, তোর লজ্জা করে না, যে পার্থ সান্যাল তোকে ডাম্প করে অ্যামেরিকা চলে গেল, যে পার্থ সান্যাল তোকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করল, তাকে তুই বিয়ে করবি? কেন তার মেমসাহেব বউ-এর কী হল? চন্দ্রা বলল, পার্থর ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে এখন আমার কাছে ফিরে আসতে চায়। পার্থ আমাকে বিয়ে করার জন্য দেশে ফিরে আসছে। আমি বললাম, চন্দ্রা, তুই কি নিজেকে এতটুকু সম্মান করিস না? একটা ছেলে তোকে এতটা অপমান করল, এতদিন ধরে অবহেলা করল, এখন সে হঠাৎ তোকে বিয়ে করতে চাইছে বলে তুই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবি? কী গ্যারেন্টি আছে সে তোকে আবার ডাম্প করে বিদেশে চলে যাবে না? চন্দ্রা বলল, পার্থ তো আমাকে কুড়ি বছর আগে অ্যামেরিকায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমিই তখন রাজি হইনি। আমি বললাম, আর অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে তোর এতদিনের সম্পর্ক, যে সম্পর্কের কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। তাকে কী করে ভুলে যেতে পারলি? চন্দ্রা বলল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি অভিজিতের সঙ্গে আমার সম্পর্কটার কোনও পরিণতি নেই। ওই সম্পর্কটার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আমাদের কথা কাটাকাটি অনেক রাত্তির অব্দি চলল। শেষে ব্যাপারটা কুৎসিত ব্যাক্তিগত আক্রমণের পর্যায় চলে গেল। চন্দ্রা বলল, তোর বিয়ে হয়নি বলে তুই চাস না অন্য কারও বিয়ে হোক। আমি বললাম, তোর শরীরের খিদেটা তুই আর সামলাতে পারছিস না। তোর আসলে একটা যাহোক তাহোক পুরুষ মানুষ দরকার। এর পরে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ঘুমিয়েও পড়লাম। সকালে উঠে দেখি চন্দ্রা ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে যাবার জন্য রেডি। আমি বললাম, চন্দ্রা ব্রেকফাস্ট খেয়ে যা। চন্দ্রা

আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে চলে গেল। অথচ বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু চন্দ্রাকে খুব আপন ভেবেই কথাগুলো বলেছিলাম। অন্য কেউ হলে আমি তার বিয়ে নিয়ে মাথাই ঘামাতাম না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আদিত্য বলল, 'আসলে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা চন্দ্রা বোধহয় নিয়েই ফেলেছিল। আপনার কাছে শুধু একটা সমর্থন আশা করছিল। একটা অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনি বললেন না, চন্দ্রা যেখানে ছিল সেখানে সে নিরাপদ বোধ করছিল না। কেন নিরাপদ বোধ করছিল না, সেটা কি চন্দ্রা বলেছিল?'

'এটাই তো আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিয়ে নিয়ে এমন ঝগড়া হল যে ওই আসল কথাটাই চন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'আমি আর একবার ভেরিফাই করে নিচ্ছি, চন্দ্রা বলেছিল সে আর ওখানে থাকতে পারছে না। ওখানে থাকাটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই সে বিয়ে করে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে চায়। তাই তো?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি এইরকমই একটা কিছু চন্দ্রা বলেছিল।'

'আর কিছু বলেছিল? খুব ভাল করে ভেবে দেখুন।'

'হয়ত বলেছিল, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কোনও ব্যক্তির কথা কি চন্দ্রা বলেছিল যার জন্যে সে নিজেকে আনসেফ মনে করছে? সে ব্যক্তি মেয়েও হতে পারে বা পুরুষও হতে পারে।'

'নাঃ, সেরকম কারও কথা বলেনি। বললে আমার নিশ্চয় মনে থাকত।'

'আপনি কি চন্দ্রার ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছিলেন?'

'অবশ্যই জানিয়েছিলাম। আমার এক কলিগের স্বামী হোম ডিপার্টমেন্ট-এ বড় চাকরি করে। তাকে ধরে লালবাজারে গিয়েছিলাম। গিয়ে মনে হল ব্যাপারটা ওরা কিছুই জানে না। আমি ঝাঁকানি দেওয়াতে এখন নড়েচড়ে বসেছে।'

'আমি দু-একদিনের মধ্যে বসিরহাটে চন্দ্রার ইস্কুলে যাচ্ছি। যদি নতুন কিছু জানতে পারি আপনাকে জানাব। আর আপনারও যদি এর মধ্যে কিছু মনে পড়ে যায় আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমার ফোন নম্বরটা আপনার কাছে আছে তো?'

'থাকার তো কথা। দেখি সেভ করে রেখেছি কিনা।' কেয়া টেবিলের ওপরে রাখা তার মোবাইলটা তুলে কন্ট্যাক্টস-এ গিয়ে দেখল আদিত্যর নামটা নেই। বলল, 'সেভ করতে ভুলে গেছি। প্লিজ, আর একবার নম্বরটা বলবেন আমি সেভ করে নেব?' নম্বরটা সেভ করার পরেও চন্দ্রা তার মোবাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। যেন কিছু খুঁজছে। যেটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গিয়ে মোবাইলটা আদিত্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন চন্দ্রার ছবি। ওদের স্কুলে পুজোর আগে শারদোৎসব হয়েছিল, তখন কেউ তুলেছিল।

আদিত্য দেখল, দুটো ছবি। একটাতে চন্দ্রা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছে। দুপাশে কয়েক জন ছাত্রী। তারাও গাইছে। মনে হয় কোরাস। আর একটা দর্শকদের ছবি। একদম প্রথম সারিতে চন্দ্রা বসে আছে, তার পাশে অজানা কয়েকজন নারী ও পুরুষ। পেছনের সারিতে আরও কিছু দর্শক। একদম পেছনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদিত্যর মনে হল চন্দ্রার চেহারাটা খুব একটা বদলায়নি, যৌবনের চটকটা চন্দ্রা প্রায় ধরেই রেখেছে। মনে মনে আদিত্য এর তারিফ না করে পারল না। তার পাশাপাশি পার্থর চুল উঠে যাওয়া, ভুঁড়িওলা এখনকার চেহারাটা রীতিমত বেমানান।

মোবাইলটা কেয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আদিত্য বলল, 'ছোটবেলার চেহারাটা চমৎকার ধরে রেখেছে চন্দ্রা। আমাকে এই ছবিদুটো হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন প্লিজ? আমার খুব কাজে লাগবে। চন্দ্রার আরও ছবি যদি থাকে সেগুলোও।'

'চন্দ্রার আর কোনও ছবি আমার কাছে নেই। ছবি-টবি তোলা চন্দ্রার খুব একটা পছন্দ ছিল না। ভেবেছিলাম ফেসবুকে ছবি দুটো দেব। চন্দ্রা ভীষণ আপত্তি করেছিল। ফেসবুকে নিজের ছবি দেওয়াকে চন্দ্রা

এক্সিবিশনিসম মনে করত। আমিও তাই আর দিইনি।'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। বেশি রাত্তির অব্দি বোধহয় মেয়েদের মেসবাড়িতে কোনও পুরুষের থাকাটা ঠিক নয়। মুখে বলল, 'আজ উঠি। আপনি আমাকে অনেকটা সময় দিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেবেন না। প্লিজ ধন্যবাদ দেবেন না। চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। আপনি জানেন না চন্দ্রা আমার কতটা ক্লোজ বন্ধু ছিল।' কেয়া বাগচি হঠাৎ ভীষণ ইমোশানাল হয়ে গেল।

'কিছু জানাবার হলে আমাকে ফোন করবেন।' আদিত্য বেরোতে বেরোতে বলল। 'হয়ত আবার আমাকে আসতে হবে।'

'কিছু জানাবার থাকলে নিশ্চয় ফোন করব। আর দরকার হলে অবশ্যই আসবেন। শুধু আগে একটা ফোন করে দেবেন।' তারপর একটু থেমে কেয়া বাগচি বলল, 'আজ থেকে তো আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।'

কেয়া বাগচির মেস থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটার পরেই পকেটের ভেতর একটা টুং শব্দ শুনে আদিত্য পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে দেখল হোয়াটস অ্যাপে চন্দ্রার ছবিদুটো এসে গেছে।

(৩)

আদিত্য ভেবেছিল শ্যামবাজারের মোড় থেকে ট্রাম ধরবে। ট্রাম জিনিসটা আদিত্যর ভারি পছন্দ। ট্রামের ধীরস্থির হাবভাবের সঙ্গে আদিত্যর নিজস্ব হাবভাবের খুব মিল আছে। তাছাড়া একবার জানলার ধারে একটা সিট পেয়ে গেলে তো কথাই নেই। নিজেকে রাজা-রাজা মনে হয়। তখন ট্রামের ভেতরে বসে চারদিকের শহর, ভীড়, রাস্তাঘাট, দোকান দেখতে দেখতে যাওয়াকে আদিত্য রয়াল ট্রিটমেন্ট মনে করে। সব কিছুই যেন বাইরের, দূরের, অথচ কত কাছে। কিন্তু আদিত্যর দুর্ভাগ্য, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও ট্রাম এল না। আর বাসগুলোর যা চেহারা, উঠতে ইচ্ছে করে না। সে ঠিক করল হেঁটেই ফিরে যাবে। শ্যামবাজারের মোড় থেকে তার মেস হেঁটে মিনিট চল্লিশের বেশি লাগবার কথা নয়। পথে, হেঁদুয়ার মোড় পেরোলে, একটা পাইস হোটেল পড়ে। ওখানেই রাত্তিরের খাবারটা সেরে নেওয়া যাবে। মেসের রান্না আর মুখে দেওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, ভানু ঠাকুর পরশু দিন ফিরে আসবে। আদিত্য ফিঙ্গার ক্রশ করে রেখেছে। পাইস হোটেল পেরিয়ে আরও কিছুটা হাঁটলে গলির মধ্যে সন্তোষের দোকান। ওরকম দই কলকাতায় খুব বেশি লোক করতে পারে না। কপাল ভাল থাকলে দোকানটা খোলা পাওয়া যেতেও পারে। মাছের ঝোল ভাতের পর এক ভাঁড় ভালো দই! এরপর আর কী বা চাওয়ার থাকতে পারে বিধাতার কাছে।

খুব বেশি ভিড় নেই হোটেলটায়। কাউন্টারের লোকটা বলল, ভাত এখনও নামেনি। নামতে নামতে মিনিট দশেক সময় লেগে যাবে। বসে থাকার পক্ষে হোটেলের ভেতরটা খুব সুবিধের নয়। আদিত্য বাইরে এসে সিগারেট ধরাল। কী করে সময় কাটানো যায় ভাবতে ভাবতে আদিত্যর মনে হল বিমলকে একবার ফোন করা দরকার। বিমলের ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না। এরকম তো কখনও হয় না। বিমল তো সব সময় ফোন ধরে। ছেলেটা কোনও ঝামেলায় পড়ল নাকি? আদিত্য আর একবার নম্বরটা লাগাল। এবার দু-তিন বার বাজার পর ফোনটা ধরল বিমল। লাইনে খুব ডিস্টার্বেনস। বিমল কোনও রকমে বলল, 'বাসে রয়েছি স্যার, নেমে ফোন করছি।'

বিমল যখন ফোন করল ততক্ষণে আদিত্যর ডাল ভাজা এসে গেছে। ভাতের ওপর ডাল ঢালতে ঢালতে আদিত্য বলল, 'একটা কাজ আছে, কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে দরকার হবে, তুমি এখন কলকাতায় আছ তো?'

'যাব আর কোথায় স্যার? এখানেই আছি। টালিগঞ্জে ওই নাইট গার্ডের কাজটাই করছি। কবে আমাকে লাগবে স্যার?'

'সেটা কাল-পরশুর মধ্যে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে স্যার। টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে স্যার। একটা উপরি কাজ পেলে খুব উপকার হয়।'

'টানাটানি কেন? হঠাৎ কী হল?'

'মেয়েটা অসুখে পড়ল স্যার। টাইফয়েড। প্রথমে তো ধরাই যাচ্ছিল না। তারপর মেয়েটা সেরে উঠতে না উঠতে বউ অসুখে পড়ল। কীসব মেয়েলি রোগ। ডাক্তার বলল, এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে। নীলরতনে ভর্তি করে দিলাম। অপারেশন হল। এই সবে বাড়ি এসেছে। এখন ভাল আছে। তবে তিন মাস ভারি কাজ করা বারণ। মেয়ে আর আমি কোনও রকমে সামলে নিচ্ছি। ছেলেটা তো আল্লার ষাঁড়, কোনও কাজে লাগে না। শুধু দুবেলা খাবার সময় তাকে বাড়িতে দেখা যায়।'

'তোমার এত বিপদ গেল আমাকে জানাওনি কেন?'

'আপনাকে আর কত বিরক্ত করব স্যার? একেবারে উপায় না দেখলে আপনার কাছে আসতেই হত। আমার এক শালা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। তাই দিয়েই হয়ে গেল। তবে টাকাটা তাকে ফেরত দিতে হবে। তাই বলছিলাম, একটা উপরি কাজ পেলে খুব উপকার হত স্যার।'

'কাজ একটা আছে। আমি তোমাকে দুএকদিনের মধ্যে জানাচ্ছি। আজ রাখছি। সাবধানে থেক।'

'আপনিও সাবধানে থাকবেন স্যার। আজ তাহলে রাখছি?'

'রাখো। আমি পরে ফোন করব।' আদিত্য ফোন কেটে দিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আদিত্য যখন পাইস হোটেল থেকে বেরোল তখন প্রায় নটা বেজেছে। বিধান সরণী তখনও বেশ জমজমাট। আদিত্য সিগারেট ধরাল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট খাওয়া আদিত্যর পছন্দ নয়। তাছাড়া ভর পেটে হাঁটতেও ইচ্ছে করছে না। সামনেই যে বাস স্টপটা চোখে পড়ল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল আদিত্য। বাস ট্রাম যা আসে উঠে পড়বে। দইটা আর খাওয়া হল না। যাক গে, আরেক দিন হবে।

কেয়া বাগচির কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। চন্দ্রা বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিয়ে করার ব্যাপারে তার কোথাও একটা সংকোচ ছিল। তাই সে কেয়ার সমর্থন চেয়েছিল। কেয়ার সমর্থন মানে সমাজের সমর্থন। চন্দ্রা তার স্বেচ্ছা-নির্বাসন থেকে সমাজে ফিরতে চেয়েছিল। তাই সমাজের সমর্থনটা তার দরকার ছিল। কিন্তু কেয়াই বা কেন চন্দ্রার বিয়েতে আপত্তি করল? চন্দ্রার ভালোর জন্যে? নাকি অন্য কোনও কারণে? অন্য প্রশ্ন, চন্দ্রা কি নিজে থেকে গা ঢাকা দিয়েছে নাকি তাকে অপহরণ করা হয়েছে? যেটাই হোক, আদিত্যর কিন্তু স্থির বিশ্বাস চন্দ্রা বেঁচে আছে।

হেঁদোর দিক থেকে হেলতে দুলতে একটা ট্রাম এগিয়ে আসছে। আদিত্যর ভাগ্য ভাল ট্রামটা বেশ ফাঁকা। উঠেই আদিত্য একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল। জানলার ধারে নয়, তবে সামনের জানলা দিয়ে রাস্তাটা খানিকটা দেখা যায়। আদিত্যর বোধহয় তুঙ্গে বৃহস্পতি যাচ্ছে। একটু পরেই তার পাশের লোকটা উঠে পড়ল। আদিত্যর এখন জানলার সিট। জানলার ধারে সিট পেয়ে আদিত্য দই না খাওয়ার দুঃখ ভুলে গেছে। অবশ্য কতটুকুই বা পথ।

রাস্তার ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে। দোকানদার শাটার নামিয়ে দিয়ে দোকানের সামনে কাগজ পোড়াচ্ছে। দোকান বন্ধ করার আগে কাগজ পোড়ানোর রীতি আদিত্য অনেকদিন ধরে দেখছে, কিন্তু এর মানেটা সে ভাল জানে না। রাত্তিরে যখন দোকানদার দোকানে থাকবে না, তখন কি অগ্নিদেবকে দোকান পাহারা দিতে বলা হচ্ছে? নাকি অগ্নিদেবকে বলা হচ্ছে দোকানির অনুপস্থিতিতে তিনি যেন দোকানে না ঢোকেন অর্থাৎ দোকানে যেন আগুন না লাগে? ফুটপাথে বসা হকার তার বেসাতি পুঁটলিতে পুরে বোঁচকা বাঁধছে। ফুটপাথবাসী বধূ উনুনে রান্না চাপিয়েছে।

আর একটু এগিয়ে ট্রাম ট্র্যাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে গেল। আদিত্য লক্ষ করল, এই অবেলায় উল্টোদিকের ফুটপাথে তিনটি কিশোরী প্রবল বেগে ফুচকা খেয়ে চলেছে। যতক্ষণ ট্রামটা দাঁড়িয়ে রইল আদিত্য সকৌতুকে ওদের ফুচকা খাওয়া দেখছিল। তিনটি মেয়ের মধ্যে একজন আবার বাঁ-হাতি। সে ডান হাত দিয়ে শালপাতা ধরে বাঁ-হাত দিয়ে ফুচকা তুলে মুখে পুরছে। এখন এত ফুচকা খেলে রাত্তিরে ভাত খাবে কী করে? ফুচকাওলার মালমশলা ফুরিয়ে গেছে। সে আবার নতুন করে মাখছে।

সিগনাল সবুজ হয়ে গেল, ট্রাম আবার চলতে শুরু করেছে। ফুচকা বিলাসী তিনটি মেয়ের ছবিটা এখনও আদিত্যর মাথায় ঘুরছে। শেষ কবে ফুচকা খেয়েছিল আদিত্যর মনেই পড়ে না। তখন বোধহয় দুটাকায় পাঁচটা ফুচকা পাওয়া যেত। এখন কত দাম হয়েছে কে জানে?

আদিত্য যখন মেসে ফিরে ঘরের দরজা খুলছে তখন দশটা বেজে গেছে।

(৪)

ঘরে ফিরে আদিত্য কিছুক্ষণ ইউ টিউবে ইরশাদ খানের হামীর শুনল। ইমরত খানের ছেলে ইরশাদ। চমৎকার বাজাচ্ছে আজকাল। কখনও কখনও পুরোনো বিলায়েতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাজনা শেষ হবার আগেই টেলিফোন। আদিত্য বাজনা বন্ধ করে ফোন ধরল। গৌতমের গলা, টেলিপ্যাথিই বলতে হবে। সে গৌতমকেই ফোন করবে ভাবছিল।

'কী রে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

'আরে না না। এখন তো সবে সন্ধে। গান শুনছিলাম।'

'তোদের সেই অ্যা অ্যা গান? পারিসও বটে। রাত দুপুরে অ্যা অ্যা গান।' গৌতমের গলায় বিরক্তি।

'একটু ধর, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।'

আদিত্য মোবাইল রেখে টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট-দেশলাই নিয়ে সিগারেট ধরাল। একটা লম্বা সুখটান দিয়ে মোবাইল তুলে বলল, 'এবার বল।'

'আমার সমস্যাটা একটু খুলে বলি।' গৌতম বলতে শুরু করল, 'একটা স্পেশাল টিমে কাজ করার জন্য আমাকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল। এই টিমটা বেসিক্যালি একটা অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড। তবে আমার কাজটা ছিল আর একটু স্পেসিফিক। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টেররিস্ট গ্রুপগুলোর কাছে যে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছচ্ছে তার সাপ্লাই চেনটা ট্র্যাক করা এবং যারা এই সাপ্লাইটা দিচ্ছে তাদের আইডেন্টিফাই করাটাই ছিল আমার কাজ। নানারকম এভিডেন্স থেকে বোঝা গিয়েছিল, আর্মস-এর একটা বড় সাপ্লাই আসছে বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে। তাই বেঙ্গল কাডারের একজন অফিসারের দরকার ছিল, যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে কাজ করতে পারবে। আমাকে দিল্লিতে ডাকার মূল কারণ এটাই।'

'তুই গত এক বছরে কী জানতে পারলি?'

'হ্যাঁ, সেটাই বলছি। প্রচুর পরিশ্রম করে এটা জানতে পারলাম যে এই সাপ্লাই চেনের মূল পাণ্ডা আসলাম খান বলে এক বাংলাদেশী। আসলামের জন্ম কুমিল্লায়, ইস্কুল কলেজ ঢাকায়। ঢাকায় থাকতে থাকতেই সে এই ব্যবসা শুরু করে। এখন তার ব্যবসা বেশ বড় হয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে অস্ত্র কিনে সে মূলত ভারতেই অস্ত্র বিক্রি করে। তবে কাশ্মীরে নয়। কাশ্মীরের সাপ্লাই আসে পাকিস্তানের দিক থেকে, সেটা একটা আলাদা সোর্স। বিভিন্ন টেররিস্ট আউটফিট আসলামের খদ্দের। এদের মধ্যে যেমন মাওবাদীরা আছে, তেমনি আছে ব্যাঙ্গালোর-হায়দ্রাবাদ-গুজরাত-মহারাষ্ট্রতে সক্রিয় নানা ইসলামিক মিলিটেন্ট গ্রুপ। এদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলার জন্য আসলামকে মাঝে মাঝে ভারতে আসতে হয়। আমাদের কাছে খবর আছে যে বেশ কিছুদিন হল সে ভারতেই থাকছে। বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম টু হট ফর হিম। সম্ভবত সে পশ্চিমবঙ্গেই আছে, কারণ তার কনসাইনমেণ্টগুলো বাংলাদেশ দিয়ে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গেই আসে।'

'পুলিশের কাছে আসলাম খানের কোনও ছবি আছে?'

'আনফরচুনেটলি নো। আমরা শুধু এইটুকু শুনেছি যে আসলাম ঢাকার ইস্কুল-কলেজে পড়েছে। কোন ইস্কুল, কোন কলেজ, কবে পড়েছে এসব কিচ্ছু জানি না। জানলে আরও খানিকটা ইনফরমেশন পাওয়া যেত।' গৌতমের গলায় স্পষ্ট হতাশা।

'আমাকে কী করতে বলছিস?'

'দ্যাখ অতীতে একাধিকবার তুই আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছিস। তোর বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার বিপুল ভরসা। তোর ফোন পাবার পর আমি চন্দ্রা সেনের ব্যাপারটা খোঁজ নিলাম। নকশাল বলে চন্দ্রার নাম

পুলিশের খাতায় আছে। তুই বললি চন্দ্রা সেনের কেসটা তুই ইনভেসটিগেট করছিস। আমার মনে হল সাপ্লাই চেনের ব্যাপারটা আসলাম বা তার এজেন্টের দিক থেকে না দেখে যারা আসলামের কাছ থেকে অস্ত্র কিনছে তাদের দিক থেকে দেখলে কেমন হয়? আমাদের কাছে এই ইনফরমেশনও আছে যে পুরুলিয়ার ওই মাওবাদী দলটা আসলামের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনে। দলের অবস্থা এখন ভাল নয়। চন্দ্রা সেনও হয়ত সেই কারণে অ্যাবস্কন্ড করে আছে। হয়ত লুকিয়ে থেকে নতুন করে দলটাকে গড়ে তোলায় সাহায্য করছে। তাই যদি হয় তাহলে ওদের আবার অস্ত্রশস্ত্রের দরকার পড়বে। সেক্ষেত্রে আসলাম বা তার এজেন্টের সঙ্গেও চন্দ্রা বা তার দল একটা যোগাযোগ রেখে চলবে। তার মানে, চন্দ্রাকে ট্রেস করা গেলে হয়ত আসলাম খানের একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তুই এই ব্যাপারে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করতে পারবি।'

'বুঝলাম।' আদিত্যর গলাটা খানিকটা চিন্তিত শোনালো। 'কিন্তু তোরা কি নিশ্চিত যে চন্দ্রা সেনের সঙ্গে দলটার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল?'

'যোগাযোগ তো অবশ্যই ছিল। তবে সে দলটা চালাত না, দল চালাত অভিজিৎ সিং। অভিজিতের মতো চন্দ্রা অ্যাকশানে থাকত না, কিন্তু আমাদের সন্দেহ সে দলকে নানা রকম পরামর্শ দিত। অর্থাৎ সে ছিল দলের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। ইস্কুলে পড়ানোটা তার কামুফ্লাজ।'

'হতে পারে। আমি যেটুকু জানতে পারব, পুলিশকে অবশ্যই জানাব। তোরাও আমাকে দরকার মতো সাহায্য করিস।'

'পুলিশের সাহায্যের ব্যাপারে তুই নিশ্চিন্ত থাক। আর একটা জিনিস। চন্দ্রা পুরুলিয়া ছেড়ে বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে চলে গেল কেন?'

'ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। এটা কাকতালীয় হতে পারে আবার এর পেছনে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। আমি পুরুলিয়া, বসিরহাট দুটো জায়গাতেই যাচ্ছি। প্রথমে পুরুলিয়া যাব, তারপর বসিরহাট। আশা করছি, এসব জায়গায় গেলে ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারব। যখন যেটুকু জানতে পারছি তোকে জানাব।'

'ওক্কে, গুড নাইট।' গৌতম কথা বলতে বলতে হাই তুলল।

'গুড নাইট।'

(৫)

আদিত্য ফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার ফোন। এবার সঞ্জয় সমাদ্দার।

'খুব কি দেরি হয়ে গেল স্যার? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'না, না। আপনি বলুন।'

'আসলে কাল খুব ভোরে একটা ইনভেসটিগেশনে বেরিয়ে যেতে হবে। কখন ফিরব ঠিক নেই। তাই ভাবলাম রাত্তিরেই আপনার সঙ্গে কথা বলে নিই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন।'

'আপনি নূপুর মণ্ডল বলে যে মেয়েটার কথা জানতে চেয়েছিলেন তার সম্বন্ধে খবর নিয়েছে স্যার। নূপুরের একটা পাস্ট আছে। মেয়েটার বাবা মেয়েটার মাকে খুন করে জেলে যায়। জেলেই তার মৃত্যু হয়। নূপুর মণ্ডল তখন ছোট কিন্তু বোঝার বয়েস হয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকে নূপুর মাসির কাছে মানুষ।'

'তাই নাকি?' এরকম হতে পারে আদিত্য একেবারেই ভাবেনি। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'নূপুরের নিজের কি কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে?'

'না, না। একেবারেই নেই। অভাগা মেয়ে স্যার। খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে। ওই চত্বরে নূপুর মণ্ডলকে সকলেই ভালবাসে।'

'নূপুরের বাবা নূপুরের মাকে খুন করেছিল কেন?'

'পুলিশ রেকর্ড বলছে, লোকটার সন্দেহ-বাতিক ছিল। সন্দেহের বশে সে বউকে খুন করে। নূপুরের মার কোনও দোষ ছিল না। লোকটার যাবজ্জীবন হয়েছিল। জেলে ঢোকার বছর খানেকের মধ্যেই লোকটা মারা যায়।'

'নূপুর কি কখনও রাজনীতি-টিতি করত? এই ধরুন, অতি বাম রাজনীতি?'

'তেমন কোনও রেকর্ড পুলিশের কাছে নেই স্যার।'

'কলেজ ছাড়ার পর নূপুর কী কী করেছে?'

'এটারও কোনও রেকর্ড পুলিশের কাছে নেই স্যার। আসলে নূপুরকে ট্র্যাক করাটা তো পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে আপনি যদি বলেন আমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

'এক্ষুনি মনে হচ্ছে না তার দরকার হবে। পরে দরকার হলে বলব।'

'নিশ্চয় বলবেন স্যার।'

'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার খুব উপকার হল। ভাল থাকবেন। আজ রাখছি।'

'আপনিও ভাল থাকবেন স্যার।'

আদিত্য ভাবছিল। নূপুরের একটা ভয়ঙ্কর ছেলেবেলা আছে। সম্ভবত এটা দিয়েই ওর অস্বাভাবিক, অতি সক্রিয় হাবভাবটা ব্যাখ্যা করা যায়।

আর একটা ফোন করতে হবে। রাত্তির হয়ে গেছে। কিন্তু যাকে ফোন করবে তাকে একটু রাত্তির ছাড়া ধরা যায় না। আদিত্য নম্বরটা ডায়াল করল। একটু পরে ওপার থেকে উৎফুল্ল গলার শব্দ শোনা গেল, 'আরে, আদিত্য যে। তোর ব্যাপারটা কী? ফোন-টোন করা ছেড়েই দিয়েছিস।'

'তোর মক্কেলরা গেছে? কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবি?'

'আজকের মতো গেছে। নাউ আই অ্যাম অল ইয়োরস। বল কেমন আছিস?'

সুনন্দ মিত্র আদিত্যর ইস্কুলের বন্ধু। কলকাতার একেবারে প্রথম সারির ক্রিমিনাল লইয়ার। রাত্তির অব্দি তার চেম্বারে মক্কেল বসে থাকে। সুনন্দর পরামর্শেই একসময় আদিত্য গোয়েন্দাগিরিতে এসেছিল।

'সুনন্দ, আমার একটা ইনফরমেশন দরকার। তুই কি কে কে সেন-এর কথা জানিস? পুরোনো যুগের ব্যারিস্টার। মারা গেছেন তাও বেশ কিছুদিন হল। আলিপুরে থাকতেন।'

'কুমুদকিশোর সেন? বাবা কমলকিশোর সেন? ঠাকুরদা কৃষ্ণকিশোর সেন? সকলেই কে কে সেন। সকলেই ব্যারিস্টার। আইনের জগতে এদের কে না চেনে? তাছাড়া তিন পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারের সঙ্গে এদের পরিবারের গভীর যোগাযোগ। তুই এদের সম্বন্ধে ঠিক কী জানতে চাস?'

আদিত্যর মনে পড়ে গেল সুনন্দরাও তিন পুরুষের ব্যারিস্টার। সে বলল, আপাতত জানতে চাই কে কে সেন-এর সম্পত্তির ওয়ারিস কারা? সম্পত্তির পরিমাণই বা কত? এটা কি জানা সম্ভব? কেন জানতে চাই পরে বলছি।'

'এটা জানা খুব শক্ত নয়। কুমুদকাকার সম্পত্তি দেখাশোনা করে সামারভিল অ্যান্ড চৌধুরি বলে খুব পুরোনো একটা সলিসিটার ফার্ম। এদের বর্তমান কর্তা অভীক চৌধুরি আমার খুবই বন্ধু। ওর সঙ্গে তোকে কথা বলিয়ে দেব। একটা কাজ কর। কাল শুক্রবার, উইকএন্ড, আমার চেম্বার নেই। তুই সন্ধেবেলা আমার ক্লাবে চলে আয়। ওখানে অভীকদাকেও পেয়ে যাবি। আমি আলাপ করিয়ে দেব।'

'কটা নাগাদ যাব?'

'আমি সাড়ে সাতটা থেকে দোতলায় বারে থাকব। তুই তোর সুবিধে মতো চলে আয়। রাত্তিরে ডিনার খেয়ে যাবি। আমি ডাইনিং হলে জায়গা রিজার্ভ করে রাখছি।'

'ঠিক আছে। আমি সাড়ে সাতটাতেই পৌঁছে যাব। কেন কে কে সেন সম্বন্ধে জানতে চাইছি সেটা লম্বা গল্প। এখন বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। কাল দেখা হলে বলব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটাই ভাল। আমার এখনও রাত্তিরের খাওয়া হয়নি। কাল তোর গল্প শুনব। টা টা।'

আদিত্য আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল, আবার ফোন। আলো জ্বালিয়ে টেবিল থেকে মোবাইলটা নিয়ে আদিত্য দেখল নূপুর মণ্ডলের ফোন। কী আশ্চর্য! একটু আগেই তো নূপুরকে নিয়ে সঞ্জয় সমাদ্দারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল!

সাড়া দিতেই নূপুরের গলা। 'হ্যালো, আদিত্যদা। অনেক রাত্তিরে ফোন করছি। প্লিজ কিছু মনে কোরো না। কী করব? রোজ আপিস থেকে বেরতে বেরতে রাত্তির বারোটা বেজে যাচ্ছে। আজও একটু আগে আপিস থেকে বেরোলাম। তুমি বলেছিলে না অনেক রাত্তির অব্দি জেগে থাক? তাই সাহস করে ফোন করলাম। রাগ করনি তো?'

আদিত্য বলতে যাচ্ছিল সে রাগ করেনি, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করে তার উত্তরের অপেক্ষা করা নূপুরের ধাতে নেই। সে অনর্গল বলে যাচ্ছে, 'খুব দরকার না হলে সত্যিই তোমাকে ফোন করতাম না। কিন্তু কী করব বল, খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। সেদিন বলেছিলাম না, আমার একটা নয়, দুটো বিপদ। একটা বিপদ তো তুমি সামলে দিলে। এখন মাথা গোঁজার ঠাঁই একটা হয়েছে। তুমি সাহায্য না করলে সেটা হতো না। দ্বিতীয় বিপদটা ভেবেছিলাম এক্ষুনি আসবে না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। বিপদটা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে।'

বলতে বলতে নূপুরের খেয়াল হল আদিত্য শুনছে তো? সে গলাটা একটু তুলে বলল,'আদিত্যদা শুনতে পাচ্ছ?'

এতক্ষণে আদিত্য কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগ বিশেষ কাজে না লাগিয়ে সে ছোট্ট করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছি, তুমি বলে যাও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। আমার দ্বিতীয় বিপদটা হল, আগামী সপ্তাহ থেকে আমার চাকরিটা আর থাকছে না। এখানে জয়েন করার পর থেকেই শুনতে পাচ্ছি কম্পানির অবস্থা ভাল নয়। যে কোনও দিন নতুনরা ছাঁটাই হয়ে যেতে পারে। তবে সেটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ভাবিনি। গতকাল নোটিস ধরিয়ে দিয়েছে। সামনের সপ্তাহ থেকে আর চাকরি নেই। এক মাসের নোটিসও দিল না। ছোট প্রাইভেট কম্পানি, মগের মুল্লুক, নিয়ম টিয়মের ধার ধারে না। চাকরি না থাকলে এই শহরে চলবে কী করে? খাব কি? রায়গঞ্জে ফিরে গিয়েও লাভ নেই। ওখানে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। কার কাছে যাই, কী করি ভাবতে ভাবতে তোমার কথা মনে পড়ল।'

নূপুর কিছুক্ষণ থামল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আদিত্যদা তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সিতে আমাকে একটা কাজ দেবে? কিছুদিনের জন্যে হলেও হবে। আমি তার মধ্যে পারমানেন্ট একটা কিছু নিশ্চয় পেয়ে যাব। আমি কথা দিচ্ছি, খুব মন দিয়ে কাজ করব। একটুও ফাঁকি দেব না। আমার সত্যিই খুব বিপদ আদিত্যদা। এই শহরে আমার থাকাটা খুব দরকার। না থাকলে চাকরি খুঁজব কী করে? দেবে একটা টেম্পোরারি কাজ?'

আদিত্য হতভম্ভ হয়ে গেছে। নূপুর যে এই রকম একটা অনুরোধ করতে পারে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে নিচু গলায় বলল, 'নূপুর, আজ অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। শুয়ে পড়ো। কাল বা পরশু আমি তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলব।'

শুয়ে পড়ার আগে আদিত্য মোবাইলটা সুইচ অফ করে চার্জে দিল। আজ রাত্তিরে আর সে ফোন ধরতে চায় না। আজ অনেক ফোন হয়েছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল আদিত্য। ঘুম আসছে না। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে কয়েকটা মুখ ভেসে উঠছে, কয়েকটা ছবি। কেয়া বাগচি, গৌতম, সঞ্জয় সমাদ্দার, নূপুর মণ্ডল। শ্যামবাজার, হেঁদো, ঠনঠনিয়া। ফুটপাথবাসী বউ রান্না চাপিয়েছে। তিনটে মেয়ে ফুচকা খাচ্ছে। খেয়েই যাচ্ছে। তাদের একজন ডান হাতে শালপাতা ধরে বাঁ হাতে ফুচকা মুখে তুলছে। তুলেই যাচ্ছে। সে গত কয়েকদিনে যা দেখেছে বা শুনেছে তার মধ্যে কোথাও একটা গভীর অসংগতি আছে। কী অসংগতি? কী অসংগতি? ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে আদিত্যর

অবচেতন মন তাকে সচেতন করে দিচ্ছে সে যা দেখেছে বা শুনেছে তার মধ্যে একটা গভীর অসংগতি আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

পরের দিন সকালে আদিত্য আপিস যাওয়ার জন্য সবে রাস্তায় পা দিয়েছে এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠল। কেয়া বাগচির নম্বর। আদিত্য সাড়া দিতেই ওদিক থেকে কেয়া বাগচির ঈষৎ উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা খুব দরকার। আজ আমার ইস্কুল ছুটির পর দেখা করতে পারবেন?'

'কখন দেখা করতে চাইছেন?'

'ধরুন পাঁচটা নাগাদ। আমার ইস্কুলের কাছে, বিডন স্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মোড়ের উত্তর পশ্চিম কোণে একটা নতুন কফিশপ হয়েছে। নাম দিয়েছে ক্যাফে অ্যান্ড শুগার। ওখানে বসে কথা বলা যেতে পারে। আমি ইস্কুল ছুটি হলে ওখানে চলে যাব। আসতে পারবেন?'

'হঠাৎ কিছু ঘটেছে?'

'টেলিফোনে বলছি না। দেখা হলে বলব। প্লিজ একবার আসুন।'

'চলে আসব। তবে ঘন্টাখানেকের বেশি থাকতে পারব না। সন্ধেবেলা একটা জায়গায় যেতে হবে।'

'আধঘন্টার বেশি আপনাকে আটকাব না। আসছেন তো? খুব দরকার।' কেয়া বাগচির গলাটা প্রায় কাতর শোনাল।

'অবশ্যই আসব। রাখছি তাহলে। পাঁচটায় দেখা হচ্ছে।' আদিত্য ফোনটা কেটে দিয়ে পকেটে রাখল।

আদিত্য কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে দেখল ট্রামে-বাসে তখনও বেশ ভীড়। এত ভীড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। তার থেকে এইটুকু পথ হেঁটে যাওয়াই ভাল। আপিসে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর কোনও তাড়া নেই। এমন নয় যে শয়ে শয়ে মক্কেল তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। আদিত্য কফি হাউসের নিচ থেকে দু-প্যাকেট সিগারেট কিনল। আশা করা যায় এতে আজ সারাদিন চলে যাবে। কোনও কোনও দিন অবশ্য তার কুড়িটা সিগারেটে দিন চলে না, রাত্তিরের দিকে আরেক প্যাকেট কিনতে হয়।

পথে অনেক লোক, ছাত্র, হকার, ঠেলাগাড়িতে স্তূপাকার বইপত্র চাপিয়ে ঠেলাওলা বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিটে ঢুকেছে। ফলে গাড়িগুলো সব ঠেলার পেছনে আটকে গেছে। আদিত্য একটা সিগারেট ধরাল। কিন্তু সে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট খেতে পারে না। একবার ভাবল, কফি হাউসে উঠে এক কাপ কফি খেয়ে যাবে। কিন্তু হাতে অনেক কাজ, কফি খেতে গেলে নির্ঘাত দেরি হয়ে যাবে। বরং সংস্কৃত কলেজের গায়ে যে চায়ের দোকানটা আছে সেখানে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা খাওয়া যেতে পারে। তাতে সিগারেটেরও সদ্ব্যবহার হবে।

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে আদিত্য ভাবছিল। পুরুলিয়া এবং বসিরহাট দুটো জায়গাতেই খুব শিগগির যাওয়া দরকার। আগে পুরুলিয়া যেতে হবে। ওখানেই চন্দ্রার অতীতটা লুকিয়ে আছে। ওখানে কাজ সারতে অন্তত তিন চার দিন লেগে যাবে। কিন্তু তারপরে বসিরহাট গেলে দেরি হয়ে যাবে। একটা-দুটো ট্রেল যদি বা পাওয়া যেত সেগুলোও হারিয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা কাজ করলে কেমন হয়? সে নিজে পুরুলিয়ায় গিয়ে যদি নূপুর মণ্ডলকে বসিরহাটে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে হয়ত ও কিছু দরকারি খবর যোগাড় করে আনতে পারে। নূপুর তো কাজ খুঁজছে। মেয়েটাকে চালাক-চতুর মনে হয়। কত তাড়াতাড়ি আদিত্যর কাজে যোগ দিতে পারবে? জিজ্ঞেস করতে হবে। নূপুরকে বসিরহাট পাঠানোর আর একটা সুবিধে আছে। পার্থ বসিরহাটে সকলকে আদিত্যর পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে। এতে কাজের অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু নূপুর যদি অন্য কোনও পরিচয়ে বসিরহাট যায় তাহলে তার পক্ষে খবর জোগাড় করাটা সহজ হবে। অবশ্য একটা

খরচের দিকও আছে। পার্থ যথেষ্ট টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই দিয়ে অনায়াসে নূপুরকে কাজ দেওয়া যাবে। আদিত্যর মনে হল এখনই কথাটা পার্থকে বলার দরকার নেই। হয়ত ও কাউকে বলে ফেলতে পারে। যেমন আদিত্যর পরিচয়টা বলে ফেলেছে। তাহলে নূপুরকে বসিরহাট পাঠানোর উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যাবে।

আপিস যাবার পথে আদিত্য একবার ব্যাঙ্কে থামল। টাকা তুলতে হবে। পাশবইটাও আপডেট করা দরকার। টাকা তোলার লাইনে অপেক্ষা করতে করতে মোবাইল থেকে পার্থকে সে একটা ইমেল করল। লিখল, পার্থ যেন তাকে একটা ফোন করে। কিন্তু সে নূপুরকে নিয়োগ করার কথা কিছু লিখল না। এখান থেকে হোয়াটঅ্যাপে সব সময় পার্থর নম্বরটা পাওয়া যায় না। ব্যাঙ্কের কাজ সেরে আদিত্য যখন বউবাজারে তার আপিসে পৌঁছল তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

পাঁচটার একটু আগেই বিডন স্ট্রিট চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে পৌঁছে গেল আদিত্য। ক্যাফে অ্যান্ড সুগার নামক কফিশপটা খুঁজে নিতে অসুবিধে হল না। এক ঝলক দেখেই বোঝা যায় নতুন হয়েছে। ভেতরটা প্রায়ান্ধকার। ভীড় একেবারে নেই। শুধু এক কোণে একটি যুগল খুব ঘন হয়ে বসে ফিসফিস করে কথা বলছে। দোকানের বাইরের চাতালেও চাঁদোয়া টাঙিয়ে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। আদিত্য সেখানেই বসল। রাস্তা দেখতে দেখতে কফি খাওয়া যাবে। তাছাড়া দোকানের ভেতরে বসা ওই যুগলকেও খানিকটা প্রাইভেসি দেওয়া দরকার। কেয়া বাগচি কখন আসবে কে জানে? আদিত্য একটা বড় কফি আমেরিকানো অর্থাৎ কালো কফি অর্ডার করল।

কাছাকাছি কোথাও কোনও মেয়েদের ইস্কুল ছুটি হয়েছে। সাদার ওপর নীল খোপকাটা ইউনিফর্ম পরা দলে দলে মেয়ে বাড়ি ফিরছে। কেউ একা, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে, কেউ মায়ের হাত ধরে। এই ইস্কুলেই হয়ত কেয়া পড়ায়। যদি তাই হয় তাহলে কেয়াও এক্ষুনি এসে যাবে। আদিত্য মগ্ন হয়ে দুই মায়ের কথোপকথন শুনছিল।

একজন আরেকজনকে বলছে, 'তোদের ক্লাশে আজ কী কী বাক্য রচনা দিল রে?'

'আমাদের ক্লাশে পঞ্চাশটার একটা লিস্ট দিয়েছে। বাড়ি থেকে তৈরি করে আনতে বলেছে। তোদের ক্লাশে?'

'আমাদেরও অনেকগুলো দিয়েছে। কটা দিয়েছে আমার মেয়ে বলতে পারল না। তবে অনেকগুলো।'

'তাহলে রাফ বুকগুলো মিলিয়ে নেব। দুটো মেলালে হয়ত সত্তর আশিটা হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।'

আদিত্য ভাবছিল, এরা এদের মেয়েদের ক্লাশকে নিজেদের ক্লাশ বলছে, মেয়েদের রাফ বুককে নিজেদের রাফ বুক। মেয়েকে পড়িয়ে বিদ্যেধরী বানানো ছাড়া এদের জীবনে আর কোনও লক্ষ্য নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে আদিত্য টের পায়নি কখন কোন দিক থেকে কেয়া বাগচি এসে তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে।

'বাইরে বসলেন? ভেতরে বসলে ভাল হতো না? ভেতরে এসি রয়েছে তো। বাইরেটা যা গরম।' কেয়ার কপালে সত্যিই বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'বেশ তো। চলুন না ভেতরেই বসি।' আদিত্য নিরীহভাবে বলল।

'তাছাড়া কোনও ছাত্রী আমাকে আপনার সঙ্গে এখানে বসে থাকতে দেখলে স্কুলে রটিয়ে দেবে কেয়া মিস এই বুড়ো বয়সে প্রেম করছে।' কেয়া বাগচি হাসতে হাসতে বলল।

আদিত্যও হাসল। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখল হালকা ভাবে বললেও কেয়া কথাটা একেবারে ভুল বলেনি। সে কেয়ার পেছন পেছন ক্যাফের ভেতরে ঢুকল। একটা কোণের দিকের টেবিল বেছে নিয়ে তারা ধীরে সুস্থে বসল। যেদিকের কোণে ঘনিষ্ঠ যুগলটি বসেছিল তার উল্টোদিকের কোণে।

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা মেনুটা কেয়ার হাতে তুলে দিয়ে আদিত্য বলল, কী খাবেন বলুন। আমি কিন্তু নিজের জন্য একটা কালো কফি বলে দিয়েছি।'

'আমার খুব খিদে পেয়েছে। সারাদিন অনেকগুলো ক্লাশ নিয়েছি। আমি একপ্লেট চিকেন স্যান্ডউইচ খাব। আপনি কি খাবেন বলুন।'

'আমি একটু আগেই লাঞ্চ খেয়েছি। শুধু কফি খাব।'

বেয়ারা আদিত্যর কফিটা নিয়ে এসেছে। তাকে একপ্লেট চিকেন স্যান্ডউইচ এবং একটা কাপুচিনো অর্ডার দিল কেয়া। বেয়ারা একটু দূরে যেতেই আদিত্য বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? এত জরুরি তলব কেন?'

কেয়ার মুখের অভিব্যক্তিটা চকিতে বদলে গেল। যেন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটা সঙ্কটের মধ্যে সে রয়েছে। সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কাল আপনি চলে যাবার পর দুটো ঘটনা ঘটেছে যেগুলো আমার মনে হয় আপনার এক্ষুনি জানা দরকার। তাই আপনাকে আসতে বললাম।' তারপর খানিকটা থেমে কেয়া বলল, 'একটু জল খেতে পারলে ভাল হতো। ইস্কুল ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছি। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

আদিত্য ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল দিতে বলল। বেয়ারা জলের বোতল আর দুটো ফাঁকা গ্লাস এনে টেবিলে রেখে দুটো গেলাসে জল ভরে দিয়ে চলে যেতেই প্রায় এক ঢোঁকে আধ গেলাস জল খেয়ে ফেলল কেয়া। তারপর আবার বলতে শুরু করল, গতকাল আপনি মনে হয় আটটা নাগাদ আমাদের হস্টেল থেকে বেরোলেন। আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার খোঁজে একজন ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত।'

'কতক্ষণ পরে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমার ধারণা আপনি চলে যাবার মিনিট দশেকের মধ্যে। ডেফিনিটলি সাড়ে আটটার আগে।'

'কী করে এতটা নিশ্চিতভাবে বলছেন ভদ্রমহিলা সাড়ে আটটার আগে এসেছিলেন?'

'সাড়ে আটটা থেকে আমাদের ডিনার শুরু হয়। ভদ্রমহিলা যখন এসেছিলেন তখনও ডিনার শুরু হয়নি।'

'বুঝেছি। তারপর?' আদিত্যর একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ক্যাফের ভেতরে বড় বড় করে নো স্মোকিং লেখা আছে। বাইরে বসলে হয়ত সিগারেট খাওয়া যেত। সেটা যখন আর হচ্ছে না, তখন মনে মনে 'যাক গে যাক' বলে সে স্থির হয়ে বসল।

'ভদ্রমহিলা এসে বললেন, উনি চন্দ্রার ইস্কুল, অর্থাৎ বনবীথি থেকে এসেছেন। উনি চন্দ্রার কলিগ। নাম অনিমা সামন্ত।' কেয়া একটু থেমে আর এক ঢোঁক জল খেল। আর ঠিক তখনই বেয়ারা এসে কেয়ার স্যান্ডউইচ আর কাপুচিনো টেবিলের ওপর রেখেছে।

আদিত্য বলল, 'আপনি আগে খেয়ে নিন।'

কেয়া আপত্তি করল না। মনে হয় তার সত্যিই খিদে পেয়েছে। প্লেটে দুটি পেল্লায় স্যান্ডউইচ। তার একটাতে কামড় দিয়ে কেয়া কাপুচিনোতে একটা চুমুক দিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল।

'অনিমা সামন্ত নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। চন্দ্রা এঁর কথা মাঝে মাঝেই বলত। উনি বনবীথি ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস, সকলে ওঁকে বড়দিদি বলে। আমি বললাম, আপনার কথা চন্দ্রার মুখে অনেক শুনেছি। ভদ্রমহিলা একটু মলিন হাসলেন। বললেন, চন্দ্রার কোনও খোঁজখবর পেলেন? আমি মাথা নাড়লাম। উনি বললেন, চন্দ্রার এইভাবে হারিয়ে যাওয়াটা যে আমাদের ইস্কুলের কী অপূরণীয় ক্ষতি বলে বোঝাতে পারব না। ওর কাছে অঙ্ক আর ইংরিজি শিখবে বলে দূর দূর থেকে মেয়েরা আসত। ওর মতো লেখাপড়া তো আমাদের কারও নেই। আমরা কী করে ওর জায়গা নেব? তাছাড়া ও মানুষটা এত ভাল, ওকে সকলে এত ভালবাসত, ওর অভাবটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। বলতে বলতে ভদ্রমহিলার চোখে জল এসে গেল। তাই দেখে আমারও চোখে জল। এই চোখের জল ব্যাপারটা খুব ছোঁয়াচে। সে যাই হোক, এইসব কথা শেষ হবার পর ভদ্রমহিলা আসল কথায় এলেন। বললেন, বনবীথি ইস্কুলটা অনেক দিন ধরেই সরকারি স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করছে। এ-নিয়ে সরকারের প্রাইমারি স্কুল দপ্তরকে বিস্তর চিঠিপত্র লিখতে হয়েছে। চিঠি লেখার কাজটা চন্দ্রাই করত। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে প্রাইমারি স্কুল দপ্তরকে তাগাদা

লাগাবার দায়িত্বটাও ছিল তার। ফলে এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র চন্দ্রার কাছে থাকত। কোথায় যে সে এই কাগজপত্র রাখত আমরা কেউ জানতাম না, জানার দরকারও মনে করিনি কখনও। এখন চন্দ্রা নেই, ফলে সেই কাগজপত্রগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আগামী মাসে প্রাইমারি স্কুল ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের ইস্কুলে ইন্সপেকশান হবার কথা। চন্দ্রা অন্তত সেইরকমই বলেছিল। ইন্সপেকশানের সময় যদি দরকারি কাগজপত্রগুলো হাতের কাছে না থাকে তাহলে খুবই অসুবিধে হবে। আমি বললাম, এ-ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? ভদ্রমহিলা বললেন, চন্দ্রা তার পার্মানেন্ট ঠিকানা হিসেবে আপনার ঠিকানাটাই দিয়েছিল। আমরা জানি, কলকাতায় এলে সে আপনার এখানেই থাকত। চন্দ্রার কোনও কাগজপত্র কি এখানে আছে? একটু ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ে গেল চন্দ্রার একটা সুটকেস আমার খাটের তলায় রয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলাকে অপেক্ষা করতে বলে সুটকেসটা ঘর থেকে নিয়ে এলাম। তারপর আমরা দুজনে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। দুর্ভাগ্যবশত পুরোনো জামাকাপড় আর কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই সুটকেসে পাওয়া গেল না। ভদ্রমহিলাকে বেশ হতাশ দেখাল। তিনি বিরস মুখে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এটা নিয়ে আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন?' আদিত্য একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

'এর পরের ঘটনাটা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন কেন উতলা হচ্ছি।' বলতে বলতে কেয়া দ্বিতীয় স্যান্ডউইচটাকে আক্রমণ করল। কাপুচিনোর অবশিষ্টাংশ সহ সেটার সদ্ব্যবহার করে এক গেলাস জল খেল। তারপর বলতে শুরু করল আবার।

'ভদ্রমহিলা সব মিলিয়ে মিনিট দশেক আমাদের হস্টেলে ছিলেন। তিনি চলে যাবার পর ঘরে গিয়ে সুটকেসটা আবার খাটের তলায় রেখে দিলাম। তারপর নিচে খেতে নামবো ভাবছি এমন সময় নিচ থেকে আমাদের কাজের মাসির গলা শুনে বুঝলাম আবার কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নেমে দেখি যিনি এসেছেন তিনি বনবীথি ইস্কুলের আর একজন দিদিমনি। নাম বললেন, সোনালী সাঁতরা। একে আমি চিনি। ইনি ইস্কুলে সেলাই, উলবোনা, হাতের কাজ এইসব শেখান। সবাই ওঁকে সোনাদিদি বলে। ইনি চন্দ্রার সঙ্গে একবার আমাদের হস্টেলে এসেছিলেন। চন্দ্রার হারিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেক দুঃখ-টুঃখ করে শেষে সোনাদিদি বললেন, চন্দ্রার বাড়িওলা বলেছিল চন্দ্রার ঘরটা খালি করে দিতে হবে। তাই সোনাদিদি চন্দ্রার জিনিসপত্রগুলো একটা সুটকেসে করে নিয়ে এসেছিল। আর একটা সুটকেস ইস্কুলের ক্লার্ক গৌরবাবুর বাড়িতে রাখা আছে। ইস্কুলে সুটকেস রাখার সুবিধে নেই। তাই সোনাদিদি সুটকেস এখানে রেখে যেতে এসেছে। সোনাদিদি ঠিক করেছিল, এর পর যেদিন কলকাতা আসবে সেদিন নিজেই সুটকেসটা পৌঁছে দেবে। তা এতদিনে কলকাতা আসার সুযোগ হল।'

এই পর্যন্ত শুনে আদিত্য বলল, 'আমি আর একটা কফি খাচ্ছি। আপনি খাবেন?'

'পরে একটা কফি খাব। কিন্তু তার আগে ক্যাফে অ্যান্ড সুগার-এর সুগারের অংশটা টেস্ট করা দরকার। এরা চমৎকার স্ট্রবেরি শর্টকেক বানায়। আপনি যদি খান তাহলে আমিও একটা খেতে পারি।'

আদিত্য বুঝল কেয়ার স্ট্রবেরি শর্টকেক খাওয়াটা সম্পূর্ণভাবে আদিত্যর নিজের স্ট্রবেরি শর্টকেক খাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। যদি আদিত্য না খায়, কেয়াও চক্ষুলজ্জার খাতিরে খেতে পারবে না। সে স্ট্রবেরি শর্টকেক খেতে রাজি হয়ে গেল।

কেয়া ভুল বলেনি। ক্যাফে অ্যান্ড সুগার-এর স্ট্রবেরি শর্টকেক সত্যিই চমৎকার। কিছুক্ষণ দুদিকেই নীরবে খাওয়া-দাওয়া চলল। তারপর আবার কফির অর্ডার দিয়ে কেয়া তার গল্পে ফিরে গেল।

'সুটকেসটা নিয়ে আমি সোনাদিদিকে বললাম, আপনাদের বড়দিদি তো এই একটু আগে এখানে এসেছিলেন। শুনে সোনাদিদি এত অবাক হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। আমি তখন বড়দিদির আসার কারণটা বিশদে বললাম। তাই শুনে সোনাদিদি আস্বস্ত হওয়া দূরের কথা আরও অবাক

হয়ে গেল। তারপর হড়বড় করে যা বলে গেল তার সারমর্ম হল, বড়দিদি এখানে আসতেই পারে না। কারণ এই বাড়িতে ঢোকার একটু আগে সে ফোনে বড়দিদির সঙ্গে কথা বলেছে। বড়দিদি বসিরহাটেই আছে। তাছাড়া ইন্সপেকশন হবে বলে সরকারি স্বীকৃতি পাবার সব কাগজপত্র তো সে নিজে আজ সকালে সল্ট লেকের বিকাশ ভবনে প্রাইমারি ইস্কুলের দপ্তরে জমা দিয়ে এসেছে। বস্তুত কাগজপত্র জমা দিতেই তো সে কলকাতায় এসেছে। আর কাগজপত্র কিছুই হারায়নি। সব দরকারি কাগজপত্রই চন্দ্রা দিদিমনির টেবিলের ওপর ছিল।'

'ইনটারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং।' আদিত্য না বলে পারল না।

তারপর সে কেয়াকে বলল, 'মনে হয়, কেউ বড়দিদি সেজে চন্দ্রার কাগজপত্রের খোঁজে আপনার কাছে গিয়েছিল। হয়ত সে চন্দ্রার অনুমানের কথা জানত। হয়ত সে ভেবেছিল চন্দ্রা তার অনুমানের কথা কোথাও লিখে রেখেছে। কিংবা তার কাগজপত্রের মধ্যে তার অনুমানের সমর্থনে কিছু প্রমাণ আছে। আমাকে একবার কাগজপত্রগুলো দেখতে হবে। আমি পুরুলিয়া যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। এরা কিন্তু আবার আসতে পারে। এই সুটকেসটার খোঁজেই আবার আসতে পারে।'

বিল মেটানোর সময় একপ্রস্থ ধস্তাধস্তি হল। কেয়া কিছুতেই আদিত্যকে বিল মেটাতে দেবে না। তার একটাই কথা, 'আমিই তো জোর করে খেলাম। আপনি কেন পয়সা দেবেন? আমি দেব।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য আদিত্যই জিতল। কেয়াকে একটা উবার ধরিয়ে দিয়ে আদিত্য মেট্রো স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগাল। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছিল, যদি কেয়া জানত ক্যাফে অ্যান্ড সুগারের এই বিলটা আদিত্য এক্সপেন্স দেখিয়ে পার্থর কাছ থেকে আদায় করে নেবে, অর্থাৎ বিলের টাকাটা পার্থর পকেট থেকেই যাবে, তাহলে হয়ত সে আদৌ আদিত্যকে বিল মেটাতে দিত না।

(২)

সুনন্দ মিত্রর ক্লাবটা আদিত্যর খুব চেনা। বাবা বেঁচে থাকতে সে বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝেই এখানে আসত। পরেও কয়েকবার সুনন্দর সঙ্গে আড্ডা দিতে এখানে এসেছে। ক্লাবের ভেতরটা এতগুলো বছরেও তেমন বদলায়নি। শুধু, আদিত্য লক্ষ করেছে, ক্লাব মেম্বারদের গড় বয়েসটা যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এর একটাই মানে হতে পারে। আজকালকার কম বয়সী ছেলেমেয়েরা এই ধরনের সনাতন ক্লাবে আসার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পায় না। দুপুরে সুনন্দ ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছিল, সন্ধেবেলা ক্লাবে ঢুকতে গেলে কলারবিহীন টি-শার্ট, পেছনে স্ট্র্যাপবিহীন জুতো এবং জিনস পরা চলবে না। মনে করানোর অবশ্য দরকার ছিল না, কারণ এক, এগুলো আদিত্য জানত এবং দুই, এর কোনওটাই আদিত্য পরে না। তবে এটা ভেবে আদিত্যর হাসি পেয়ে যায় যে এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার পুরোনো ক্লাবগুলোতে এই ধরনের কলোনিয়াল মনোভাব সগর্বে জারিয়ে রাখা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম এই সেকেলে মনোভাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য।

বারের এক কোণে সুনন্দ একা একা বসে হুইস্কি খাচ্ছিল। আদিত্যকে ঢুকতে দেখে হাত নাড়ল।

'তোকে একটু রান ডাউন দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি? খুব কাজের চাপ?' আদিত্য চেয়ার টেনে বসার পর সুনন্দ প্রশ্ন করল।

'দূর! আমার আবার কাজের চাপ! তবে ইদানীং একটা কাজ নিয়ে একটু দৌড়োদৌড়ি করতে হচ্ছে। সে কাজটার জন্যই তোর হেল্প চাইছি।'

'কাজের কথা পরে হবে। আগে বল কী খাবি। আমি ব্ল্যাক লেবেল খাচ্ছি। তুই ব্ল্যাক লেবেল খাবি?'

'আমি একটা জিন অ্যান্ড টনিক খাব।' আদিত্য খানিক ভেবেচিন্তে বলল।

'ভেরি ব্রিটিশ চয়েস।' সুনন্দর গলায় সম্মতির সুর। 'তুই যতই নিজেকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করিস না কেন আদিত্য, তোর ক্লাশটা কিন্তু মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ে।'

ক্লাশের কথা উঠলে আদিত্য রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে যায়। এটা ঠিক যে একসময় তারা কলকাতার একেবারে প্রথম সারির বনেদি বাড়িগুলোর একটা ছিল। সেই অবস্থা আর নেই। অনেকদিনই নেই। বিশেষ করে বাবা মারা যাবার পর তাদের সব সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন তার এমনই অবস্থা যে গোয়েন্দাগিরির মতো উঞ্ছবৃত্তি করে তাকে পেট চালাতে হয়। তাই পুরোনো আভিজাত্যের কথা কেউ বললে আদিত্যর ভাল লাগে না। সে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, 'তোর কথা বল। কেমন আছিস? নতুন খবর কিছু আছে?'

'ভালই আছি। আর নতুন খবর বলতে আমার বড় ছেলেটা এবছর স্কুল পাশ করে ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশানাল ল স্কুলে পড়তে ঢুকেছে। পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স। পাঁচ বছর পরে পাশ করে বেরোলে আমার জুনিয়ার করে ঢুকিয়ে দেব। আর তখন যদি একবার বিলেত যেতে চায়, না হয় ঘুরে আসবে। ওর ব্যাপারে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। ছোটটার অবশ্য সবে ক্লাশ এইট।'

'কাবেরী কেমন আছে?'

'কাবেরীর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল। হাই শুগার। ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। শুগার এতটাই বেড়েছে যে ইনসুলিন নিতে হয়। তবে আজকাল ইনসুলিনের কোয়ালিটি অনেক ইমপ্রুভ করেছে। মাঝখানে শরীরের জন্য কিছুদিন ছুটি নিয়েছিল। এখন আবার কোর্টে যাচ্ছে। আমাদের জাজ এত কম, বেশিদিন ছুটিও নেওয়া যায় না। গত সপ্তাহে কাবেরী লামার্টিনিয়ার ফর গার্লস-এ প্রাইজ দিতে গেছিল। শি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড টু গো ব্যাক টু হার আলমা মটর অ্যাজ চিফ গেস্ট। সব মিলিয়ে এখন কাবেরী ভালোই আছে।'

কথা বলতে বলতে সুনন্দ হঠাৎ থেমে গেল। দূরে কাউকে দেখে হাত নাড়ল। তারপর আদিত্যকে বলল, 'ওই তো অভীকদা এসে গেছে।'

অভীক চৌধুরির বয়েস আদিত্য বা সুনন্দর থেকে খানিকটা বেশি, মনে হয় পঞ্চাশ পেরিয়েছে। সাহেব সাহেব চেহারা, হাবেভাবেও সাহেবি, তবে গোমড়ামুখো সাহেব নয়। সুনন্দ আলাপ করিয়ে দিল, 'অভীকদা এ আমার স্কুলের বন্ধু আদিত্য মজুমদার। আর আদিত্য, ইনি সামারভিল অ্যান্ড চৌধুরির অভীক চৌধুরি। অভীকদা আর আমি অনেকদিন একসঙ্গে লন্ডনে ছিলাম। কিংস কলেজে একসঙ্গে ল পড়েছি।'

আদিত্য হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, অভীক চৌধুরি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। সুনন্দ বলল, অভীকদাকে আমি বলেছি তুই কুমুদকাকার সম্পত্তিটার সম্বন্ধে জানতে চাস। তোর প্রফেশনটা কী সেটাও অভীকদাকে বলেছি।'

'আমরা অনেকদিন ধরেই কে কে সেন-এর সলিসিটর। আই ক্যান টেল ইউ হোয়াট ইজ পাবলিকলি নোন। বাট কানট ডাইভালজ এনিথিং কনফিডেনশিয়াল। সেটা আমার প্রফেশনাল এথিক্স-এর বিরুদ্ধে যাবে।' অভীক চৌধুরি একটু থেমে থেমে কথা বলেন।

'না, না। সেরকম কিছু আমি জানতে চাইব না।' আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল। 'আমি খুব ব্রডলি কে কে সেন-এর সম্পত্তির ওয়ারিশ কারা এটা জানতে চাইছি। কেন চাইছি, সেটা আগে বলি।' আদিত্যর জিন অ্যান্ড টনিক এসে গেছে। অভীক চৌধুরি কী পান করেন বেয়ারা নিশ্চয় জানত। সে জিন অ্যান্ড টনিকের সঙ্গে একটা রেড ওয়াইনের বোতলও নিয়ে এসেছিল। আদিত্য খেয়াল করল, ওয়াইনটা খাঁটি ফরাসি।

গেলাসে পানীয় ঢেলে দিয়ে বেয়ারা চলে যাবার পর আদিত্য সুনন্দকে জিজ্ঞেস করল, 'সুনন্দ, তুই কি কুমুদকিশোর সেনের মেয়ে চন্দ্রলেখা সেনকে চিনতিস?'

'একসময় খুব ভালই চিনতাম। তবে ওর ভাল নামটা মনে ছিল না। ওর ডাকনাম বুড়ি। আমরা ওই নামেই ওকে চিনতাম। আমারই ক্লাশে পড়ত। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বুড়ি ওর বাবা-মার সঙ্গে আমাদের কালিংপং-এর বাড়িতে প্রায় একমাস কাটিয়েছিল। আমরা দুজনেই তখন ক্লাশ ফোরে পড়ি। ওই সময় বুড়ির সঙ্গে আমার একটু প্রেম প্রেম ভাব হয়েছিল।' সুনন্দ হাসল।

'কাফস লাভ।' অভীক চৌধুরি ফোড়ন কাটলেন।

'তা হঠাৎ বুড়ির কথা উঠল কেন?' সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

'কেন উঠল বলছি। তার আগে বলি, তুই যাকে বুড়ি বলে চিনতিস আমি তাকে চন্দ্রা বলে চিনতাম। চন্দ্রা কলেজে আমাদের ইয়ারে ফিজিক্স পড়ত। আমার বেশ বন্ধুই ছিল। তবে প্রেমের সম্পর্ক কখনও হয়নি।' আদিত্য হাসল। 'এবার আসল কথায় আসি। প্রায় একমাস হতে চলল চন্দ্রাকে পাওয়া যাচ্ছে না। চন্দ্রার এখনকার বয় ফ্রেন্ড চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার জন্য আমাকে এমপ্লয় করেছে।'

'চন্দ্রলেখা সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না? অ্যান্ড উই আর নট ইভন ইনফরমড? দিস ইজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ।' অভীক চৌধুরি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। 'হার স্টেপমাদার শুড হ্যাভ ইনফরমড আস।'

'দেখুন, সৎমায়ের সঙ্গে চন্দ্রার খুব একটা যোগাযোগ নেই। চন্দ্রা বসিরহাটে একটা স্কুলে পড়াত। কলকাতায় কমই আসত। এলেও চন্দ্রা ওদের আলিপুরের বাড়িতে উঠত না। মিসেস সেনের পক্ষে চন্দ্রার খবরটা না জানাটা অস্বাভাবিক নয়।' আদিত্য ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'আপনি কি জানেন এটা নিয়ে কোনও এফ আই আর হয়েছে কিনা?' অভীক চৌধুরির গলা থেকে এখনও উৎকণ্ঠা যায়নি।

'বসিরহাট জেলার সোলাডাঙায় একটা পুলিশ স্টেশন আছে। আমি যতদূর জানি সেখানে একটা এফ আই আর হয়েছে। তাছাড়া লালবাজারও এখন কেসটা টেক আপ করেছে। আপনি পুলিশ ইন্সপেকটর সঞ্জয় সমাদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন কতদূর এগিয়েছে জানতে পারবেন। উনি লালবাজারেই বসেন। আমি ওর নম্বরটা আপনাকে টেক্সট করে দিচ্ছি। আমার রেফারেন্স দিতে পারেন। আপনার নম্বরটা একটু বলবেন?' আদিত্য অভীক চৌধুরির দিকে তাকিয়ে বলল।

নম্বর আদানপ্রদানের পর আদিত্য বলল, 'এবার কি বোঝা যাচ্ছে কেন জানতে চাইছিলাম কে কে সেন-এর সম্পত্তি কতটা আর তার ওয়ারিশই বা কারা?'

'কে কে সেনের সম্পত্তির পরিমাণ খুব কম নয়।' অভীক চৌধুরি চিন্তিত গলায় বললেন। 'আলিপুরে বাড়ি আর লন মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ কাঠা জমি। ওরকম প্রাইম লোকেশনে চল্লিশ কাঠা জমির কত দাম হতে পারে আমি অফহ্যান্ড বলতে পারব না। তবে অনেকটাই হবে। তাছাড়া হাজারিবাগে সেনেদের একটা বড় বাগানবাড়ি আছে। স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও বেশ কিছু টাকা কে কে সেন রেখে গেছেন। এই টাকাটা তিনি তিন ভাগে ভাগ করে গেছেন। একভাগের সুদ দিয়ে আলিপুর আর হাজারিবাগের বাড়ি দুটোর মেনটেনেন্স হয়। মেনটেনেন্স-এর দায়িত্ব আমাদের। দ্বিতীয় ভাগটা পেয়েছেন কে কে সেনের দ্বিতীয় স্ত্রী মিসেস কমলিকা সেন। তিনি টাকাটা দিয়ে কী করেছেন আমি বলতে পারব না। তৃতীয় ভাগটা কে কে সেনের প্রথম পক্ষের সন্তান চন্দ্রলেখা সেনের। তিনি টাকাটা আমাদের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন। একটা সামান্য অংশ মান্থলি ইনকাম স্কিমে রাখা আছে। যে সুদটা হয় সেটা মাসে মাসে চন্দ্রলেখা সেনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায়। বাকীটা, অর্থাৎ বেশির ভাগটা, আমরাই বেস্ট পসিবল ইনটারেস্ট-এ ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখি, ম্যাচিওর করলে আবার রিনিউ করাই। টাকাটা বাড়তে বাড়তে এখন একটা ফ্যাবুলাস অ্যামাউন্ট রিচ করেছে।'

'আলিপুর আর হাজারিবাগের বাড়ির মালিক কারা?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'কমলিকা সেন আর চন্দ্রলেখা সেনের সমান ভাগ। সম্পত্তিটা এমনভাবে ভাগ করা আছে যে দুজনেই তার অংশ আলাদা আলাদা ভাবে বিক্রি করতে পারেন। বাড়িটা পুব-পশ্চিম জুড়ে। সামনে লন। পুব দিকটা কমলিকা সেনের আর পশ্চিমের অংশটা চন্দ্রা সেনের। লনটার মালিকানাও দুভাগ করা। কিন্তু চন্দ্রা সেন তার অংশটা বিক্রি না করলে বাকি অংশটা লম্বাটে হয়ে যাবে। ফলে তার দামটাও অনেক কমে যাবে। যতদিন না সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে ততদিন আমাদের ওগুলো মেনটেন করে যেতে হবে। সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেলে মেনটেনেন্স-এর টাকাটা সমান দুভাগে ভাগ হয়ে কমলিকা সেন আর চন্দ্রলেখা সেনের কাছে চলে যাবে।'

'আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। চন্দ্রলেখা সেনের অবর্তমানে তার সম্পত্তির ওয়ারিশ কে?'

অভীক চৌধুরি মনে হয় এই প্রশ্নটারই অপেক্ষা করছিলেন। খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'দেখুন, চন্দ্রলেখার কিছু ঘটে গেলে তার নেক্সট অফ কিন-এর কাছে সম্পত্তি যাবার কথা। সেরকম কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। চন্দ্রলেখা নিজেই যদি কোনও উইল করে তার সম্পত্তি কাউকে দিয়ে যায় তাহলে তো ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। তবে চন্দ্রলেখা কোনও উইল করে গেছে কিনা তাও আমাদের জানা নেই।'

'চন্দ্রলেখার অবর্তমানে কমলিকা সেন কি তার সম্পত্তির মালিক হতে পারেন?'

'যদি চন্দ্রলেখার স্বামী অথবা রক্তের সম্পর্কের কেউ না থাকে আর সে যদি কোনও উইলও না করে যায়, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু সেকশন ফিফটিন অফ দি হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট, নাইন্টিন ফিফটি সিক্স, তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার বাবার জীবিত উত্তরাধিকারী অর্থাৎ তার সৎমা কমলিকা সেন।'

'থ্যাঙ্কস আ লট, মিস্টার চৌধুরি। আমি এইটুকুই জানতে চাইছিলাম।' আদিত্যর গলায় অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুনন্দ মিত্র বেশ দমে গিয়েছিল। এতক্ষণে তার গলা শোনা গেল, 'আদিত্য, তুই কি তাহলে বলতে চাইছিস সম্পত্তির লোভে বুড়িকে তার সৎমা লোপাট করে দিয়েছে?'

'না, না। আমি মোটেই সেরকম কিছু বলতে চাইছি না।' আদিত্য আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে বলল। 'কিন্তু ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে গেলে আমাকে তো সব সম্ভাবনাগুলোই মাথায় রাখতে হবে।'

'আর কী কী সম্ভাবনার কথা আপনি ভাবছেন?' এবার অভীক চৌধুরির গলা।

'চন্দ্রার সঙ্গে একটা এক্সট্রিম লেফট টেররিস্ট গ্রুপের বেশ ক্লোজ কানেকশন ছিল। এরা পুরুলিয়ার দিকে ঝাড়খণ্ডের বর্ডার বরাবর অপরেট করত। দল এখন ভেঙে গেছে। কিন্তু হতেই পারে চন্দ্রা ওদের কিছু সিক্রেট জানত বলে ওরা চন্দ্রাকে সরিয়ে দিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে নতুন করে আবার দল তৈরি করবে বলে চন্দ্রাই নিজে থেকে অ্যাবস্কন্ড করে আছে। আরও অনেক পসিবিলিটি আছে। সবটা আমি এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। কয়েকদিনের মধ্যে পুরুলিয়া যাচ্ছি। হয়ত ওখানে গেলে ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পারব।'

বেয়ারা আরেক প্রস্থ পানীয় দিয়ে গেছে। সকলেই চুপচাপ। সকলেই চিন্তামগ্ন। একটু পরে নীরবতা ভেঙে আদিত্য বলল, 'আচ্ছা, কমলিকা সেন সম্বন্ধে কিছু জানা যায়? উনি কী করেন, কীভাবে সময় কাটান, কাদের সঙ্গে মেশেন?'

'আমি কমলিকা সেনকে প্রায় চিনিই না। একবার দুবার দেখেছি। কুমুদকাকা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পরে আমার বাবা-মা ওদের বাড়িতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল। আসলে, বুড়ির মাকে আমার বাবা-মা খুব ভালবাসত। তাই কুমুদকাকার দ্বিতীয় বিয়েটা মোটেই মেনে নিতে পারেনি।' সুনন্দ জানাল।

'আমাকে অবশ্য নিয়মিত কমলিকা সেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। আমি যতদূর জানি, ভদ্রমহিলা একজন সোশালাইট। কলকাতার উঁচু মহলে বিচরণ করেন। ওঁর একটা প্যাশন আছে। হিন্দুস্তানি ক্লাসিকাল মিউজিক। উনি ওঁর বাড়িতে মাঝে মাঝেই হিন্দুস্তানি ক্লাসিকাল মিউজিকের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেন। এক সময় উনি নিজেও ভাল নাচতেন। আমাকে অনেকবার ইনভাইট করেছেন। কিন্তু আমি ও রসে বঞ্চিত। তাই কখনও যাওয়া হয়নি।'

অভীক চৌধুরি আরও অনেক কিছু বলছিল, কিন্তু আদিত্য শুনছিল না। সে ভাবছিল, কমলিকা সেন যদি তার বাড়িতে নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মজলিস অর্গানাইজ করে থাকেন তাহলে সম্ভবত অমিতাভ তাকে চিনবে। সেক্ষেত্রে অমিতাভই আদিত্যকে কমলিকা সেন অব্দি পৌঁছে দিতে পারবে।

(৩)

'আমার কফিতে একটু বেশি করে দুধ-চিনি দেবেন স্যার। কফি জিনিসটা কাঁচা-কাঁচা খেতে পারি না।' একটা মারি বিস্কুট হাতে তুলে নিয়ে বিমল বলল।

কাঁচা-কাঁচা কফি কথাটা আদিত্যর কানে লাগছিল। কাঁচা মাংস, কাঁচা মাছ, কাঁচা ফল, কাঁচা সবজি অব্দি সে মেনে নিতে পারে। কিন্তু তাই বলে কাঁচা কফি? তারপর মনে হল, কালো কফিকে তো অনেকে র কফি

বলে। বিমল কি তারই বঙ্গানুবাদ করেছে? বোধহয় না। অত ভেবেচিন্তে কথা বলার লোক বিমল নয়। সে মুখে বিমলকে জিজ্ঞেস করল, 'কচামচ চিনি দেব?'

পুজোর সময় অকালবর্ষণ ঘটিয়ে কালো মেঘগুলো আকাশ থেকে আপাতত বিদায় নিয়েছে। বৃষ্টি থেমে যাবার ঠিক পরে কয়েকদিন একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়েছিল। আদিত্যর মনে হয়েছিল শীতটাও বুঝি এবার তাড়াতাড়ি পড়ে যাবে। আদতে সেরকম কিছু ঘটল না। দুএকটা দিন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা থাকার পর সেই যে গুমোট শুরু হল, সেটা এখনও চলছে। এই নভেম্বর মাসেও এতটাই গুমোট যে বেশিক্ষণ হাঁটলে সারা গা ঘামে ভিজে যায়। জামা-টামা ঘামে ভিজে গেলে আবার কাচার ঝামেলা। শুকোতে দেবার ঝামেলা। আদিত্য খেয়াল করেনি কখন চেয়ার থেকে উঠে বিমল তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'যদি কিছু মনে না করেন চিনিটা আমি মিশিয়ে নেব স্যার?'

'নিয়ে নাও যতটা ইচ্ছে। আমি ততক্ষণ তোমার কফির জন্য দুধটা গুলে ফেলি। তবে দুধটা বেশ পুরোনো হয়ে গেছে, কেটে যেতে পারে। আমি তো কফিতে দুধ চিনি খাই না। দুধটা পড়েই রয়েছে।'

ভাগ্যক্রমে দুধটা দুধই রইল, ছানায় রূপান্তরিত হল না। তবে তাই দিয়ে যে পানীয়টা তৈরি হল সেটা এতটাই ফরসা যে তাকে কফি বলতে আদিত্য অন্তত রাজি নয়।

'তোমার বাড়ির কী অবস্থা?'

'সেই একই রকম স্যার। বউ বিছানাতেই শুয়ে। ভারী অপারেশন তো। ডাক্তার এখনও কাজ করার পারমিশান দেয়নি। মেয়ে আর আমি সংসার সামলাচ্ছি। তবে মেয়েটা এখনও বেশ দুর্বল। বেশিক্ষণ কাজ করতে পারে না। একটু কাজ করেই হাঁপিয়ে ওঠে। গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। আমিই রান্নাবান্না করছি। ডাক্তার বলেছে মেয়ে বেশি পরিশ্রম করলে আবার ঘুরে অসুখে পড়তে পারে। ওই রিল্যাপ না কী একটা যেন বলল।'

'বুঝেছি, রিল্যাপ্স। টাইফয়েড সেরে যাবার পরে ঠিকমতো বিশ্রাম আর পথ্য না হলে অসুখটা রিল্যাপ্স করতে পারে। মানে, ঘুরে আবার হতে পারে। তুমি মেয়েকে একটু সাবধানে রেখো।'

'চেষ্টা করি স্যার। আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে তার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার কতটুকুই বা ক্ষমতা?'

'তুমি কাজে বেরোও কখন? ফেরো কটায়?'

'আমার কাজটা স্যার রাত্তির আটটা থেকে সকাল আটটা। বাড়ি থেকে সন্ধে সাতটা নাগাদ বেরোলেই হয়ে যায়। সেদিক থেকে সুবিধে। সকাল নটা সাড়ে নটার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাই। ফিরে রান্নাবান্না করি। সকালটা মেয়েকেই সামলাতে হয়। মেয়ে দশটা নাগাদ ইস্কুল চলে যায়। আমি সারাদিন বউএর সঙ্গে থাকি। ছেলেটা তো বললাম স্যার একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। খাবার সময় ছাড়া বাড়িতে তাকে দেখতেই পাই না।'

'তোমার চাকরিটা ঠিকঠাক চলছে তো?'

'চাকরিটা মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট। কিন্তু মাইনেটা বড় কম। হাউসিং সোসাইটি আমার কাজ বাবদ সিকিউরিটি কম্পানিকে দেয় সাত হাজার। তার থেকে এক হাজার কেটে নিয়ে কম্পানি আমাকে দেয় ছ'হাজার। আপনিই বলুন স্যার, এই বাজারে ছ'হাজার টাকায় মাস চলে?'

আদিত্য কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'তোমাকে যদি একটা কাজ দিই, সেটা তো তোমাকে দিনের বেলায় করতে হবে। তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে তোমার বউকে দেখবে কে?'

'সেটা কোনও সমস্যা হবে না স্যার। আমি এখন বাড়ি থাকি বলে বউএর কাছে থাকি। কিন্তু ওর কাছে কাউকে থাকতেই হবে এরকম অবস্থা ওর নয়। এমনিতে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে। ডাক্তার ওকে হাঁটাচলা করতেই বলেছে। শুধু ভারী কোনও কাজ, যেমন জল তোলা বা ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা বা এমনকি রান্না করা, সেসব এখন বারণ। আমি বেরোনোর আগে ওইসব কাজগুলো সেরে বেরোতেই পারি। আর আমাদের বস্তির বউ-ঝিরাও খুব ভাল। বলে রাখলে মাঝে মাঝেই এসে আমার বউএর খবর নিয়ে যাবে।'

নিজের কফিতে একটা ছোট চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'তাহলে শোনো তোমাকে কী করতে হবে। আলিপুরে বর্ধমান রোড আছে, সেখানে গিয়ে ব্যারিস্টার কে কে সেন-এর বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। ঠিকানাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভদ্রলোকের পুরো নাম কুমুদকিশোর সেন। বেশ কয়েক বছর হল মারা গেছেন। তবে বাড়িটা এখনও রয়েছে। মস্ত বড় বাড়িটাতে কুমুদকিশোরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলিকা সেন একাই থাকেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ব্যারিস্টার সাহেব মারা যাবার বহুদিন আগেই গত হয়েছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাবার কিছুদিন পরে ব্যারিস্টার সাহেব দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পক্ষে কোনও ছেলেমেয়ে নেই।'

আদিত্য একটু থেমে কফিতে একটা চুমুক দিল। তারপর আবার শুরু করল। 'দ্বিতীয় পক্ষে ছেলেমেয়ে না থাকলেও ব্যারিস্টার সাহেবের প্রথম পক্ষে একটি মেয়ে ছিল। নাম চন্দ্রলেখা, চন্দ্রলেখা সেন। এই চন্দ্রলেখা সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাজ তাকে খুঁজে বার করা। চন্দ্রলেখা অবশ্য আলিপুরের বাড়িতে থাকত না। কিন্তু ওই বাড়ি এবং সংলগ্ন জমির অর্ধেক মালিকানা তার। বাড়ি আর লন মিলিয়ে, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, প্রায় চল্লিশ কাঠা জমি। বর্ধমান রোডের ওপরে চল্লিশ কাঠা জমির দাম কত হবে বুঝতে পারছ? তাছাড়া কুমুদ সেন ব্যাঙ্কেও বিপুল টাকা রেখে গেছে। সেটাতেও তার মেয়ে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সমান ভাগ।'

'ঠাকুরের একচোখোমিটা দেখুন স্যার,' বিমল আর না বলে পারল না, 'এই আমি, টাকার অভাবে বউ-মেয়েকে ওষুধ-পথ্য দিতে পারছি না, আর কিছু লোকের এত টাকা যে টাকা নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না।'

দৈবী অবিচার নিয়ে আদিত্যও অনেক ভেবেছে, তবে খুব পরিষ্কার কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, 'কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এইসব বড়লোকেরা কি সব সময় সুখে থাকে? হয়ত দেখবে তোমার বাড়িতে যে সুখটা আছে এদের বাড়িতে সেটা নেই।'

'সে আপনি যাই বলুন স্যার। মাঝে মাঝে ভগবানের ওপর খুব রাগ হয়। আমাদের টানাটানির সংসারেই কি যত রোগ-বালাই দিতে হবে? এই নড়বড়ে খাঁচায় আমরা আর কত নিতে পারি?'

এসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর আদিত্যর জানা নেই। সে খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'ছাড়ো ওসব কথা। কাজের কথাটা শোনো। তোমাকে কমলিকা সেন সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতে হবে। ভদ্রমহিলা কোথায় যান, কী করেন, কাদের সঙ্গে মেশেন, আমার সবটা জানা দরকার। আর শোনো, তুমি এই হাজার দশেক টাকা রাখো। তোমাকে কাজ বাবদ অগ্রিম দিলাম। বউ আর মেয়ের জন্যে একটু ফল-টল কিনো। ওষুধ কিনো। আর পারলে ওদের একটু মুরগির স্টু খাইও। মুরগির স্টুতে শরীরে বল হয়। শালার কাছে কত ধার করেছ?'

'সে অনেক টাকা স্যার। একসঙ্গে শোধ দিতে পারব না। একটু একটু করে শোধ দিতে হবে। তবে এই দশ হাজার আমার খুব কাজে লাগবে স্যার। একটু আগে যে ঠাকুরের একচোখোমির কথা বলছিলাম, সেটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। মাথার ওপর ঠাকুর আছেন। নিশ্চয় আছেন। নাহলে আপনি আজ আমাকে ডাকবেন কেন? টাকাই বা দেবেন কেন?'

বিমলের চোখদুটো কৃতজ্ঞতায় চিকচিক করছে। আদিত্য বুঝতে পারল না কৃতজ্ঞতাটা তার প্রতি না ঠাকুরের প্রতি।

বিমল চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যর মোবাইলটা বেজে উঠল। পার্থ অ্যামেরিকা থেকে ফোন করেছে। তাকে এখন অব্দি কী ঘটেছে সেটা ডিটেলে বলতে গিয়ে প্রায় মিনিট পনের লেগে গেল আদিত্যর।

(৪)

ইলিশ মাছ রান্না নিয়ে রত্নার সঙ্গে অমিতাভর চিরন্তন মতবিরোধ। এটা আসলে বাঙাল-ঘটির ঝগড়া। রত্নাদের দেশ ফরিদপুরে আর অমিতাভরা ঘোর দোখনো, অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক। রত্না মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা ও হলুদ দিয়ে কাঁচা ইলিশের যে লম্বা ঝোল হয়, যাতে কখনও-সখনও এক-আধ চিলতে বেগুন বা কাঁচা কুমড়োও চলতে পারে, সেটাই ইলিশের শ্রেষ্ঠ রান্না। এই রান্নায় মশলার আধিক্য নেই বলে এতে ইলিশের নিজের স্বাদটা বজায় থাকে। এটাই ফরাসী রান্নার দর্শন।

ফরাসীরা বলবে, যে জিনিসটা রান্না করছ, দেখো, মশলা এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে যেন তার নিজস্ব স্বাদটা ঢাকা পড়ে না যায়। রত্নারও তাই মত। রত্নার সঙ্গে রান্নার কম্পিটিশনে নামা, অমিতাভর পক্ষে কুমিরের সঙ্গে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় নামার মতো। কুমির শুধু যে তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে পারে তাই নয়, প্রতিপক্ষকে তেড়েও যেতে পারে। তেমনি রত্না ভাল রাঁধুনি তো বটেই, তার ওপর অমিতাভকে সে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখলে তেড়ে আসবে না, এমন গ্যারেন্টি নেই। অমিতাভ নিজে যে একেবারে রান্না করতে পারে না তা নয়, বস্তুত বিদেশে ছাত্র থাকার সময় সে নিজের রসনার তাগিদেই অনেক ধরনের রান্না শিখে ফেলেছিল। কিন্তু রত্না তার সেই কষ্টার্জিত জ্ঞানকে কোনওরকম গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। তাই অমিতাভর সর্বাধিক পছন্দ যে দই ও সর্ষেবাটা দিয়ে গা মাখা ইলিশ মাছের ঝাল, যেটা রান্না হবে ভাপে, তাকে রত্না মোটেই পাত্তা দিতে চায় না। তবে একটা ব্যাপারে দুজনেই একমত। দুজনেই মনে করে, ইলিশ মাছ ভাজা ও তার থেকে বেরনো তেল অতিশয় উপাদেয় এবং বাড়িতে ইলিশ এলে এটাই হওয়া উচিত স্টার্টার।

আজকাল বর্ষা ঋতুর আগমন যেমন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র পেরিয়ে আশ্বিন মাসে পুজোর সময় নাগাড়ে ধারাবর্ষণ হচ্ছে, তেমনি ইলিশেরও আবির্ভাব ঘটছে দেরিতে। এবছর পুজো অব্দি জাত ইলিশের দেখা মেলেনি। ছ-সাত ইঞ্চির খোকা ইলিশকেই নিরুপায় বাঙালি অহেতুক দাম দিয়ে ঘরে নিয়ে গেছে। অথচ কী আশ্চর্য, এখন, এই পুজো কেটে যাবার এক সপ্তাহ পরে, বাজারে হঠাৎ দেড় কেজি দুকেজির টাটকা ইলিশ দেখা যাচ্ছে। দাম একটু বেশি হলেও মধ্যবিত্তর ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে নয়।

বাঙাল রক্ত নিয়ে যাঁদের জাত্যভিমান আছে তাঁরা অবশ্য বিজয়া দশমী থেকে সরস্বতী পুজো অব্দি ইলিশ খান না। কারণ এই সময়টা ইলিশের প্রজননের সময়। প্রজননে ব্যাঘাত ঘটলে পরের বছর ইলিশের যোগানে টান পড়বে এই অভিজ্ঞান হেতু ইলিশভক্ষণে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বাঙাল দেশে বহুদিনের। তাছাড়া এই সময় ইলিশের স্বাদও নাকি তেমন ভাল হয় না। সেসব পুরোনো অভিজ্ঞান অবশ্য ক্লাইমেট চেঞ্জের ধাক্কায় ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। এখন বৃষ্টি হয়, ইলিশ ওঠে সবই বেটাইমে, তার পেছনে এল নিনো বা অন্য গূঢ়তর কোনও প্রাকৃতিক চক্রান্ত থাকতেও পারে, কিন্তু সেসব না ভেবে অমিতাভ গড়িয়াহাট বাজার থেকে দুকেজি সাইজের দুটি ইলিশ কিনে এনেছে। অমিতাভর একটা সুবিধে, বাঙাল রক্ত নিয়ে তার জাত্যভিমানের ঝামেলা নেই। কিন্তু আসল ভরসার কথা হল, অসময়ের ইলিশ দেখে রত্না ভুরু কোঁচকায়নি, বরং খুশিই হয়েছে।

এসব শুক্রবারের কথা। আজ রবিবার। অমিতাভ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে টাটকা ইলিশ অনেক দিন ধরে ফ্রিজে রেখে বাসি করে খাওয়া আর দেবস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা একই মাত্রার পাপ। তাই সে আজ মধ্যাহ্নভোজনে দুতিনজন নিকট বন্ধুবান্ধবকে ইলিশের নেমন্তন্ন করেছে। উদ্দেশ্য, সকলে মিলে ঈশ্বরের এই দান উপভোগ করবে। রত্নার সঙ্গে তার একটা রফা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, রত্না যেমন কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ইলিশের লম্বা ঝোল রাঁধবে, তেমনি অমিতাভও ভাপা ইলিশ রান্না করার সুযোগ পাবে। এছাড়াও রান্নার মাসি রত্নার তত্ত্বাবধানে রত্নার সিগনেচার আইটেম খাসির মাংসের দোপেঁয়াজা রাঁধছে।

এসব দরকারি কথা আদিত্য কিছুটা আগেই জানত এবং কিছুটা অমিতাভ ফোন করে জানিয়েছে। তার সঙ্গে বলেছে, 'একটায় লাঞ্চ, কিন্তু এগারোটার মধ্যে চলে আয়। নানারকম বিলাওল শুনব বলে বেছে রেখেছি। আলাইয়া, দেবগিরি, ইমনি, ককুভ।'

সাড়ে এগারোটায় রত্নাদের বাড়ি পৌঁছে আদিত্য দেখল সে-ই প্রথম, অন্য অতিথিদের কেউই তখনও আসেনি। কাজের মেয়েটা দরজা খুলে দিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। সারা বাড়ি ইলিশের গন্ধে ম ম করছে। রান্নাঘরে ঢুকে আদিত্য দেখল রত্না খুব মন দিয়ে রান্নার মাসিকে কী যেন বোঝাচ্ছে। আদিত্যকে দেখে রত্না বলল, 'অমিতাভ স্নান করতে গেছে। যতক্ষণ না বেরোচ্ছে ততক্ষণ তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের মরাল সাপোর্ট দিতে পারিস, কিংবা বসার ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডায় বসতে পারিস।'

'আমি বসার ঘরে গিয়েই বসছি। টুবলু কোথায় রে?'

'টুবলু তো অঙ্ক কোচিং-এ গেছে। শেষ পর্যন্ত একটা কোচিং-এ দিতেই হল। অঙ্কটা আমাদের দুজনের কেউই পারি না। একেবারেই পারি না। নাহলে এই ক্লাশ ফাইভে কোচিং-এ দিতে হয়? যাক গে। তুই গিয়ে বোস, অমিতাভ এক্ষুনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়বে।'

দুমিনিটও হয়নি আদিত্য বসার ঘরে গিয়ে বসেছে রত্না হাতে একটা রুম ফ্রেশনার নিয়ে হাজির। বলল, 'বাড়িময় বিচ্ছিরি মেছো গন্ধ হয়ে গেছে। ইলিশ মাছ রান্না করার এই সমস্যা।'

রত্না সিলিং-এর দিকে তাক করে খানিক রুম ফ্রেশনার স্প্রে করে দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। সম্ভবত সেসব ঘরেও সুগন্ধ ছড়ানো হবে। বিন্দু বিন্দু সুগন্ধ বৃষ্টির ধারার মতো ওপর থেকে ঝরে পড়ছে। সেই রাশি রাশি সুগন্ধের মধ্যে বসে আদিত্য টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা ইতিহাসের জার্নাল তুলে নিয়ে আনাড়ির মতো পাতা ওল্টাচ্ছে এমন সময় অমিতাভর গলা শোনা গেল, 'কী রে কখন এলি?'

'আমাকে এগারোটায় আসতে বলে কোন আক্কেলে নিজে চান করতে ঢুকে গেলি?'

'আরে এগারোটায় আসতে বললে তুই বারোটায় আসবি এটা ধরে নিয়ে চানে ঢুকেছিলাম। দ্যাখ, বারোটা বাজতে এখনও দেরি আছে। আমি কী করে জানব তুই এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবি?'

'এ-ব্যাপারে আমার দোষ নেই।' আদিত্য স্বীকারোক্তির ভঙ্গীতে বলল। 'আমিই বা কী করব যদি আজ মেট্রোতে কেউ আত্মহত্যা না করে? মেট্রোর দরজাগুলো সব ঠিকঠাক বন্ধ হয়? আমি যে গাড়িটাতে আসছি সেটার আগের গাড়িটা খারাপ হয়ে সামনের কোনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে না থাকে?'

'যাক গে, দুঃখ করিস না। এরকম অঘটন মাঝে মাঝে ঘটে যায়। তোর তো কোনও দোষ নেই। তুই বরং বসে বসে নিভৃতিবুয়ার এই ককুভ বিলাওলটা শোন। আমি ততক্ষণে চুলটা আঁচড়ে আসি।'

অমিতাভ ওর ল্যাপটপে গানটা চালিয়ে দিতেই বসার ঘরের দুটো বড় স্পিকারে গমগম করে উঠল নিভৃতিবুয়ার গলা। ওয়াই ফাই-এর কী মহিমা!

সাড়ে বারোটার মধ্যে অন্য অতিথিরাও এসে গেল। অবশ্য সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয়। মাত্র তিনজন। একটি দম্পতি, শৌভিক রায় আর চিত্রা গুহ, দুজনেই আদিত্যর চেনা, কলেজে আদিত্যদের তিন ক্লাশ নিচে পড়ত। দুজনেই এখন নামকরা ঐতিহাসিক। অমিতাভর মতে চমৎকার রিসার্চ করছে। আর একজন প্রবাসী বাঙালি, নাম শেখর সেনগুপ্ত, তিনিও ঐতিহাসিক, দিল্লিতে পড়ান, অমিতাভর বিদেশের বন্ধু, কয়েক সপ্তাহের জন্য অমিতাভদের ইন্সটিটিউট ভিজিট করতে এসেছেন, তবে সস্ত্রীক আসেননি। অমিতাভ আদিত্যকে আগেই জানিয়েছিল যে ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যাপারে এদের সকলেরই প্রবল উৎসাহ আছে। তাই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। তবু এত পণ্ডিতদের ভীড়ে আদিত্য একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। ভাগ্যিস অমিতাভর ল্যাপটপে তখন বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের আলাইয়া বিলায়ল বাজছিল, নাহলে আদিত্যকে স্রেফ চুপচাপ বসে পণ্ডিতদের পণ্ডিতি শুনতে হত। আদিত্যর ভাগ্য ভালো, অচিরেই আলোচনাটা বাঙালির মিউজিকাল ট্যালেন্টের দিকে ঘুরে গেল।

বুধাদিত্যর বাজনা শুনতে শুনতে শেখর বলল, 'যাই বল অমিতাভ, আজকাল গান-বাজনায় কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের দেখতেই পাই না। এই বুধাদিত্য মুখার্জীও তো ভিলাইতে বড় হয়েছেন।'

'আসলে ধ্রুপদী সঙ্গীতের জন্য পেট্রন দরকার। আগে রাজা-রাজড়া-জমিদাররা ছিল। এখন তাদের জায়গায় কর্পোরেটরা এসেছে। কলকাতায় কর্পোরেট কম, তাই স্পনসর, পেট্রন সবই কম।' অমিতাভ তার মতামত জানাল।

'আমি কিন্তু পেট্রন নয়, ট্যালেন্টের কথা বলছি। পরিশ্রমী মিউজিশিয়ানদের কথা বলছি। এখানে কোথায় তারা?'

'আছে, ট্যালেন্ট আছে। কিন্তু উপযুক্ত পেট্রনেজের অভাবে তারা হারিয়ে যাচ্ছে।' অমিতাভ তার জায়গা থেকে নড়বে না।

'অমিতাভদার পেট্রনেজে কিন্তু একজন বাঙালি গায়ক বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। নন্দন চক্রবর্তীর গান শুনেছেন?' এবার চিত্রার গলা।

'অবশ্যই শুনেছি। সিমপ্লি সুপার্ব। কিন্তু সেও তো তালিম পেয়েছে দিল্লিতে।' শেখরও ছাড়ার লোক নয়।

যুদ্ধ অবসানের কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে আদিত্য বলে উঠল, 'আচ্ছা, শুনেছি আজকাল আলিপুরে কমলিকা সেনের বাড়িতে অনেক ইয়াং ট্যালেন্ট পারফর্ম করছে। অনেকেই বলছে, শি ইজ ডুয়িং আ গুড জব অফ প্রোমোটিং ইয়াং ট্যালেন্টস।'

'আমি ওঁর বাড়িতে কয়েকটা প্রোগ্রাম শুনেছি। মন্দ নয়। তবে আমার মনে হয়েছে ইয়াংদের প্রোমোট করার থেকেও শি ইজ মোর ইনটারেস্টেড ইন প্রোমোটিং হারসেলফ। ওই এক-একজনের লাইমলাইটে আসার একটা অ্যামবিশন থাকে না?' কমলিকা সেনকে বেশি নম্বর দিতে অমিতাভ রাজি নয়।

'এরকম কেন বলছ অমিতাভদা?' শৌভিক বলল, 'চিত্রা আর আমি অনেকদিন ধরে ওঁকে চিনি। গান-বাজনার ব্যাপারে ওঁর ডেডিকেশনটা কিন্তু জেনুইন। তাই না চিত্রা?'

'আমার তো তাই মনে হয়।' চিত্রা বলল।

'আমি দিল্লি সার্কেলেও কমলিকা সেনের নাম শুনেছি। সবাই বলে ভাল অরগানাইজার।' এবার শেখরের গলা।

'হয়ত আমারই ভুল হয়েছে। তোমরা সবাই একসঙ্গে নিশ্চয় ভুল বলবে না। সামনের সপ্তাহে কমলিকা সেনের বাড়িতে একটা প্রোগ্রাম আছে। উনি ফোন করেছিলেন। যাব তাহলে। তোরা যাচ্ছিস?' অমিতাভর শেষের প্রশ্নটা শৌভিক-চিত্রাকে।

'আমরা তো অবশ্যই যেতাম। সাধারণত আমরা ওঁর বাড়ির প্রোগ্রাম খুব একটা মিস করি না। কিন্তু ওই সময় আমরা কলকাতায় থাকছি না।' চিত্রা জানাল।

'লাঞ্চ রেডি। খেতে চল সকলে।' রত্না কখন ঘরে ঢুকেছে কেউ টের পায়নি।

গুরুভোজন হল। হওয়ারই কথা ছিল। রত্নার কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ইলিশের লম্বা ঝোল আর অমিতাভর ভাপে ইলিশ দুটোই লেটার নম্বর পেয়ে পাশ করে গেছে। বলা যায় খেলা ড্র। খাবার পর টানা পাঁচটা অব্দি আড্ডা চলল। পণ্ডিতি নয়, স্রেফ আড্ডা। গান-বাজনা থেকে পলিটিক্স, দেশের ভবিষ্যৎ, শিক্ষার ভবিষ্যৎ, ইলিশের ভবিষ্যৎ, চেনা দুএকজনের সম্বন্ধে হাল্কা কেচ্ছা, সাহিত্য, আবার গান-বাজনা।

পাঁচটার সময় শেখর বলল, 'আমাকে এবার উঠতে হবে। কাছেই একডালিয়া রোডে আমার কাকা-কাকিমা থাকেন। এতদূর যখন এলাম একবার দেখা করে যাব।'

'আমরাও উঠব অমিতাভদা। আর এন টেগোরে এক বন্ধুকে দেখতে যাব। বন্ধুর বাইপাস সার্জারি হয়েছে। ভাবো, চল্লিশ বছর বয়েস, এর মধ্যেই আর্টারি ব্লক। খুব সিগারেট খেত অবশ্য।'

আদিত্যর কেমন যেন মনে হল শৌভিক শেষ কথাগুলো তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। এই মজলিসে সে-ই একমাত্র সিগারেটখোর। রত্নার বকাবকি সত্ত্বেও সে কয়েকবার বারান্দায় গিয়ে ধূমপান করে এসেছে।

অন্য অতিথিরা চলে যাবার পর আদিত্য অমিতাভকে বলল, শোন, সামনের সপ্তাহে কমলিকা সেনের বাড়িতে তুই যদি গান শুনতে যাস আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবি?'

'নিশ্চয় পারব। কিন্তু হঠাৎ ইয়াং ট্যালেন্টদের ব্যাপারে তোর এত উৎসাহ হল কেন? আগে তো কখনও এরকম উৎসাহ দেখিনি।'

'ইয়াং ট্যালেন্টদের ব্যাপারে আমার কোনও উৎসাহ নেই। আগেও ছিল না, এখনও নেই। আমার উৎসাহ কমলিকা সেনের ব্যাপারে। কারণটা বললেই বুঝতে পারবি। কমলিকা সেন চন্দ্রলেখা সেনের সৎমা, যে চন্দ্রলেখা সেনকে খুঁজে বার করার জন্য আমাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। কমলিকা সেনকে দেখতে চাই, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। পরশু আমি দুতিন দিনের জন্য পুরুলিয়া যাচ্ছি। প্রোগ্রামটা কবে?'

'আজ তো একটা রবিবার, প্রোগ্রামটা আগামী শনিবার সন্ধেবেলা।'

'আমি শুক্রবারের মধ্যে ফিরে আসছি। ফিরে এসে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট বলছে, কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাবার অনেক উপায়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বেশিরভাগ অপশানগুলোই ভাল নয়। যেমন রূপসী বাংলা ছাড়ে ভোর ছটা পঁচিশে। অত তাড়াতাড়ি আদিত্যর পক্ষে ঘুম থেকে উঠে, তৈরি হয়ে স্টেশনে পৌঁছনো অসম্ভব। লালমাটি ছাড়ে আর একটু পরে, বেলা সাড়ে আটটায়, কিন্তু সেটাও আদিত্যর পক্ষে বড্ড সকাল। কয়েকটা ট্রেন আবার হাওড়া থেকে ছাড়েই না, ছাড়ে সাঁতরাগাছি বা শালিমার থেকে। সেসব জায়গায় কী করে পৌঁছতে হয়, আদিত্যর কোনও ধারণাই নেই। তাছাড়া তার নান্দনিক চেতনা বলে কলকাতা থেকে ট্রেনে করে কোথাও যেতে হলে হাওড়া বা শেয়ালদা থেকে রওনা হওয়াই শ্রেয়। কলকাতা-রাঁচি ইন্টারসিটি বলে একটা ট্রেন পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু একটু খেয়াল করতে চোখে পড়ল ট্রেনটা পুরুলিয়া যায় না, পুরুলিয়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই ট্রেনে পুরুলিয়া যেতে গেলে আদ্রা জংশনে নেমে বাস বা অন্য কিছু ধরে পুরুলিয়া পৌঁছতে হবে। কে যাবে অত ঝামেলায়?

অনেক খোঁজাখুঁজি করে আদিত্যর মনে হল হাওড়া-পুরুলিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসটাই তার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধেজনক গাড়ি। এটা হাওড়া থেকে ছাড়ে বিকেল চারটে পঞ্চাশে, পুরুলিয়া পৌঁছয় রাত্তির সাড়ে দশটা নাগাদ। একটা অজানা শহরে পৌঁছনোর পক্ষে রাত্তির সাড়ে দশটাটা অবশ্য মোটেই ভাল সময় নয়। বিশেষ করে ট্রেন যদি লেট থাকে। কিন্তু ভারতীয় রেল জানাচ্ছে, এই ট্রেনটা সাধারণত খুব একটা লেট করে না। তাছাড়া যে হোটেলটাতে আদিত্য নিজের থাকার ব্যবস্থা করেছে তাদের পিক-আপ, ড্রপ-ডাউন দুটো সারভিসই আছে। তারাই স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে আদিত্যকে তুলে নেবে। আবার ফেরার সময় স্টেশনে পৌঁছেও দেবে। তাই বেশি রাত্তিরে পৌঁছনো নিয়ে আদিত্য ততটা ভাবছে না।

ডেবিট কার্ড দিয়ে হোটেলের ঘর আগেই বুক করে রেখেছিল। এবার রেলের ওয়েবসাইট থেকে আদিত্য যাতায়াতের টিকিটও কেটে নিল। এসি চেয়ার। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বসে বসে কাটাতে হবে। সঙ্গে কোনও ইন্টারেস্টিং বই নিলে হয়। তাহলে সময়টা তাড়াতাড়ি কাটবে। অনেক ভেবেচিন্তে ফেরার টিকিটটাও ওই একই ট্রেনে কাটল। শুক্রবার খুব ভোরে ফেরা। আশা করা যায়, হোটেলের গাড়ি স্টেশনে পৌঁছে দেবে। সত্যি কথাটা হল, যেহেতু কলকাতা ছেড়ে আদিত্যর খুব একটা বেরোনো হয় না, তাই কোথাও যেতে হলে তার ভীষণ নার্ভাস লাগে। ভ্রমণে যাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই আদিত্য তাদের শ্রদ্ধা করে।

আদিত্য ভেবে দেখল, মঙ্গলবার আর শুক্রবার যাতায়াতেই কেটে যাবে। তাহলে মাত্র দুটো দিন হাতে রইল। তার মধ্যে একদিন চন্দ্রার পুরোনো ইস্কুলে যেতে হবে। হয়ত সারাদিনটাই ওখানে কেটে যাবে। কী যেন নাম ইস্কুলটার? মনে পড়েছে। নীপবীথি। সমাদ্দার বলেছিল, যে এন জি ও ইস্কুলটা চালায় রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় তাদের আরও ইস্কুল আছে। চন্দ্রার বসিরহাটের ইস্কুলটার নাম বনবীথি। নাম শুনে মনে হয় ওই একই এন জি ও-র ইস্কুল। চন্দ্রা তাহলে এক ইস্কুল থেকে আর একটা ইস্কুলে বদলি নিয়েছিল।

আদিত্য মোবাইলে সমাদ্দারের নম্বরটা ডায়াল করল।

'গুড মর্নিং স্যার।' সমাদ্দারের গলায় একটা উষ্ণতা আদিত্য বরাবরই টের পেয়েছে।

'আপনাকে আর একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি?'

'নিশ্চয় স্যার। বলুন, আপনার জন্য আর কী করতে পারি?'

'আমি আগামী কাল পুরুলিয়া যাচ্ছি। দুদিন থেকে একটু ঘুরে ফিরে দেখব। যদি কিছু বার করতে পারি। ওই অঞ্চলে আপনার চেনা কোনও পুলিশ অফিসার আছেন যাঁর কাছে দরকার পড়লে যেতে পারব?'

সমাদ্দার কিছুক্ষণ ভাবল। 'আপনি তো আগেই বলেছিলেন পুরুলিয়া গিয়ে আমাদের ইনফর্মারদের সঙ্গে কথা বলতে চান। একটা সমস্যা হল, পুরুলিয়া শহরে পুলিশের পুরোনো লোকেরা আর কেউ নেই স্যার। তবে আদ্রায় আছে। আদ্রা পুলিশ স্টেশনের ওসি আমার বিশেষ চেনা। ওই স্পেশাল অপরেশনের সময় আমাদের টিমে ছিল। আমি ওকে ফোন করে দেব। ওর নামও সঞ্জয়। আমি সঞ্জয় সমাদ্দার আর ও সঞ্জয় বারিক। খুব ভাল ছেলে। আমি ওকে ফোন করে দিচ্ছি। আর ওর ফোন নম্বরটাও আপনাকে মেসেজ করে দিচ্ছি। ওই আপনাকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ বলবেন না স্যার, এটা তো আমার ডিউটি।'

ফের কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে। আদিত্য কয়েক পা হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুলল। নূপুর মণ্ডল।

'তোমার মেসেজ পেয়ে ছুটে এলাম আদিত্যদা। বল কী বলবে। আমাকে আবার দেড়টার মধ্যে পার্ক সার্কাস ফিরতে হবে। চার নম্বর পুলের সামনে থেকে আমাকে অফিসের গাড়িটা দেড়টায় পিক আপ করে।'

'বোসো, বোসো। হাঁপাচ্ছ দেখছি। এখন তো সবে সাড়ে এগারোটা। দেড়টা বাজতে দেরি আছে। একটু কফি খাও। তারপর সব বলছি।'

আদিত্য কফির জল বসাতে বসাতে একবার পেছন ফিরে নূপুরের দিকে তাকাল। এইভাবে আগে কখনও তাকায়নি। মেয়েটা কি একটু রোগা হয়ে গেছে? হতেও পারে। চাকরি নিয়ে টেনশনে আছে। একটা কালো টি শার্ট আর জিনস পরেছে নূপুর। বয় কাট চুল। বড় বড় চোখ। নাকটা ভোঁতাই বলতে হবে। চোখের নিচে সামান্য কালি জমেছে।

'অমনভাবে কী দেখছ আদিত্যদা? কিছু হয়েছে নাকি?' নূপুরের গলাটা উদ্বিগ্ন শোনাল।

'দেখছি তোমাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়।'

'বিশ্বাস!' নূপুর কি একটু চমকে উঠল? নাকি আদিত্যর মনের ভুল।

আদিত্য দুকাপ কফি নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। বলল, 'বিস্কুট খাবে?'

'না, না। জাস্ট কফি। তুমি তাড়াতাড়ি বল। অফিসের গাড়িটা মিস করলে খুব মুস্কিলে পড়ে যাব।'

'তোমার তো সামনের সপ্তাহ থেকে চাকরি নেই।'

'তোমাকে তাই বলেছিলাম। তখন তাই জানতাম। এখন বস বলছে চাইলে এই মাসটা কাজ করতে পারি। আসলে বাইরে থেকে একটা কাজ এসে গেছে। আমি ছেড়ে দিলে কাজটা ডেলিভার করা যাবে না। তাই এত দয়া। আমি পারলে এক্ষুনি ছেড়ে দিতাম। কিন্তু হাতে আর কিছু তো নেই।' নূপুর মাথা নিচু করে নিজের আঙুলগুলো নিয়ে খেলছে।

'সেদিন তুমি আমার কাছে কাজ চেয়েছিলে। বলেছিলে, আমার ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ করতে চাও। এখনও কি সে রকম ইচ্ছে আছে?' আদিত্য আস্তে আস্তে বলল।

'তুমি কি সত্যিই আমায় কাজ দেবে?' নূপুরের মুখটা হঠাৎ ঝলমল করছে।

'একটা কাজ আমি তোমাকে দিতে পারি। তবে মাত্র একমাসের জন্য।'

'আমি একমাসের কাজ পেলেও নিতে রাজি আছি। এই লোকটাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একমাসের মধ্যে অন্য কাজ দেখে নেব। এই অন্য কাজ দেখে নেবার ব্যাপারটা তো আমাকে ইন এনি কেস করতেই হবে। বদমায়েসটা তো আমাকে একমাসের বেশি রাখবে না। তাই তোমার কাজটা নিলে আমার তো বাড়তি কোনও ক্ষতি নেই।'

আদিত্য দেখল এই সঙ্কটের মুহূর্তেও নূপুরের মাথা পরিষ্কার কাজ করছে। মনে মনে সে নূপুরের তারিফ না করে পারল না। মুখে বলল, 'এখন তুমি মাসে কত টাকা পাচ্ছ?'

'পঁচিশ হাজার দিচ্ছে আদিত্যদা। তবে তুমি যদি দু-চার হাজার কম দাও তাও আমি তোমার চাকরি করতে রাজি আছি। ওই লোকটার কম্পানিতে কাজ করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'আমি তোমাকে চল্লিশ হাজার দেব। কারণ আমার কাজটাতে ঝুঁকি আছে। টাকাটা অবশ্য আমি দিচ্ছি না, আমার ক্লায়েন্ট দিচ্ছে। সে ওই চল্লিশ হাজারই দেবে। তুমি ঝুঁকির কাজ করতে রাজি তো?'

'কী রকম ঝুঁকি? আমাকে কী করতে হবে খুলে বললে ভাল হতো।'

'একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে। হয়ত কেউ তাকে কিডন্যাপ করেছে। কিংবা হয়ত সে নিজেই লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে হবে। মেয়েটি বসিরহাটে একটা ইস্কুলে পড়াত। তোমাকে সেখানে যেতে হবে। অন্য কোনও আইডেন্টিটিতে। গিয়ে ওখানকার পরিবেশটা বুঝতে হবে। এবং আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। তুমি একটা কাজ করতে পার। ওই ইস্কুলে গিয়ে বলতে পার, তুমি শুনেছ ওখানে একটা চাকরি খালি আছে। যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় শুনেছ, বোলো, এটা তো সকলেই জানে এখানকার একজন দিদিমনি কাউকে না বলে চলে গেছে। আমি সেই দিদিমনির কাজটা চাইছি। যতদিন না ওই দিদিমনি ফিরে আসে, অন্তত ততদিন আমাকে কাজটা করতে দেওয়া হোক। আমার ধারণা কাজটা তুমি পেয়ে যাবে।'

'এতে আর ঝুঁকি কী আছে?'

'ঝুঁকি আছে। প্রাণের ঝুঁকি। যদি কেউ ওই দিদিমনিকে সরিয়ে দিয়ে থাকে সে তোমার আসল পরিচয় জানতে পারলে তোমাকেও রেয়াত করবে না। পুরো গল্পটা বললে তুমি আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। কিন্তু পুরো গল্পটা শোনার আগে আমাকে বলতে হবে তুমি কাজটা করতে রাজি আছ কিনা।'

'অবশ্যই রাজি আছি। কাজটা আমার বেশ এক্সাইটিং লাগছে। অন্তত বারো ঘন্টা বসে বসে কম্পিউটারে কাট-পেস্ট করার থেকে হাজার গুণে ভাল। তাছাড়া আমার টাকা-পয়সার এখন যা অবস্থা, চল্লিশ হাজার টাকা পেলে আমি রাস্তা ঝাঁট দিতেও রাজি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুমি নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছ কেন?'

'দুটো কারণে। এক, ওখানকার লোকে জানে আমি একজন গোয়েন্দা। আমি ওই দিদিমনির ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছি। তাই ওখানে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লোকে আমাকে চিনে ফেলবে। দুই, ওই হারিয়ে যাওয়া দিদিমনি, যার নাম চন্দ্রলেখা সেন, এর আগে পুরুলিয়ার একটা ইস্কুলে পড়াতেন। আমি এখন সেখানে যাচ্ছি। হয়ত সেখানেও কোনও লিড পেতে পারি। একসঙ্গে তো আর দুটো জায়গায় যাওয়া যায় না।'

'বুঝেছি। আমি বসিরহাট যাব। তুমি আমাকে পুরো গল্পটা বল।'

'বলছি। তার আগে বলি, তুমি যে আমার হয়ে কাজ করছ সেটা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না, বুঝেছ? কেউ না মানে একেবারে কেউ না।'

'বুঝেছি।' নূপুর মণ্ডলের চোখ দুটো হাসছে।

(২)

শেষ কবে ট্রেনে চেপে কলকাতার বাইরে গিয়েছিল আদিত্যর মনেই পড়ে না। খুব ছোটবেলায় ছুটি পড়লেই বাবার সঙ্গে মধুপুর যাওয়া হতো। প্রত্যেক ছুটিতে একই জায়গা। মধুপুর। মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ি ছিল তাদের। ট্রেনের গোটা একটা কামরা রিজার্ভ করে যাওয়া হতো। শুধু বাবা আর আদিত্য সেই রিজার্ভ কামরায়। বাকি লোকজন, ঠাকুর-চাকর-খানসামা, ট্রেনের অন্য কোথাও। বাংলার সীমানা পেরোলেই মাটি ঢেউএর মত ফুলে ফেঁপে উঠে ছোট ছোট পাহাড় হয়ে যেত। ট্রেনের জানলা দিয়ে সেসব পাহাড় দেখতে খুব ভাল লাগত আদিত্যর।

আরও ছোটবেলায় একবার পুরী যাওয়া হয়েছিল। মা তখন বেঁচে। পুরীর স্মৃতি আদিত্যর প্রায় নেই বললেই চলে। সমুদ্রটাও মনে নেই। শুধু মনে আছে, পুরীতে তারা যে বাড়িটায় থাকত তার সদর দরজাটা

ছিল পেল্লায়, সবুজ রঙের। এইমাত্র কিছুদিন আগে একটা কাজে মুম্বই গিয়ে আদিত্য ভাল করে সমুদ্র দেখেছে।

মধুপুরের বাড়িটা যে বছর বিক্রি হয়ে গেল, সে বছর আদিত্য ক্লাশ ফোর-এ উঠেছে। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথাও যাওয়া হল না। পাছে তার মন খারাপ হয় তাই বাবা তাকে চিড়িয়াখানা আর বোটানিকাল গার্ডেন বেড়াতে নিয়ে গেল। মাঝে মাঝেই ক্লাবে ডিনার খাওয়াল। কিন্তু সেই পাহাড়গুলোর কথা ভেবে আদিত্যর মন খারাপ আর কাটতেই চাইত না।

পুরুলিয়াগামী ট্রেনের জানলায় বসে আদিত্যর এইসব পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বাইরে কার্তিকের ধান কেটে নেওয়া মাঠ ধু ধু করছে। দ্রুত পড়ে আসছে হেমন্তের রোদ্দুর। এতদিন পরে ট্রেনে উঠেছে বলেই হোক কিংবা তার মাথার মধ্যে তখন জীবনানন্দ-সুধীন দত্তের কিছু লাইন টগবগ করে ফুটছিল বলেই হোক, আদিত্যর খুব ভাল লাগছিল, বলা যায়, ভীষণই ভাল লাগছিল। সেই ভাল লাগাটা রূপান্তরিত হচ্ছিল ধূমপানের ইচ্ছায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আজকাল ট্রেনে ধূমপান একেবারে নিষেধ, এমনকি এসি কোচ থেকে বেরিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচারটে সুখটানও চলবে না। অতএব দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে আদিত্য খড়গপুর আসার আগেই দুবার চা খেয়েছে, একবার কফি।

এক একটা রো-তে তিনটে করে সিট, তারপর প্যাসেজ, আবার তিনটে সিট। আদিত্য সিট পেয়েছে জানলার ধারে, তার পাশের দুটো সিট এতক্ষণ ফাঁকা যাচ্ছিল। বস্তুত, কামরার অনেক সিটই ফাঁকা যাচ্ছিল। খড়গপুর পৌঁছে কামরায় অনেক লোক উঠল, অনেক সিট ভর্তি হয়ে গেল। কিছু সিট ফাঁকাও রয়েছে, তার মধ্যে আদিত্যর পাশের দুটো সিটও ফাঁকা। আদিত্য ভাবছিল আহা, সিট দুটো যেন এমনই ফাঁকা থাকে।

ছিলও ফাঁকা পড়ে অনেকক্ষণ। তারপর ট্রেন যখন খড়গপুর স্টেশন ছাড়ব ছাড়ব করছে ঠিক তখন টিকিট চেকারের সঙ্গে একটি বছর তিরিশ-বত্রিশের যুবতী হাঁপাতে হাঁপাতে আদিত্যর পাশে প্যাসেজের দিকের ফাঁকা সিটটাতে এসে বসল। চেকার সাহেব তার হাতের লম্বা রিজারভেশন লিস্টটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না। এটাতে নয়। আপনি মাঝের সিটটায় বসুন। ধারেরটায় মেদিনীপুর থেকে লোক উঠবে।'

চেকার সাহেব আদিত্যর টিকিটটা চেক করে তার হাতের কাগজে একটা টিক মেরে অন্য দিকে চলে গেলেন। যুবতী তার হাতের ব্যাগটা ওপরে মাল রাখার জায়গায় তুলে দেবার চেষ্টা করে কয়েক বার ব্যর্থ হল। আদিত্য তাকে লক্ষ করছিল, এবার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমাকে দিন, আমি তুলে দিচ্ছি।'

ব্যাগটা বেশ ভারি, সেটা ওপরে তুলতে গিয়ে আদিত্যকেও খানিকটা কসরত করতে হল। ব্যাগের ভেতরে থান ইঁট-টিট আছে নাকি? মেয়েটি আদিত্যর মনের ভাব বুঝতে পেরে খানিকটা কিন্তু কিন্তু গলায় বলল, 'ব্যাগে পরীক্ষার খাতা আছে, তাই একটু ভারি।'

আদিত্য ভদ্রতা দেখিয়ে বলল, 'না, না তেমন কিছু ভারি নয়। তবে একা আপনার পক্ষে হয়ত নামাতে অসুবিধে হবে। আমি তো সেই পুরুলিয়া অব্দি যাচ্ছি। নামাবার সময় আমাকে বলবেন।'

'আমিও পুরুলিয়া অব্দি যাব। আপনি কি পুরুলিয়াতেই থাকেন?'

'না, না। আমি কলকাতায় থাকি। পুরুলিয়ায় কাজে যাচ্ছি। দুতিন দিন থাকব। আপনি পুরুলিয়ায় থাকেন?'

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি উত্তর না দিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। যেন কাউকে খুঁজছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে মধ্য তিরিশের একটি ছিপছিপে চেহারার চাপ দাড়িওলা যুবক হাত নাড়ছে। মেয়েটিও তাকে দেখে বিষন্নভাবে হাত নাড়ল। ট্রেন এখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আদিত্যর মনে পড়ে গেল খড়গপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নাকি পৃথিবীর দীর্ঘতম। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। জানলা দিয়ে অনেক দূরে জ্বলতে থাকা দুএকটা মিটিমিটি আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আদিত্য জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে হাতের বইটাতে চোখ রাখল।

'জিজ্ঞেস করছিলেন না আমি পুরুলিয়ায় থাকি কিনা।' মেয়েটি আবার কথা বলতে শুরু করেছে। 'ওই যে জানলা দিয়ে যাকে হাত নাড়লাম, ও আমার স্বামী। খড়গপুরে থাকে, আই আই টি-তে পড়ায়। আমার পাকাপাকি সংসার আই আই টি ক্যাম্পাসে। কিন্তু চাকরি সূত্রে পুরুলিয়ায় থাকতে হয়।'

'আপনিও নিশ্চয় কোথাও পড়ান? সঙ্গে পরীক্ষার খাতা রয়েছে যখন।' মেয়েটিকে আদিত্যর ইন্টারেস্টিং লাগছে।

'হ্যাঁ, আমিও পড়াই। রঘুনাথপুর কলেজে অঙ্ক পড়াই। অর্ণব, মানে আমার স্বামী, আই আই টি-তে ওই অঙ্কই পড়ায়।'

আদিত্য ভাবল বলে সে-ও এক সময় অঙ্ক পড়ত। কিন্তু বলার মতো কোনও লেখাপড়া তো সে করেনি। তাই সে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি কলকাতার?'

'আমরা দুজনেই কলকাতার। আমি বড় হয়েছি উত্তর কলকাতায়। সুকিয়া স্ট্রিটে আমাদের বাড়ি। আমার স্বামীদের বাড়ি যাদবপুর। আমরা দুজনেই প্রেসিডেন্সিতে অঙ্ক পড়তাম। তবে অর্ণব আমার থেকে দুবছরের সিনিয়ার ছিল।'

'কলকাতা খুব মিস করেন?'

'সত্যি বলতে কি আজকাল আর করি না। বরং কলকাতায় গেলে কদিনেই হাঁপিয়ে উঠি।'

আদিত্য হাতের বইটা বন্ধ করে রাখল। সামনে একটা বড় দল দুতিনটে রো জুড়ে বসে হুল্লোড় করছে। মশলামুড়িওলা তার বেসাতি নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে কামরার এমাথা থেকে ওমাথা অব্দি চলে গেল। বোধহয় কেউ মশলামুড়ি কিনবে। আদিত্য টের পেল তার পেছনে দাঁড়িয়ে মুড়িওলা টিনের মধ্যে মশলামুড়ি মাখছে। মেয়েটি আবার কথা বলতে শুরু করেছে।

'বলুন, এই বাজারে কি চাকরি ছাড়া যায়? তাই কষ্ট হলেও চাকরিটা চালিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া আমাদের প্রফেশনে এখনও বেশ ছুটি-ছাটা আছে।'

'আপনি পুরুলিয়ায় থাকেন কিন্তু রঘুনাথপুরে পড়ান?'

'হ্যাঁ। একটু ট্র্যাভেল করতে হয়। কী করব? রঘুনাথপুরে ভাল থাকার জায়গা পাওয়া শক্ত। তাছাড়া শহরের অন্যান্য ফেসিলিটিও তেমন নেই। সব থেকে বড় কথা, পুরুলিয়া থেকে যেমন খড়গপুর যাবার অনেক ট্রেন, বহির্জগতের সঙ্গে রঘুনাথপুরের কানেক্টিভিটি তেমনি খারাপ।'

'আপনি কোন সালে প্রেসিডেন্সি থেকে পাশ করেছেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি পাশ করেছি দুহাজার দশে। অর্ণব আরও দুবছর আগে। কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো?'

'কৌতুহল বলতে পারেন। আসলে আমিও প্রেসিডেন্সি থেকে ওই অঙ্ক নিয়েই পাশ করেছিলাম। তবে আপনার ষোলো বছর আগে।

'আপনিও প্রেসিডেন্সি এবং অঙ্ক! কী আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স!' মেয়েটির গলায় বিস্ময়।

'আপনার সঙ্গে ফর্মাল আলাপটা এই ফাঁকে সেরে নিই।' আদিত্য নরম গলায় বলল, 'আমার নাম আদিত্য মজুমদার।'

'আমি সুরঞ্জনা চক্রবর্তী। আগেই বলেছি, রঘুনাথপুর কলেজে পড়াই। আপনার প্রফেশনটা জানা হয়নি।'

'বি এস সির পর নানা কারণে আমার আর লেখাপড়া করা হয়নি। এখন ছোটোখাটো একটা ব্যবসা করি।' আদিত্য সাবধানে জানাল। তারপর একটু থেমে বলল, 'আমাদের সময়ের তুলনায় আপনাদের সময় কলেজটা কিন্তু অনেক বদলে গিয়েছিল। আমি দুএকবার গিয়ে চিনতেই পারিনি।' আদিত্যর গলায় একটু দুঃখ ছিল। বোধহয় বয়েস হয়ে যাবার দুঃখ।

'তা হয়ত গেছিল, কিন্তু এখন যদি যান তাহলে মনে হবে অন্য কোথাও চলে এসেছেন। অবশ্য এখন ইচ্ছে করলেই কলেজে ঢুকতে পারবেন না। আই ডি লাগবে। অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে কেন ঢুকতে চাইছেন।' সুরঞ্জনার গলায় বেশ বিরক্তির ছাপ।

আদিত্যর মনে পড়ে গেল তাকেও একটা কাজে খুব শিগগির প্রেসিডেন্সিতে যেতে হবে।

ট্রেনটা ভালই চলছে। মেদিনীপুর থেকে এক মধ্যবয়স্ক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক উঠে সুরঞ্জনার পাশের সিটটার দখল নিয়েছেন। তারপর ট্রেন মেদিনীপুর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই যে ঈষৎ নাসিকাগর্জন সহ ঘুমোতে শুরু করেছেন, এখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। আদিত্যর সময়টা মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। কখনও সুরঞ্জনার সঙ্গে হালকা কথা বলে, কখনও কোনও স্টেশনে ট্রেন থামলে সেই স্টেশনের দৃশ্য দেখে। কত চেনা চেনা নাম। শালবনী, গড়বেতা, চন্দ্রকোনা রোড, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। এসব নাম আদিত্য অনেক শুনেছে, তবে কখনও চাক্ষুস দেখতে পাবে, ভাবেনি। এর মধ্যে সুরঞ্জনার সঙ্গে একবার চা খেয়েছে, একবার কফি। আর সুরঞ্জনার কৌটো থেকে চমৎকার ভাজা মশলা।

ট্রেন ঝন্টিপাহাড়ি স্টেশন পেরিয়ে যখন আদ্রার দিকে চলেছে, সুরঞ্জনা বলল, 'আজ ট্রেনটা দারুণ যাচ্ছে। বিফোর টাইম পৌঁছে যাবে মনে হয়। আপনি পুরুলিয়া স্টেশনে নেমে কোনদিকে যাবেন?'

'আমি হোটেল গগনে যাব। হোটেলই গাড়ি পাঠাবে বলেছে।'

'তাহলে তো কোনও চিন্তাই নেই। হোটেল গগন পুরুলিয়ার বেস্ট হোটেল। খুব ডিপেন্ডেবল। আমার জন্য আমার বন্ধু গাড়ি নিয়ে আসবে। ওকে ফোনে পেলাম না। মেসেজ করে দিয়েছি। আশা করি পেয়েছে।'

'পুরুলিয়ায় আপনি কি বাড়ি ভাড়া করে থাকেন?'

'ও হো, সেটাই তো বলা হয়নি। আমরা তিন বন্ধু মিলে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকি। তিনজনেই রঘুনাথপুর কলেজে পড়াই। ওদেরই একজন গাড়ি নিয়ে আসবে। অন্যজন কলকাতায় গেছে, কাল ফেরার কথা।' একটু থেমে সুরঞ্জনা বলল, 'আমরা তিনজন মিলে একটা গাড়ি কিনেছি। সেটাই আমাদের কলেজে নিয়ে যায়। কলেজ থেকে বাড়ি নিয়ে আসে।'

'চমৎকার ব্যবস্থা।' আদিত্য না বলে পারল না।

আদ্রা স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিক দূর যাবার পর ট্রেনটা হঠাৎ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। নিশ্চয় আগে এসে গেছে বলে সিগনাল পাচ্ছে না।

সুরঞ্জনা বলল, 'আমার ব্যাগটা একটু নামিয়ে দেবেন প্লিজ।'

ব্যাগটা নামাতে নামাতে আদিত্য দেখল বেশির ভাগ যাত্রীই মালপত্তর গুছিয়ে যাত্রাশেষের তোড়জোড় করছে। সুরঞ্জনার ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে সে নিজের সুটকেসটাও নিচে নামিয়ে রাখল। কিন্তু তারপর পনের মিনিট কেটে গেল ট্রেন ছাড়ার নামগন্ধ নেই।

যাত্রীরা সকলেই উসখুস করছে। দেখতে দেখতে সাড়ে দশটা বেজে গেল, এগারোটা বেজে গেল, ট্রেন তখনও একইভাবে ঠায় মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সোয়া এগারোটা নাগাদ চেকার সাহেব হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন। হয়ত পাশের কোনও কামরায় ছিলেন, ভেস্টিবিউল গাড়ি বলে চলে আসতে পেরেছেন।

চেকার সাহেব বললেন, 'সামনে মালগাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। নতুন ইঞ্জিন এসে মালগাড়িটাকে না সরানো অব্দি এই গাড়ি যেতে পারবে না। আপনারা দয়া করে ধৈর্য ধরে বসুন।'

যাত্রীদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। 'কতক্ষণ লাগবে?' 'কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?' যাত্রীদের এইসব হাজারো প্রশ্ন এড়িয়ে চেকার সাহেব দুটি কামরার সংযোগস্থল দিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলেন। সম্ভবত সেখানে দুঃসংবাদটা জানানোর জন্য।

আদিত্য চুপচাপ বসে আছে। ভগবান তাকে আর কিছু না দিক প্রচুর ধৈর্য দিয়েছে। সুরঞ্জনা কিন্তু ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বারবার সে তার বন্ধুকে মোবাইলে ফোন করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এই মাঠের মধ্যে টাওয়ার পাওয়া অসম্ভব। কামরার এসিটা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ কামরাটা ঠাণ্ডাই ছিল। এখন বেশ গরম লাগতে শুরু করেছে। বিশেষ করে যেহেতু এসি কামরা বলে জানলাগুলো খোলাই যায় না, তাই কামরার ভেতরে ভ্যাপসা গরম। এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে ঘড়িতে যখন পৌনে বারোটা বেজেছে তখন ট্রেনটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।

পুরুলিয়া এক্সপ্রেস যখন পুরুলিয়া স্টেশনে ঢুকল তখন রাত্তির বারোটা বেজে দশ মিনিট। জনমানবহীন স্টেশন। ট্রেন থেকে যে কজন নামল, মনে হচ্ছে ওই কটাই লোক স্টেশনে রয়েছে। আদিত্য সুরঞ্জনার সঙ্গেই নেমেছে। তার নিজের সুটকেসটা চাকা লাগানো, টানতে অসুবিধে হয় না। সুরঞ্জনার ব্যাগটা সে অন্য হাতে নিয়েছে। এই সঙ্কটের মুহূর্তে সুরঞ্জনাও আদিত্যর কাছ থেকে এই সাহায্যটুকু নীরবে মেনে নিচ্ছে।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দেখা গেল সুরঞ্জনার গাড়ি আসেনি। তবে আদিত্যর হোটেলের গাড়ি সামনেই অপেক্ষা করছে। এতক্ষণ পরে সুরঞ্জনা তার বন্ধুকে ফোনে ধরতে পারল। সে যা ভয় করছিল সেটাই হয়েছে। তার মেসেজ পৌঁছয়নি। ফলে বন্ধু জানেই না সে আসছে। ড্রাইভার ছুটি নিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি চলে গেছে। এখন তাকে ধরা অসম্ভব।

আদিত্য তার গাড়ির ড্রাইভারকে বলল, 'ভাই, এই মেমসাহেবের বাড়ি থেকে গাড়ি আসেনি। এত রাত্তিরে উনি কী করে বাড়ি যাবেন? তুমি ওঁকে বাড়িতে নামিয়ে তারপর আমাকে হোটেলে নিয়ে যাবে। যা বাড়তি টাকা লাগবে আমি তোমাকে দিয়ে দেব। তাছাড়া আগামী তিনদিনও তো তোমার গাড়ি আমার লাগবে।'

এটা ভাড়ার গাড়ি। হোটেল আদিত্যর জন্য ভাড়া করে দিয়েছে। আরও তিনদিন ভাড়া পাওয়া যাবে জেনে ড্রাইভার খুশিই হল। আগামী তিনদিনের মালিককে সে চটাতে চায় না। তাই মেমসাহেবকে পৌঁছে দিতে সে রাজি হয়ে গেল।

রাত্তির একটার সময় একটা ছিমছাম দেখতে দোতলা বাড়ির সামনে সুরঞ্জনাকে নামিয়ে দিল আদিত্য। গাড়ির শব্দ পেয়ে সুরঞ্জনার বন্ধু নিচে নেমে এসেছে। 'আমার বন্ধু জয়ন্তী ঘোষ।' সুরঞ্জনা আলাপ করিয়ে দিল।

'আপনি না থাকলে সুরঞ্জনার আজ কী যে হত! আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।' ভদ্রমহিলার গলায় কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে।

'না, না। ওইভাবে হবে না। আপনি তো শুক্রবার ভোরে চলে যাচ্ছেন। তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুরে আপনি আমাদের বাড়িতে দুপুরে খাচ্ছেন। কোনও আপত্তি শুনব না। আমার নম্বরটা বলছি। একটা কল করুন। আপনার ফোন নম্বরটা আমি সেভ করে রাখব। আপনাকে বৃহস্পতিবারের ব্যাপারটা বুধবার রাত্তিরে আবার মনে করিয়ে দেব।' সুরঞ্জনা কোনও আপত্তি শুনবে বলে মনে হল না।

আদিত্য যখন তার হোটেলে পৌঁছল তখন রাত্তির পৌনে দুটো।

(৩)

আদ্রা পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইন চার্জ সঞ্জয় বারিক সহৃদয় মানুষ। অন্তত টেলিফোনে কথা বলে আদিত্যর সেরকমই মনে হল। হয়ত এই সহৃদয়তার পেছনে সমাদ্দারের বলে দেওয়াটাও কাজ করেছে। সে যাই হোক, তিনজনের সঙ্গে সঞ্জয় দেখা করতে বলেছে। তার মধ্যে একজনের নাম বিজয় মাহাতো। সে গ্রামের বড়লোক। কিছুদিন আগে তার দাদা শঙ্কর মাহাতোকে মাওবাদীরা কুপিয়ে মেরেছিল। এ ছাড়াও সঞ্জয় বারিক দুজনের সঙ্গে দেখা করতে বলছে। দুজনেই এক সময় মাওবাদীদের দলে ছিল। এখন চাষবাসের কাজ করে। এদের মধ্যে একজন, নাম লক্ষ্মণ হাঁসদা, বলেছে বেলা বারোটা নাগাদ আদিত্যর হোটেলে এসে দেখা করবে। অন্যজন, নাম তরুণ মির্ধা, আসবে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ। সেও আদিত্যর হোটেলেই আসবে। এদের সঙ্গে আদিত্যর সরাসরি কথা হয়নি, সঞ্জয় বারিকই এদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সঞ্জয় বারিক এটাও বলেছে যে আদিত্যর সঙ্গে কথা বলার জন্য এরা একটা পারিশ্রমিক আশা করবে।

বিজয় মাহাতোকে অবশ্য টাকা-পয়সা দেবার কোনও ব্যাপার নেই। সে গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তার সঙ্গে আদিত্যকেই সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। কাজটা আদিত্য পরের দিনের জন্য রেখে দিয়েছে। সঞ্জয় বারিক বলছে, খুব সকাল সকাল বেরিয়ে বিজয় মাহাতোর গ্রামে পৌঁছে যেতে পারলে তাকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। তবে সে আদিত্যর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে কিনা সঞ্জয় বারিক জোর দিয়ে বলতে পারছে না।

আগের রাত্তিরে আদিত্যর ঘুম হয়নি বললেই চলে। বেলায় উঠে সঞ্জয় বারিককে ফোন করে সব বন্দোবস্ত করতে করতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। হোটেলের ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্টের সময় পেরিয়ে গেছে। এদিকে বেশ খিদে পেয়ে গেছে আদিত্যর। খিদের আর দোষ কী, কাল রাত্তিরে তো ডিনারই খাওয়া হয়নি। রুম সার্ভিসে কফি, টোস্ট, ডিমের পোচের সঙ্গে একটা আলুভাজার প্লেটও অর্ডার দিয়ে দিল আদিত্য। যা খিদে পেয়েছে, শুধু ডিম-পাঁউরুটিতে পেট ভরবে না। খাবারটা আসতে বেশ দেরি করল। ব্রেকফাস্ট খেয়ে চান-টান করে যখন সে একটু ধাতস্থ হয়েছে তখন বারোটা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই। বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে টোকা পড়ল দরজায়।

লক্ষ্মণ হাঁসদা বলল তাকে লখা বলে ডাকতে। পাকানো, ছোটখাট চেহারা, পুরোনো দিনের গ্রামাফোন রেকর্ডের মতো ঘন কালো গায়ের রঙ। কালো মুখে ঝকঝকে একসারি দাঁত। কথায় কথায় হাসে। হাসিটা মিষ্টি।

'তোমার বাড়ি শহর থেকে কত দূর?' আদিত্য কথাবার্তা শুরু করার জন্য জিজ্ঞেস করল।

'খুব দূরে নয়। পুরুলিয়া শহর থেকে বেরিয়ে বত্রিশ নম্বর ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরে ধানবাদের দিকে আধঘন্টা গেলে একটা ছোট রাস্তা ডানদিকে বেঁকে গেছে। ওই রাস্তাটা ধরে আরো পনের মিনিট হাঁটলে আমার গ্রাম।' লখা হাঁসদা মিষ্টি করে হাসল।

'এলে কী করে? বাস আছে?'

'বাস আছে, তবে হাইওয়ে দিয়ে চলে না। বাসের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতেও হয়। আমি টোটো করে এলাম। হাইওয়ের পাশ দিয়ে টোটো চলে। তারপর পুরুলিয়া পৌঁছে এইটুকু অটোতে।'

'একটু চা-জলখাবার খাও। অনেক দূর থেকে এসেছ।' লখা আপত্তি করল না।

আদিত্য ফোন করে পুরি-তরকারি, গুলাব জামুন আর চায়ের অর্ডার দিল। রুম সার্ভিসকে বলল একটু তাড়াতাড়ি খাবারটা দিতে। আগেরবারের মতো দেরি যেন না হয়।

'আপনি খাবেন না?' লখা আদিত্যর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'না গো। এই একটু আগে ডিম-পাঁউরুটি খেয়েছি। শুধু চা খাব।' একটু থেমে আদিত্য বলল, 'তোমার কথাবার্তা কিন্তু বেশ শহুরে। একটুও গ্রামের টান নেই।'

'আমরা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই ছোট বয়েসেই অনাথ হয়েছিলাম। ফাদারের কাছে মানুষ হয়েছি। ফাদার আমাদের খ্রীষ্টান করে নিয়েছিল। আমার পুরো নাম লক্ষ্মণ পিটার হাঁসদা, দাদার নাম রাম ডমিনিক হাঁসদা।'

'ফাদারের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখ না?'

'ফাদার আর নেই। অনেক বয়েস হয়েছিল। শেষ বয়েসে বেলজিয়াম ফিরে গিয়েছিল। শুনেছি ওখানেই মারা গেছে। রঘুনাথপুরের কাছে ফাদারের একটা ডিসপেনসারি ছিল। কিছু জমিজমাও ছিল। আমরা সেখানেই কাজ করতাম। ফাদার চলে যাবার পরে চার্চের লোক এসে সেসব বিক্রি করে দিল। ডিসপেনসারি ভেঙে ইটভাটা হল। আমরা দুই ভাই আবার অনাথ হয়ে গেলাম।'

'মাওবাদীদের দলে নাম লেখালে কেন?' আদিত্য হঠাৎ প্রশ্নটা করে ফেলল। বারিক বলেছিল, লক্ষ্মণ হাঁসদা দলে থেকে ভেতরের খবর দিত।

উত্তরটা এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 'চারদিকে এত অন্যায়। মানুষের পেটে ভাত নেই, তেষ্টার জল নেই, রোগ হলে বিনা চিকিৎসায় কুকুর-বেড়ালের মতো মরে যায়। আর এদিকে অল্প কিছু লোক, যাদের জমিজমা আছে, টাকার জোর আছে, গরিবের ওপর জুলুম চালায়। আর সরকারও তাদের মদত দেয়। খুব রাগ হতো। ভাবতাম সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেব।'

'দুই ভাই একসঙ্গে ওদের দলে যোগ দিলে?'

'একসঙ্গেই ওদের দলে নাম লেখালাম। দাদা আর আমি সব কাজ একসঙ্গে করতাম। আমাদের কেউ আলাদা করতে পারত না।'

'দলের সঙ্গে গন্ডগোল হল কেন?'

লখা পিটার হাঁসদার চোয়ালটা শক্ত হল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দল দাদাকে খুন করল। বাঘ মারার জন্যে যেমন ছাগলকে টোপ রাখা হয়, তেমনি দাদা আর বিজুকে টোপ হিসেবে রাখা হয়েছিল। ওদের বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, দুজন মিলিটারির জওয়ান ভুল করে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে, ওদের খতম করে দিতে হবে। আসলে দুজন নয়, একটা পুরো ট্রাক ভর্তি মিলিটারি জঙ্গলে ঢুকে এসেছিল। দাদা আর বিজুকে দেখে ওরা গুলি চালাল। দাদারাও পালটা গুলি চালালো। কিন্তু অতগুলো জোয়ানের সঙ্গে ওরা মাত্র দুজন কী করে পারবে? মিলিটারিরা ওদের ঘিরে ফেলে গুলিতে গুলিতে শরীর ঝাঁঝরা করে দিল। তারপর যখন মিলিটারিগুলো একটু অসতর্ক হয়ে দাদা আর বিজুর বডি দুটো ট্রাকে তুলছে, ভাবছে কাছাকাছি আর কোনও জঙ্গী নেই, ঠিক তখন আমাদের আসল দলটা পেছন থেকে এসে মিলিটারিদের আক্রমণ করল। একটা মিলিটারিও সেদিন বেঁচে ফিরতে পারেনি। একত্রিশ জন জওয়ান খতম। ট্রাকটাও জ্বালিয়ে দেওয়া হল। দাদা আর বিজুর বডিগুলো পাওয়া যায়নি। কেউ পাবার চেষ্টাও করেনি। ট্রাকের সঙ্গেই জ্বলে গেছিল।'

লখা থামল। ঘরের আবহাওয়া বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই দরজায় টোকা। রুম সার্ভিস খাবার নিয়ে এসেছে। আবহাওয়াটা সহজ করার জন্য আদিত্য দুটো কাপে চা ঢালল। লখার জন্য চায়ে দুধ মেশাল সঙ্গে উপুড়-চুপুড় দুচামচ চিনি। তার নিজের জন্য দুধ-চিনি ছাড়া কালো চা।

'খেয়ে নাও।' আদিত্য খুব নরমভাবে বলল।

একটু পরে, যখন লখার খাওয়া শেষ হয়েছে, সে গেলাসের জল প্লেটে ঢেলে হাত ধুয়ে নিয়েছে, শব্দ করে চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়েছে, তখন আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'দলটা কে চালাত?'

'দলের কমান্ডার ছিল অভিজিৎ সিং। সে-ই আমাদের অর্ডার দিত। অ্যাকশনের সময় সে দলের সঙ্গেই থাকত। তবে পেছন দিকে।'

'অভিজিৎ সিং-এর ওপরে আর কেউ ছিল?'

'বলতে পারব না। হয়ত ছত্তিসগড়ে আরও বড় যে মাওবাদী দলটা আছে তাদের কাছ থেকে কখনও কখনও নির্দেশ আসত। তবে আমি সঠিক বলতে পারব না।'

'তোমার সঙ্গে অভিজিৎ সিং-এর কথা হতো?'

'না। আমি তো নিচু র‍্যাঙ্কের সোলজার ছিলাম। আমার সঙ্গে কমান্ডার কেন কথা বলবে। তবে একদিন পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। যেদিন ওরা দাদাকে খুন করল সেদিন। অপরেশনের সময় অভিজিৎ সিং পেছন দিকে ছিল। জওয়ানগুলো মরে যাবার পর একবার সামনে এসেছিল। সবাইকে সাবাসি দিচ্ছিল। আমাকেও দিল। পুরোটাই নাকি ছিল ওর প্ল্যান। এটা অবশ্য পরে শুনেছিলাম। তখন যদি জানতাম ও দাদাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে, ওকে গুলি করে মেরে ফেলতাম।'

'অভিজিত সিং সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পার?'

'দেখতে খুব সুন্দর। সিনেমা আর্টিস্টের মতো। আর প্রচণ্ড মাগীবাজ। মেয়ে দেখলে নিজেকে সামলাতে পারত না। দলের মেয়েদের সঙ্গেও ফষ্টিনষ্টি করত। দলের ছেলেরা এটা ভাল চোখে দেখত না। তবে মেয়েরা ওকে দেখলেই পটে যেত। শুনেছি পুরুলিয়া, রাঁচি, পাটনা সব যায়গায় ওর আলাদা আলাদা মেয়েমানুষ ছিল।'

সাড়ে তিনটে বেজে গেল পুলিশের অন্য ইনফর্মার তরুণ মির্ধা এখনও এল না। চারটে বেজে গেল, সাড়ে চারটে বেজে গেল। আদিত্য প্রথমে ভাবছিল হয়ত অনেক দূর থেকে আসছে বলে দেরি হচ্ছে। কিন্তু ঘড়িতে যখন প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে তখন আদিত্যর মনে হতে লাগল যে কোনও কারণেই হোক তরুণ মির্ধা

আজ আর আসছে না। সে সঞ্জয় বারিককে ফোন করল। বারিক একটু পরে আদিত্যকে ফোন করে জানাল তরুণ মির্ধার ফোন সুইচড অফ আছে।

খুব দরকার ছিল তরুণ মির্ধার সঙ্গে কথা বলার। এই ব্যক্তিই পুলিশের কাছে মাওবাদীদের এক্স্যাক্ট লোকেশনগুলো জানাত। সেই ইনফর্মেশন অনুযায়ী পুলিশ অনেকগুলো এনকাউন্টার করেছে।

সাড়ে পাঁচটার সময় আদিত্য ঠিক করল আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। তরুণ মির্ধা আজ আসছে না। সে সঞ্জয় বারিকের নম্বরটা ডায়াল করল।

'তরুণ মির্ধা তো মনে হচ্ছে আর আসবে না। তাহলে আপনার সঙ্গে কি আজ সন্ধেবেলা দেখা করা যেতে পারে?'

'আমি আটটা সাড়ে আটটা অব্দি পুলিশ স্টেশনেই আছি। আপনি চলে আসুন।' সঞ্জয় বারিক জানাল।

গাড়িটা সারাদিন হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য গাড়ির কাছে গিয়ে দেখল ড্রাইভার সিটটা পেছন দিকে করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দোষ দেওয়া যায় না। কাল রাত্তিরে তো ওরও ঘুম হয়নি। পুরুলিয়া থেকে পাঁচ নম্বর স্টেট হাইওয়ে ধরে, হাতুয়ারা, গুড়গুড়িয়া, চাপারি হয়ে আদ্রা পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছতে প্রায় এক ঘন্টা পনের মিনিট লেগে গেল।

সঞ্জয় বারিক আদিত্যর জন্যই অপেক্ষা করছিল। আদিত্যকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আদিত্যবাবু তো। আসুন আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি।' তারপর এক কনেস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চা নিয়ে এসো। আর কচুরি-জিলিপি। আমাদের এখানকার কচুরি একবার খেলে ভুলতে পারবেন না স্যার। এই সন্ধের মুখটাতে ভাজে।' শেষের কথাগুলো বলাই বাহুল্য আদিত্যকে লক্ষ্য করে।

আদিত্য দুএকবার আপত্তি করে রাজি হয়ে গেল। লাঞ্চটা সে খুব হালকা খেয়েছে।

কচুরি-জিলিপি ভক্ষণ সমাধা হবার পর চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'বারিক সাহেব, আপনি তো ওই স্পেশাল টাস্ক ফোর্সটাতে ছিলেন যেটা মাওবাদীদের ফাইট করার জন্য তৈরি হয়েছিল?'

'অবশ্যই ছিলাম। ইন ফ্যাক্ট টাস্ক ফোর্স তৈরি হবার ঢের আগে থেকেই আমি পুরুলিয়ায় পোস্টেড ছিলাম, তাই পুরো ব্যাপারটা আমি অনেকটাই জানি।'

'তাহলে বলুন, চন্দ্রা সেনের গতিবিধির ওপরেও আপনারা নিশ্চয় ভাল করে নজর রাখতেন।'

'অবশ্যই। চন্দ্রা সেনের প্রতিটি মুভমেন্ট ফলো করা হতো।'

'চন্দ্রা সেন কি খুব বেশি ট্র্যাভেল করতেন? মানে, মাঝে মাঝে জঙ্গলে গিয়ে মাওবাদী দলটার সঙ্গে যোগাযোগ করা কি তার পক্ষে সম্ভব ছিল?'

'দেখুন, চন্দ্রা সেন জয়চণ্ডী পাহাড় জংশন স্টেশনের কাছে নীপবীথি বলে একটা ইস্কুলে ইংরেজি আর অঙ্ক পড়াতেন। এটা গরিব মেয়েদের ইস্কুল। দুপুরে এক পেট খাওয়ার লোভে অনেক গরিব ঘরের মেয়ে এখানে পড়তে আসে। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেলে চন্দ্রা সেন বেশির ভাগ দিনই সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়া ফিরে যেতেন। শুধু সপ্তাহে একদিন ওই ইস্কুল চত্বরেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। খুব মাঝে মাঝে জঙ্গলে গিয়ে মাওবাদী দলটার ক্লাশ নিতেন। বোধহয় মার্কস, লেনিন এইসব পড়াতেন। এর বাইরে আর কিছু তাকে কখনও করতে দেখা যায়নি।'

'অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে চন্দ্রার কেমন সম্পর্ক ছিল?'

'অভিজিৎ সিং মাসে অন্তত একবার নীপবীথি ইস্কুলে এসে চন্দ্রা সেনের সঙ্গে দেখা করত। সাধারণত টিফিনের সময় এই মিটিংটা হতো। ইস্কুল থেকে কিছু দূরে একটা দিঘি আছে সেই অব্দি দুজনে হাঁটতে হাঁটতে যেত। দিঘির ধারে বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসত। আমরা মনে করতাম দুজনের মধ্যে একটা রোমান্টিক সম্পর্ক আছে। একটা খটকা ছিল। ওরা নিয়ম করে মাসে মাত্র একদিন দেখা করে কেন? তাও একটা বিশেষ দিনে, মাসের প্রথম মঙ্গলবারে।'

'আচ্ছা, আপনারা কি চন্দ্রা সেনকে চব্বিশ ঘন্টাই নজরে রাখতেন?'

'না, আমাদের অত লোক কোথায়? তবে দুতিন দিনে অন্তত একবার আমরা চন্দ্রা সেনের খোঁজ নিতাম।'

'তাহলে তো চন্দ্রা সেন কখনও কখনও পুলিশের চোখ এড়িয়ে দলের সঙ্গে, বিশেষ করে অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেও পারত?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে এটা একেবারে অসম্ভব ছিল না।'

পুরুলিয়া ফেরার পথে সুরঞ্জনার ফোন এল। 'কাল দুপুরের কথা মনে আছে তো?'

'অবশ্যই মনে আছে। আমিই এ-ব্যাপারে আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, দুপুরের বদলে যদি রাত্তিরে যাই তাহলে কি আপনাদের খুব অসুবিধে হবে? আসলে দিনের বেলা আমার একটু কাজ পড়ে গেছে।'

'রাত্তিরে হলে আমাদের তো সুবিধেই হয়। আপনার কথা ভেবেই দুপুরে করছিলাম। আপনাকে তো পরের দিন খুব ভোরে ট্রেন ধরতে হবে। সেটা পারবেন তো?'

'সে আমি ঠিক পারব। আমার রাত জাগা অভ্যেস আছে। বাকি ঘুমটা ফেরার পথে ট্রেনে মেক-আপ করে নেব। তাহলে ওই কথাই রইল। আমি রাত্তিরেই যাচ্ছি।'

'খুব রাত্তির করবেন না। সাতটার মধ্যে চলে আসুন। তাহলে খানিকটা কথাবার্তা বলা যাবে।'

'ঠিক আছে। কাল দেখা হবে।'

(৪)

বিজয় মাহাতোর গ্রামটা এন এইচ থার্টি টু থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। রাস্তাটাও ভাল নয়, মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত। দুদিকে ধানক্ষেত। একটু অসতর্ক হলেই গাড়ি সোজা ধানক্ষেতে নেমে যাবে। আদিত্য খুব ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছিল। পথে সে আর তার ড্রাইভার বাপি চা-সিঙাড়া খেয়েছে। বিজয় মাহাতোর গ্রামের নাম বেলতোড়া। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা আটটা হয়ে গেল। মাহাতোরা গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। সকলেই তাদের চেনে। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা চায়ের দোকান। কয়েকজন সেখানে বসে চা খাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতেই একজন বলল, মাহাতোদের বাড়ি তো ওই সামনেই। কিন্তু বিজয় মাহাতো বউ ছেলে নিয়ে কাল রাত্তিরে কলকাতা চলে গেছে। বাড়িতে এখন কেউ নেই। কলকাতা থেকে তারা কবে ফিরবে সেটাও বলে যায়নি।

আদিত্যর প্রচণ্ড হতাশ লাগছিল। ভোরবেলা উঠে এত কষ্ট করে এখানে আসা। সব বৃথা গেল। সে চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে বাপি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে জয়চণ্ডী পাহাড় জংশন যেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'খুব টেনে চালালেও ঘন্টা দুয়েক লেগে যাবে।'

'খুব টেনে চালানোর দরকার নেই। আমার হাতে সময় আছে। জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের কাছে নীপবীথি বলে একটা মেয়েদের ইস্কুল আছে। তুমি চেন?'

'নামটা চেনা চেনা লাগছে। বোধহয় দেখেছি।'

'আমাকে সেখানেই যেতে হবে। নিয়ে যেতে পারবে তো?'

'কেন পারব না? আপনি গাড়িতে উঠে বসুন আমি আসছি।'

আদিত্য গাড়িতে বসে সিগারেট ধরাল। বাপি মাঠের মধ্যে নেমে গেছে। নিশ্চয় প্রকৃতির ডাক। সামনে একটা দিঘি। পাড়ের দিকটা কচুরিপানায় ভর্তি। মাঝখানে টলটলে জল। কচুরিপানার ওপর ফুল ফুটেছে। একটা খুব ছোট্ট পাখি ফুলের ওপর বসে দোল খাচ্ছে। বোধহয় মধুও খাচ্ছে। পাখিটার মধু খাওয়ার কেরামতি দেখতে দেখতে হঠাৎ অজ পাড়াগাঁয়ের এই সকালটা আদিত্যর ভীষণ ভাল লেগে গেল। ভোরে ওঠা সার্থক হয়েছে।

'গাড়ি ছাড়ব?' বাপি ড্রাইভার গাড়িতে ফিরে এসেছে।

পরের দুঘন্টার মধ্যে দেড় ঘন্টা আদিত্যর ঘুমিয়েই কাটল। টানা ঘুম নয়, মাঝে মাঝে গাড়ির ঝাঁকানিতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। যতবারই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল, আদিত্য চোখ চেয়ে দেখছিল দুদিকে সেই একই ছবি। ধান কেটে নেওয়া মাঠ, পুকুর, মরাই, কিছু একতলা বাড়ি, বাজার, মুদির দোকান, সাইকেলের দোকান। এসব দেখতে দেখতে আবার চোখ বুঝে ফেলছিল আদিত্য। ভোরে ওঠার এই এক সমস্যা, সারাদিন ঘুম পায়। তারপর একটা সময় বাপির গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল, 'আমরা এসে গেছি।'

সাদামাটা একটা বাড়ি, তার ঢোকার মুখে বড় বড় করে লেখা 'নীপবীথি'। আদিত্য দরজা দিয়ে ঢুকে দেখল পুরোদমে ইস্কুল বসে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে চারটে বড় ঘর চোখে পড়ল। চারটেতেই ক্লাশ হচ্ছে। আর একটা ছোট ঘর আছে, তার দরজায় বাংলাতে লেখা 'অফিস ঘর'। আদিত্য উঠোন পেরিয়ে সেই অফিস ঘরের দিকে রওনা দিয়েছিল, এমন সময় ধুতি-শার্ট পরা কালো রোগা মতো একটা লোক আদিত্যর পেছন থেকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

এরকম একটা প্রশ্ন হবে আদিত্য জানত। উত্তরে কী বলবে সেটাও আদিত্য ভেবে রেখেছিল। সে বলল, 'এখানে চন্দ্রলেখা সেন পড়ান? আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি।'

'চন্দ্রা দিদিমনি তো অনেকদিন এখান থেকে চলে গেছেন। চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন।'

'চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন?' আদিত্য যতটা পারে অবাক হবার ভান করল। 'কতদিন হল চলে গেছেন?'

'তা চার-পাঁচ মাসের বেশি। বোধহয় ছ-মাস হবে।'

'কোথায় গেছেন বলতে পারেন?'

'তা তো আমি বলতে পারি না বাবু। আমি দুলাল ডোম, ইস্কুলের দরোয়ান। আমি অত খবর রাখি না। আপনি ওই আপিস ঘরে যান। দেখবেন হেড দিদিমনি বসে আছেন। ওনাকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলতে পারবেন।'

দুলাল ডোম আদিত্যকে আপিস ঘর অব্দি পৌঁছে দিল। বাইরে থেকে ঘরটাকে যতটা ছোট মনে হয়েছিল, আদিত্য ভেতরে ঢুকে দেখল ঘরটা ততটা ছোট নয়। মাঝখানে একটা পার্টিশন। তার একদিকে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক একটা মান্ধাতার আমলের টাইপ রাইটারে দুই আঙুলে শামুকের গতিতে টাইপ করছেন। পার্টিশনের অন্যদিকে একটি চেয়ার-টেবিলে বসে ঈষৎ স্থূলকায়া এক মহিলা একটা মোটা খাতা খুলে কী যেন লিখছেন। আদিত্যর পায়ের আওয়াজে চোখ তুলে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আদিত্য আন্দাজে বুঝে নিল ইনিই হেড দিদিমনি। সে বলল, 'আমি চন্দ্রলেখা সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এসে শুনলাম ও এখানকার চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।'

'চন্দ্রা তো মাস ছয়েক হলো চলে গেছে। আপনি ওর কে হন?' ভদ্রমহিলাকে একটু সন্দিগ্ধ মনে হল।

আদিত্য এই প্রশ্নটার জন্যেও তৈরি হয়ে এসেছিল। বলল, 'আমি ওর পুরোনো বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। তবে বহুদিন দেখা হয়নি। শেষ দেখা হয়েছিল কলকাতায়, প্রায় পাঁচ-ছ বছর আগে। তখন চন্দ্রা বলেছিল, এই নীপবীথি ইস্কুলে ও পড়ায়। জায়গাটার একটা ডিরেকশনও দিয়েছিল। ডিরেকশনটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু কী করে জানি না আমার ইস্কুলের নামটা মনে থেকে গিয়েছিল। এদিকে কয়েকদিনের জন্য কাজে এসেছিলাম। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। তখন ভাবলাম, নীপবীথি ইস্কুলটার খোঁজ করা যাক। বেশি খোঁজ করতে হল না। আমার ড্রাইভারই বলল ইস্কুলটা চেনে। সে-ই নিয়ে এসেছে। কিন্তু তখন কি জানতাম চন্দ্রা এখান থেকে চলে গেছে। ভেবেছিলাম চন্দ্রাকে জোর একটা সারপ্রাইজ দেব।' কথা শেষ করে আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রমহিলার এবার খেয়াল হল আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, 'আপনি বসুন।'

আদিত্য একটু ইতস্তত করে ভদ্রমহিলার উল্টোদিকের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। বুকের ওপর দুহাত জড়ো করে বলল, 'নমস্কার। আমার নাম আদিত্য মজুমদার।'

'আমি মাধবী হালদার, এই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস।' ভদ্রমহিলাও দুহাত জড়ো করে নমস্কার করলেন।

'চন্দ্রা আপনাদের এই ইস্কুলটার কথা খুব বলেছিল। বলেছিল, এখানে আপনারা গরীব মেয়েদের খুব যত্ন করে লেখাপড়া শেখান।'

'ওই যত্ন করে কথাটা একদম সঠিক বলেছেন। আশেপাশে সরকারি স্কুলের তো অভাব নেই। সেখানে লেখাপড়াও শেখানো হয়। কিন্তু জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের মতো এত যত্ন করে কেউ শেখায় না।'

'এটা তাহলে সরকারি ইস্কুল নয়?'

'না, এটা বেসরকারি। একটা এন জি ও ইস্কুলটা চালায়। তবে কিছু কিছু সরকারি সাহায্যও আমরা পেয়ে থাকি।'

'চন্দ্রা এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। যে এন জি ও এই স্কুলটা চালায় সারা রাজ্যে তাদের এরকম আরও স্কুল আছে। সেই রকমই একটা স্কুলে চন্দ্রা চলে গেছে। স্কুলটা বসিরহাটে, নাম বনবীথি। এটা নীপবীথি, ওটা বনবীথি। এদের সবকটা স্কুলই ওই বীথি নিয়ে নাম। নীপবীথি, বনবীথি, কুঞ্জবীথি, কাননবীথি, এইসব। যে ভদ্রলোক এন জি ও-টা চালান, আমি যত দূর জানি, তার স্ত্রীর নাম ছিল বীথি।'

'আমি এই অঞ্চলে একটা বড় ফার্ম করার কথা ভাবছি। গরু-মোষ-হাঁস-মুরগি থাকবে, কিছু চাষ-বাসও হবে, বিশেষ করে মাশরুমের চাষ। সেই জন্য জমি দেখতে এসেছিলাম। রঘুনাথপুর ছাড়িয়ে আরও উত্তরে একটা জমি দেখে এসেছি। তা ভাবছিলাম, এখানে এসেই যখন পড়লাম, আপনাদের ইস্কুলটা কি একটু ঘুরে দেখা যেতে পারে? আমার এই ধরনের প্রজেক্টে খুব উৎসাহ।'

'নিশ্চয় দেখা যেতে পারে। অবশ্যই দেখা যেতে পারে।'

আদিত্যর মনে হলো সে ইস্কুলটা দেখতে চেয়েছে বলে হেড দিদিমনি খুব খুশি হয়েছেন। সে কিছু বলার আগেই মাধবী হালদার বললেন, 'চলুন আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে স্কুলটা ঘুরে দেখাই।'

দেখার অবশ্য খুব বেশি কিছু নেই। চারটে ঘরে ক্লাশ হয়, ওয়ান থেকে ফোর। আর একটা ঘরে ইস্কুলের আপিস আর হেড মিস্ট্রেসের বসার জায়গা। হেড মিস্ট্রেসের চেয়ারের পেছনে একটা বেতের সোফা আর কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। ক্লাশের অবকাশে অন্য দিদিমনিরা সেখানে বসেন। হেড দিদিমনি ছাড়া আরও তিনজন দিদিমনি আছেন। তাঁরা সকলেই এখন ক্লাশ নিচ্ছেন। এছাড়া ইস্কুলের পেছন দিকে আর একটা ছোট ঘর আছে। সেখানে মিড ডে মিলের চাল ডাল আলু পেঁয়াজের বস্তা রাখা হয়। এক ঝুড়ি ডিমও রয়েছে একদিকে। হেড দিদিমনি জানালেন, সপ্তাহে একদিন মেয়েদের ডিম খাওয়ানো হয়। বাইরে থেকে মিড ডে মিলের রসদ আসে। যে এন জি ও-টা ইস্কুল চালায় সে-ই এসব পাঠায়, সে-ই এর খরচ বহন করে। তবে এই বাবদে সরকারের কাছ থেকে কিছু সাহায্যের জন্য খুব চেষ্টা করা হচ্ছে। ইস্কুলটা ঘুরে দেখতে দেখতে আদিত্য চারদিকের পরিষ্কৃতির তারিফ না করে পারল না।

'এত সুন্দর একটা ইস্কুল, চন্দ্রা ছেড়ে চলে গেল কেন? আদিত্য আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল।

মাধবী হালদার খানিকক্ষণ ইতস্তত করলেন। আদিত্যর মনে হল তার সহজাত রমণী সত্তা একটা কিছু রসাল গল্প বলতে চাইছে আর তার গম্ভীর হেড মিস্ট্রেস সত্তা তাকে বাধা দিচ্ছে। শেষে দ্বিতীয় সত্তার জয় হলো। তিনি বললেন 'জানি না। চন্দ্রাকে এখানে তো বেশ সুখীই মনে হতো।'

'চন্দ্রা কি এখানেই থাকত?'

'না, না। চন্দ্রা থাকত পুরুলিয়ায়। আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে। ওখান থেকে যাতায়াত করত।'

আদিত্য মাধবী হালদারের সঙ্গে আবার আপিস ঘরে ফিরে এসেছিল। মাধবী হালদার তাঁর চেয়ারে বসলেন, ইঙ্গিতে আদিত্যকেও বসতে বললেন। মুখে বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান। এত দূর থেকে আমাদের স্কুল দেখতে এলেন।' তারপর গলার স্বর চড়িয়ে ডাকলেন, 'দুলাল, দুলাল, একবার শুনে যাও।'

দুলাল ঘরে ঢোকার আগেই একটি রোগা কালো ছোটোখাট চেহারার মেয়ে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে ঘরে এসে ঢুকল। হেড দিদিমণির দিকে তাকিয়ে বলল, কুসুম কিন্তু আজও ক্লাশে অসভ্যতা করেছে। সমানে পাশের

মেয়েকে বিরক্ত করে গেছে। আমি কিন্তু এবার ওকে শাস্তি দেব। আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।' আদিত্যর মনে হল হেড দিদিমনি মেয়েদের শাস্তি দেবার বিরোধী। কাউকে শাস্তি দেবার আগে তার অনুমতি নিতে হয়।

হেড দিদিমনি বললেন, 'সেসব পরে হবে। আগে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি, ইনি চন্দ্রার বন্ধু, চন্দ্রার খোঁজে এসেছেন। জানতেনই না চন্দ্রা এখান থেকে অনেক দিন হলো চলে গেছে।' তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি ইলা নস্কর, আমাদের একজন টিচার।'

আদিত্য বুঝল তার নামটা হেড দিদিমনি ভুলে গেছেন। সে তাড়াতাড়ি ইলা নস্করের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলল, আমি আদিত্য মজুমদার। চন্দ্রার সঙ্গে কলেজে পড়তাম।'

'আপনি চন্দ্রার বন্ধু? তাহলে তো আপনি আমাদের থেকে অনেক উঁচু ঘরের মানুষ। চন্দ্রার মতো আপনারও কি গরিবের উপকার করা বাতিক?' ইলা নস্কর তার গলার তিক্ততা ঢেকে রাখার কোনও চেষ্টাই করল না।

আদিত্য অপ্রস্তুত। তার থেকেও বেশি অপ্রস্তুত মাধবী হালদার। তিনি অবস্থাটা সামলানোর জন্য আদিত্যর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আসলে চন্দ্রার এই হঠাৎ চলে যাওয়া নিয়ে ইলার মনে খুব অভিমান জমে আছে।'

'অভিমান-টভিমান নয়। যেটা জমে আছে সেটা বিরক্তি। দেখুন, আপনার কথা আমি জানি না। কিন্তু চন্দ্রার কথা ভালো করেই জানি। বিরাট বড়লোকের মেয়ে। সখ করে এখানকার গরিবদের উদ্ধার করতে এসেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সখ মিটে গেল। ব্যাস চলে গেল এখান থেকে। আমাদের ব্যাপারটা আলাদা। এখান থেকে যে কটা টাকা পাই তাই দিয়ে সংসার চালাতে হয়। চন্দ্রার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? যাক গে, আপনাকে এসব কথা বলার কোনও মানেই হয় না। মাধবীদি আমি যাচ্ছি, ক্লাশ আছে।' শেষের কথাগুলো, বলাই বাহুল্য, মাধবী হালদারকে লক্ষ্য করে।

ইলা নস্কর গটগট করে বেরিয়ে যাবার পরেও বেশ খানিকক্ষণ ঘরের হাওয়াটা ভারি হয়ে রইল। কেউই কোনও কথা বলতে পারছে না। শুধু পার্টিশনের ওপার থেকে মাঝে মাঝে কেরানিবাবুটির টাইপ রাইটারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটু আগে দুলাল চা দিয়ে গেছে। আদিত্য নীরবে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। শেষে নীরবতা ভেঙে মাধবী হালদার বললেন, 'আসলে ইলা মেয়েটা বুঝলেন মোটেই খারাপ নয়। শুধু একটু বেশি ইমোশানাল। ওর সঙ্গে চন্দ্রার খুবই বন্ধুত্ব ছিল। চন্দ্রার হঠাৎ এইভাবে চলে যাওয়াটা ও মোটেই মেনে নিতে পারেনি।'

'সত্যি, চন্দ্রা এইভাবে চলেই বা গেল কেন?' আদিত্য এই নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করল।

'একটা ব্যাপার ঘটেছিল। জানি না আপনাকে বলাটা ঠিক হবে কিনা। তবে ঘটনাটার কথা এখানকার সকলেই জানে। এখানে অভিজিৎ সিং বলে একজনের সঙ্গে চন্দ্রার একটা সম্পর্ক হয়েছিল। অভিজিৎ এই স্কুলেও মাঝে মাঝে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমরা সবাই তাকে দেখেছি। শুনেছিলাম অভিজিৎ একজন ইঞ্জিনিয়ার। তবে চাকরি-টাকরি কী করত জানি না। কেউ কেউ বলত অভিজিতের সঙ্গে মাওবাদীদের যোগ আছে।'

'কত ঘনঘন অভিজিৎ আসত এখানে?' আদিত্য জিজ্ঞেস না করে পারল না। তারপর নিজের কৌতুহলটাকে বৈধতা দেবার জন্য বলল, 'আসলে চন্দ্রা আমাকেও একবার এই অভিজিৎ সিং-এর কথা বলেছিল। অবশ্য হালকাভাবেই বলেছিল।'

'মাসে একবার করে অন্তত অভিজিৎ আসত। হয়ত তার বেশিই আসত। আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। আসলে অভিজিৎ যখন আসত তখন অনেক সময় আমি কাজে ব্যস্ত থাকতাম। অভিজিৎ আসত আমাদের টিফিনের সময় যাতে চন্দ্রার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে। ঠিক সেই সময় অনেকদিন আমাদের মিড ডে মিলের চাল-ডাল আসত। আমি সেসব নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়তাম।'

'তারপর কী হল বলুন?'

'কোনও কারণে অভিজিতের সঙ্গে চন্দ্রার আড়ি হয়ে গেল। কেন হল বলতে পারব না। ব্যাপারটা খুব হঠাৎই ঘটল। কী ঘটল জানি না কিন্তু এতে চন্দ্রা এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে সে ঠিক করল রাতারাতি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। তার আগে অবশ্য বসিরহাটের বনবীথি ইস্কুলে একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল। একরকম বদলি নিয়েই চলে গেল বলতে পারেন। আসলে চন্দ্রার মতো কোয়ালিফাইড টিচার তো সত্যিই আমাদের ইস্কুলে আর নেই। তাই কর্তৃপক্ষ চন্দ্রাকে ছাড়তে চায়নি। সে বলা মাত্র তাকে অন্য জায়গায় চাকরি দিয়ে দিয়েছিল।'

'চন্দ্রা চলে যেতে আপনাদের অসুবিধে হয়নি?'

'হয়নি আবার? ভীষণ অসুবিধে হয়েছিল। আমরা সকলে মিলে চন্দ্রাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। বিশেষ করে ইলা। চন্দ্রা আমাদের কারও কথা শুনল না। পুরুলিয়ায় থাকতে সে আর রাজি নয়। কিছুতেই নয়।'

একটু পরে হেড দিদিমনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আদিত্য বাইরে এসে দেখল বাপি ড্রাইভার গাড়িতে নেই। তাকে ফোন করতে সে বলল খেতে এসেছে, মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়ির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এখন ইস্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আদিত্য সিগারেট ধরাল। ইস্কুলের উল্টোদিকে পুকুর। পুকুরে কয়েকটা হাঁস চরছে। কয়েকটি গ্রামের বধূ বাসন মাজতে নেমেছে। আরও দূরে একটা টিলার আবছা রূপরেখা। আদিত্য দেখল ইস্কুলের সেই কেরানি ভদ্রলোক, যিনি পার্টিশানের আড়ালে বসে সশব্দে টাইপ করছিলেন, গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন। হয়ত খেতে যাচ্ছেন। আদিত্যকে দেখে ভদ্রলোক হাসলেন। আদিত্যও হাসল। তারপর খানিকটা কৈফিয়ত দেবার মতো করে বলল, 'ড্রাইভার খেতে গেছে, তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

ভদ্রলোক আদিত্যর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আদিত্য বলল, 'এখানে আপনার খুব কাজের চাপ, না?'

'না, না। কাজের তেমন চাপ নেই। শুধু ওই যেদিন মিড ডে মিলের চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ আসে তার পরদিনটা একটু কাজ থাকে। সব হিসেব করে মিলিয়ে রাখতে হয় তো?'

'মাসে কবার আসে মিড ডে মিলের জিনিসপত্র?'

'মাসে একবারই আসে। যেমন আজ এসেছে। ওই দেখুন ট্রাক থেকে চালের বস্তা নামছে।'

আদিত্য খেয়াল করল স্কুলের পাশে একটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে। দুজন বস্তা পিঠে নিয়ে স্কুলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

'আমি একটু এগোচ্ছি, হেড দিদিমনি ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কেরানিবাবু চলে যাবার পর আদিত্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিড ডে মিলের বস্তার যাতায়াত দেখল। পুরোনো বস্তাগুলো ফেরত যাচ্ছে। নতুনগুলো আসছে। তারপর এক সময় আদিত্য লক্ষ করল ঢালু রাস্তা দিয়ে উঠে আসছে বাপি ড্রাইভার।

(৫)

তিন সখীর সংসার। পুরো সংসার না বলে একে অর্ধেক সংসার বলাই সমীচীন। সুরঞ্জনা চক্রবর্তী, জয়ন্তী ঘোষ, শ্রেয়সী তালুকদার এরা প্রত্যেকেই বিবাহিত। স্বামীর সঙ্গে এদের প্রত্যেকের একটা করে সংসার আছে। বলা যায়, সেগুলোই এদের আসল সংসার। এখানে তিনজনে মিলে যে সংসারটা পেতেছে সেটাকে অস্থায়ী বলা যাবে না, কারণ রঘুনাথপুর কলেজে তিনজনেরই পাকা চাকরি। আবার সম্পূর্ণ সংসারও বলা চলবে না, যেহেতু, ওপর ওপর তাদের যতই হাসিখুশি দেখাক না কেন, তিন সখীরই মন পড়ে থাকে তাদের স্বামীদের কাছে। তিনজনের মধ্যে সুরঞ্জনা অঙ্ক পড়ায়, জয়ন্তী পড়ায় পলিটিকাল সায়েন্স আর শ্রেয়সীর বিষয় ইতিহাস। বিষয়ের দিক থেকে অমিল থাকলেও একটা ব্যাপারে এদের মিল আছে। এদের কারোরই এখনও ছেলেপুলে হয়নি। কাজেই সেদিক থেকে এরা প্রত্যেকেই ঝাড়া হাত পা। তবে জয়ন্তীকে

দেখে আদিত্যর মনে হল তার সন্তান উৎপাদনের বয়েস প্রায় পেরিয়ে গেছে। তিনজনের মধ্যে সে-ই সব থেকে বড়। অন্য দুজন অনেকটাই ছোট। দেখে মনে হয়, সুরঞ্জনার সদ্য তিরিশ পেরিয়েছে, শ্রেয়সীর তাও পেরোয়নি।

রাত্তিরের খাওয়াটা বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হয়ে গেল। কুচো ট্যাংরা মাছের গা-মাখা চচ্চড়ি থেকে শুরু করে প্লেটে আঁটে না এমন সাইজের পাবদার ঝাল, স্থানীয় পুকুরের অতি সুস্বাদু কাতলা এবং সবার ওপরে রেওয়াজি খাসির কোর্মা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আদিত্য ভাবছিল কী করে কাল ভোরে উঠে হাওড়াগামী পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ধরবে?

'আমরা তো এতক্ষণ বকবক করে নিজেদের কথা বলে গেলাম, আপনি তো আপনার কথা কিছুই বললেন না।' সুরঞ্জনা মশলার থালা এগিয়ে দিয়ে বলল।

প্রসঙ্গটা যে উঠবে আদিত্য জানত। সে আজ দুপুরে হোটেলে ফেরার সময় গাড়িতে বসে এটা নিয়ে ভেবেছে। সে কি এদের কাছে নিজের আসল পরিচয়টা দেবে? নাকি যে পরিচয় একটু আগে নীপবীথি ইস্কুলে দিয়ে এসেছে, সেটাই চালিয়ে যাবে? তার স্বাভাবিক বুদ্ধি বলছে দুজায়গায় দুরকম পরিচয় না দেওয়াই ভাল। ছোট জায়গা, জানাজানি হয়ে যেতেও পারে।

'আমার কথা কী আর বলব। কিছুই প্রায় বলার নেই।' আদিত্য নিচু গলায় বলল। 'বি এস সির পরে আর পড়াশোনা হয়নি। বাবা মারা গেলেন, মা আমার ছোটবেলাতেই চলে গেছেন। আমার একটা ছোটখাট পৈতৃক ব্যাবসা আছে। অ্যাগ্রো ফার্ম। হুগলিতে কিছু জমি নিয়ে গরু-মোষ-হাঁস-মুরগি পালন করি, কিছু জমিতে চাষবাসও হয়। এখানে একটা জমি দেখতে এসেছিলাম। ব্যবসাটা একটু বাড়াবার ইচ্ছে আছে। রঘুনাথপুরের কাছে একটা জমি দেখেছি। পছন্দও হয়েছে। এখানে ফার্মটা হলে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগটাও থাকবে।'

'সংসার করেননি?' জয়ন্তী প্রশ্নটা করে হাসল। বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই সে প্রশ্নটা করবে ভাবছিল। এইসব ব্যাপারে মেয়েদের অসীম কৌতূহল।

'হয়ে ওঠেনি। আসলে একা থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন আর সংসার করার তাগিদটাও অনুভব করি না।' আদিত্য সত্যি কথাটাই বলল।

'পুরুলিয়ার চারপাশটা একটু ঘুরে দেখার সময় পেলেন? এদিকে কিন্তু অনেক কিছু দেখার আছে।' শ্রেয়সী প্রসঙ্গ বদলাল।

'কোথায় আর পেলাম? তবে এদিকে যদি ব্যবসা করতে আসি, অনেক সময় পাব ঘুরে দেখার।'

'জানেন তো এদিককার পলাশ ফুল খুব বিখ্যাত। অনেকে শুধু পলাশ দেখতেই পুরুলিয়ায় আসে। তবে এখন পলাশের সময় নয়।' সুরঞ্জনা বলল।

'পলাশের কথা আমিও শুনেছি। ভবিষ্যতে দেখার ইচ্ছে রইল। এবার জমি দেখতেই দুটো দিন কেটে গেল। আজ সকালে অবশ্য জমি দেখে ফেরার পথে এক পুরোনো বন্ধুর খোঁজে জয়চণ্ডী পাহাড়ের কাছে একটা ইস্কুলে গিয়েছিলাম। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল না, গিয়ে শুনলাম সে ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'জয়চণ্ডী পাহাড়ের কাছে স্কুল? কোন স্কুল? আপনার বন্ধুর নাম কী?' জয়ন্তীর গলায় তীব্র কৌতূহল।

'খুব একটা নাম করা ইস্কুল নয়। গরিব মেয়েদের ক্লাশ ফোর অব্দি পড়ার ব্যবস্থা। ইস্কুলের নাম নীপবীথি। আপনাদের নামটা শোনার কোনও কারণ নেই।'

'আপনার বন্ধুর নাম কী?' জয়ন্তী আদিত্যর কথাটা উপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন করল।

'আমার বন্ধুর নাম চন্দ্রলেখা সেন। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত।'

'চন্দ্রলেখা সেন আপনার বন্ধু?' জয়ন্তী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কেন আপনি চিনতেন নাকি চন্দ্রাকে?' আদিত্যর গলায় অবিশ্বাস।

'চিনতাম মানে? এই বাড়িতে চন্দ্রা আর আমি একসঙ্গে থাকতাম। এরা দুজন তখন আসেনি। চন্দ্রা চলে যাবার পর আমি নতুন রুমমেট খুঁজছিলাম। এরা সেই সময় কলেজে নতুন জয়েন করেছে। এদের বলতে এরা রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে এদের সঙ্গে আছি। এরা অবশ্য চন্দ্রাকে দেখেনি।' জয়ন্তী উত্তেজিত গলায় বলল।

আদিত্য ভাবছে এতটা সমাপতনও সম্ভব? চন্দ্রা যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়িতেই সে ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে! এরকম ঘটনা সিনেমাতেও ঘটে না। সে মুখে বলল, 'চন্দ্রার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। তবে এক সময় আমরা খুবই বন্ধু ছিলাম। আমি জানতাম এখানে এই ইস্কুলটাতে ও পড়ায়। ভেবেছিলাম হঠাৎ এসে ওকে একটা সারপ্রাইজ দেব। এসে শুনলাম ও হঠাৎ পুরুলিয়া ছেড়ে চলে গেছে। ওর সঙ্গে নাকি অভিজিৎ সিং বলে কোনও একজনের একটা রোমান্টিক সম্পর্ক হয়েছিল। সেই সম্পর্কটা কোনও কারণে ভেঙে যেতে ও আর পুরুলিয়ায় থাকতে চায়নি। নীপবীথি ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস এটাই বললেন।'

'মোটামুটি ঠিকই বলেছেন, তবে পুরোটা বলতে পারেননি। বলতে পারার কথাও নয়। কারণ পুরো ঘটনাটা বোধহয় আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। ব্যাপারটা আমি এদেরও বলিনি। তবে এতদিন পরে হয়ত বলা যেতে পারে।' জয়ন্তী ঘোষ একটু থেমে আবার শুরু করল।

'চন্দ্রার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার স্বামী। আমার স্বামী ছিল পুরুলিয়ায় একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ওই ব্যাঙ্কে আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল। সেই সূত্রে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমরা যখন ঠিক করলাম বিয়ে করব, তখন এই বাড়িটা ভাড়া করলাম। আমাদের দুজনের জন্যে একটু বড়, কিন্তু বাড়িটা এত পছন্দ হয়ে গেল যে ছাড়তে ইচ্ছে করল না। বিয়ের পর বছর দুয়েক আমরা এই বাড়িতে ছিলাম। তারপর ব্যাঙ্কের চাকরিতে যা হয়, আমার স্বামী শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে গেল। স্বামী চলে গেলে একা এতবড় বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি রুমমেট খুঁজছিলাম অথবা নতুন একটা থাকার জায়গা। এই সময় একদিন, তখনও আমার স্বামী পুরুলিয়াতেই আছে, নতুন অফিসে জয়েন করেনি, ও আমাকে চন্দ্রার কথা বলল। চন্দ্রা ওদের ব্রাঞ্চের একজন বড় ক্লায়েন্ট। একটা স্কুলে পড়ায়, কিন্তু মনে হয় সেটা নিতান্তই সখের। ওর অ্যাকাউন্টে যা টাকা আছে তার সুদের তুলনায় ওর স্কুলের মাইনেটা অতি নগন্য।'

সুরঞ্জনা আর শ্রেয়সীও খুব মন দিয়ে গল্পটা শুনছিল। সুরঞ্জনা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডেসার্টটা এবার সার্ভ করে দিই। খেতে খেতে গল্প শোনা যাক।'

আদিত্যর পেটে সত্যিই আর জায়গা ছিল না। কিন্তু সেকথা বলে নিস্তার নেই। তাছাড়া সে যখন দেখল ডেসার্টটা গুড়ের পায়েস, সে আর আপত্তি করল না। শুধু একটা প্রশ্ন মনে রয়ে গেল, এই অসময়ে গুড় আসে কোথা থেকে?

জয়ন্তী আবার বলতে শুরু করেছে। 'আমার স্বামী বলল, চন্দ্রা একটা ভাল বাড়ি খুঁজছে। এখন যাদের সঙ্গে আছে তাদের সঙ্গে ওর বনছে না। ওর যা আর্থিক অবস্থা তাতে ও অনায়াসে একা একটা বাড়ি নিয়ে থাকতে পারত। কিন্তু ও একা থাকতে চায় না। শিলিগুড়ি চলে যাবার আগে আমার স্বামী একদিন চন্দ্রাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এল। চন্দ্রাকে আমার বেশ ভাল লেগে গেল। আমার মনে হয় আমাকেও চন্দ্রার মন্দ লাগল না। মোটমাট আমার স্বামী শিলিগুড়ি চলে যাবার পর চন্দ্রা আর আমি একসঙ্গে এই বাড়িটাতে থাকতে লাগলাম।'

পায়েসটা যাকে বলে 'আউট অফ দিস ওয়ার্লড'। আদিত্য সেকথা সকলকে জানাতে শ্রেয়সী বলল, 'আন্দাজ করুন তো পায়েসটা কে করেছে?' আদিত্য দেখল জয়ন্তী, শ্রেয়সী আর সুরঞ্জনা তিনজনেই মিটিমিটি হাসছে।

আদিত্য তার গোয়েন্দাসুলভ ইন্ট্যুইশন খাটিয়ে বলল, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা জয়ন্তী করেছেন। এইরকম পায়েস করার জন্য অনেকদিনের অভিজ্ঞতা লাগে। সেটা এখানে একমাত্র জয়ন্তীরই আছে। কিন্তু সুরঞ্জনাই যখন উৎসাহ নিয়ে পায়েসটা সার্ভ করার কথা বললেন, তখন মনে হয় ওটা সুরঞ্জনাই করেছেন।'

'বাঃ, একদম ঠিক বলেছেন।' শ্রেয়সী হাততালি দিয়ে উঠল, 'আপনি অনায়াসে একজন ভাল ডিটেকটিভ হতে পারতেন।'

'চন্দ্রার গল্পের বাকিটা শোনা যাক।' আদিত্য প্রসঙ্গ পালটে বলল।

'চন্দ্রা আর আমি একসঙ্গে প্রায় তিন বছর ছিলাম।' জয়ন্তী আবার বলতে শুরু করেছে। 'আদিত্যবাবু আপনি কি জানেন চন্দ্রার কিছু নকশাল কানেকশন ছিল?'

'জানতাম। কলেজ থেকেই জানতাম ও নকশালদের সঙ্গে আছে। ঠিক বিপ্লব-টিপ্লব করত না। তবে বস্তিতে গিয়ে গরিব বাচ্চাদের পড়াত। মাঝে মাঝে কলেজে মাওবাদী লেকচার দিত।'

'এখানেও চন্দ্রা গরিব মেয়েদের পড়াত। একই সঙ্গে এখানকার মাওবাদী একটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ওই অভিজিৎ সিং লোকটা ছিল মাওবাদীদের নেতা। আমি অনেকবার চন্দ্রাকে লোকটার ব্যাপারে সাবধান করেছিলাম। ও খুব একটা শুনত না। তবে লোক মারা ব্যাপারটা চন্দ্রা পছন্দ করত না, তা সে জোতদারই হোক, আর পুলিশ বা মিলিটারি হোক। কিন্তু চন্দ্রার যে একটা বামপন্থী আইডিয়াল ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং সেই কারণেই সে পুরুলিয়াতে এসেছিল। তারপর সেই ঘটনাটা ঘটল।' জয়ন্তী একটু থামল।

'কী ঘটনা?' নিজের অজান্তেই আদিত্যর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

'মাওবাদীদের হাতে প্রায় পঁচিশ-তিরিশজন মিলিটারি জোয়ানের মৃত্যু হয়। তাদের ট্রাকটাও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ-নিয়ে এখানকার লোকাল মিডিয়ায় তোলপাড় হয়েছিল। ন্যাশানাল মিডিয়াও খবরটা বেশ বড় করে বার করেছিল। শোনা গেল অভিজিৎ সিং-এর দল এর পেছনে আছে।'

'চন্দ্রা কি আপনাকে বলেছিল এর পেছনে অভিজিৎ আর তার দল আছে?'

'খুব স্পষ্ট করে বলেনি। তবে তার কথা থেকে এটা বুঝেছিলাম যে এই ধরনের মাস কিলিং সে সমর্থন করে না। শুধু সমর্থন করে না বললে কম বলা হবে, রীতিমত ঘৃণা করে। আমার স্থির বিশ্বাস এই নিয়েই অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে চন্দ্রার তীব্র মতবিরোধ হয়, এবং সেই মতবিরোধের জেরে সে পুরুলিয়া থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পুরুলিয়ায় থাকলে চন্দ্রা মাওবাদীদের সংস্রব এড়াতে পারত না।'

'শুনলাম চন্দ্রা এখন বসিরহাটের একটা স্কুলে পড়ায়। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল। ফোনে নিয়মিত কথা হতো। কিন্তু ইদানীং কেন জানি না কিছুতেই চন্দ্রাকে ফোনে ধরতে পারছি না। খালি বলছে ফোনটা সুইচট অফ আছে। চন্দ্রাও নিজে থেকে অনেকদিন ফোন করেনি। ওর জন্যে মাঝে মাঝে চিন্তা হয়।'

রাত্তিরে হোটেলে ফিরতে ফিরতে আদিত্য ভাবছিল, পুরুলিয়ায় এসে তার মোটামুটি লাভই হয়েছে।

পরের দিন আদিত্যর কলকাতা ফেরার ট্রেনটা যখন খড়গপুর ঢুকছে, বিমল ফোন করল।

'স্যার, কমলিকা সেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দরোয়ানকে বললাম, তোমাদের এখানে সিকিউরিটির কাজ-টাজ কিছু খালি আছে? সে বলল, না কিচ্ছু খালি নেই। আর খালি থাকলেও এখানে সরাসরি লোক নেওয়া হয় না। একটা সিকিউরিটি কম্পানিকে বরাত দেওয়া আছে। তারাই লোক দেয়। বুঝলাম সব জায়গায় একই ব্যবস্থা। তবু দরোয়ানের সঙ্গে ভাব জমালাম। তাকে বিড়ি খাওয়ালাম। তার কাছ থেকে জানলাম, মেম সাহেবের পুরোনো ড্রাইভার ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। একজন বদলি লোক গাড়ি চালাচ্ছে। বদলি ড্রাইভারের ঠিকানাটা জোগাড় করেছি। চেতলায় থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করে ভাব জমাতে হবে। তাহলে মেমসাহেব কোথায় কোথায় যান জানা যাবে। আশা করছি, দুচার দিনের মধ্যে আপনাকে কিছু একটা জানাতে পারব। আজ তাহলে রাখি স্যার?'

মেসে ফিরে আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে চান করল। তারপর খাবার ঘরে গিয়ে খুব তৃপ্তি করে মাছের ঝোল ভাত খেল। কদিন খুব গুরুপাক খাওয়ার পর ঝোল-ভাত অমৃত লাগছে। সব থেকে বড় কথা ভানু ঠাকুর

ফিরে এসেছে। আর চিন্তা নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

বাড়ির নাম সেনবাটী। সেকেলে নাম। শুধু সেকেলে নয়, বাড়ির স্থান-মাহাত্ম্য, আয়তন বা স্থাপত্য আন্দাজে নামটা নেহাতই সাদামাটা। আদিত্য ভাবছিল, বাড়ির নামের সঙ্গে একটা প্যালেস বা ম্যানসন জাতীয় জমকালো কিছু জোড়া থাকলে আরও লাগসই হতো, কারণ সেনবাটীকে বাড়ি না বলে অনায়াসে প্রাসাদ বলা চলে।

গানের অনুষ্ঠান সন্ধে ছটায়। অমিতাভ আর রত্নার সঙ্গে পাঁচটা দশে সেনবাটী পৌঁছে গেল আদিত্য। পাঁচটা থেকে চায়ের নেমন্তন্ন। শুধু চায়ের নেমন্তন্ন নয়, উদীয়মান দুই শিল্পী, যাঁরা সেই সন্ধেবেলা গান-বাজনা শোনাবেন, তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আমন্ত্রণও ছিল।

বাড়ির মূল ফটক দিয়ে ঢুকে বেশ বড় একটা লন। লনের চারদিক দিয়ে রাস্তা। লনে কোথাও আগাছা নেই, বেমানানভাবে বেড়ে ওঠা ঘাস নেই। বাড়ির পেছন দিকে গাড়ি রাখার জায়গা। দরোয়ান একটা লম্বা সেলাম ঠুকে দেখিয়ে দিল গাড়ি থেকে কোথায় নামতে হবে আর তারপর ড্রাইভার কোথায় গাড়ি রাখবে। পুরোনো আমলের গাড়ি বারান্দার নিচে গাড়ি থেকে নামতে নামতে রত্না বলল, 'আমার এইসব জায়গায় আসতে একেবারে ইচ্ছে করে না। আমি তো গান-টান কিচ্ছু বুঝি না। দুতিন ঘন্টা বোকার মতো চুপচাপ বসে থাকতে হবে। কিন্তু কমলিকা সেন এত করে বললেন, না এলে খুব অভদ্রতা হতো।'

'এসে ভালই করলে। এরকম দুচারটে অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে দেখবে ক্লাসিকাল গান ভালো লাগতে শুরু করেছে।' অমিতাভ মৃদু হেসে বলল।

উত্তরে রত্না একটা মুখভঙ্গী করল যার নানারকম মানে হতে পারে। তারা তিনজন এখন মূল বাড়ির সদর দরজা দিয়ে একটা হলঘরে ঢুকেছে। সামনেই গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে, তাদের হাত তুলে নমস্কার করলেন। মুখে বললেন, 'আসুন, আসুন, অমিতাভ।' তারপর রত্নার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আসতে পেরেছেন, তাই খুব ভাল লাগছে। জানতাম, আমার কথা আপনি ফেলতে পারবেন না। পাশের ঘরে সামান্য চায়ের ব্যবস্থা করেছি। শিল্পীরাও ওখানে। ওদের সঙ্গে একটু কথা বললে ওদের খুব ভাল লাগবে।' কথাটা বলে তিনি আদিত্যর দিকে তাকালেন।

অমিতাভ বলল, 'ইনি আমার বন্ধু আদিত্য মজুমদার। এঁর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। আদিত্য একজন অত্যন্ত সমঝদার শ্রোতা।'

আদিত্য মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গী করল। কমলিকা সেন বললেন, 'আপনি এসেছেন বলে খুব ভাল লাগছে। আমি কিন্তু আপনার আসল পরিচয়টা আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আগেই জানতে পেরেছি।'

আদিত্য শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে যে গোয়েন্দাগিরি করে সেটা অমিতাভ এঁকে গল্প করতে গেল কেন?'

তার শঙ্কা দূর করে কমলিকা সেন বললেন, 'অমিতাভ আমাকে বলেছে, আপনি অসিতবর্ণ মজুমদারের ছেলে। আমরা যারা গানবাজনার সঙ্গে অল্পস্বল্প যুক্ত, আমরা তো জানি, অসিতবাবুর মতো বোদ্ধা, সঙ্গীতরসিক কলকাতায় খুব বেশি জন্মাননি। পুরোনো লোকেরা ওঁর বাড়ির বৈঠকগুলোর কথা এখনও বলেন। অসিতবাবুর ছেলে আমার বাড়িতে গান শুনতে এসেছেন বলে আমি ধন্য বোধ করছি।'

আদিত্যর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। একই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে সে হঠাৎ খুব আবেগী হয়ে পড়ল। আসলে কেউ তার বাবার কথা বললে সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সে বলল, 'আপনারা আমার বাবাকে মনে রেখেছেন এটা আমার কাছে যে কত বড় ব্যাপার বলে বোঝাতে পারব না।'

আরও অনেক অতিথি সদর দরজা দিয়ে ঢুকছেন। সে দিকে তাকিয়ে কমলিকা সেন বললেন, 'আপনারা পাশের ঘরে গিয়ে চা-টা খান, আমি একটু ওদিকটা সামলাই।' বলতে বলতে কমলিকা সেন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

হলঘরেই গানবাজনার ব্যবস্থা। জাজিমের ওপর সাদা চাদর পাতা রয়েছে। একেবারে সামনে পুরু গদি দিয়ে মঞ্চ। ঘরটা বেশ বড়, জনা পঞ্চাশ অনায়াসে বসতে পারে। পাশের ঘরে যাবার জন্য আগেকার দিনের মস্ত দরজা। যাবার রাস্তাটা পাতা চাদরের পাশ দিয়ে। সেখানে দাবার বোর্ডের মতো সাদা-কালো মার্বেলের মেঝের কিছুটা উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে।

'তোর পিতৃপরিচয়টা কিন্তু ভদ্রমহিলা আগেই জানতেন। আমাকে কিছু বলতে হয়নি। আমি ফোন করতে উনি নিজে থেকেই বললেন, শুনেছি অসিত মজুমদারের ছেলে আপনার খুব বন্ধু। ওঁকে যদি নিয়ে আসেন, খুব ভাল লাগবে। কোথা থেকে জেনেছে কে জানে। যাই হোক, এখানে তুই বেশ খাতির পাবি। ফলে তোর কাজেরও সুবিধে হবে।' অমিতাভ পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল।

পাশের ঘরে কিছুটা ভিড়। জনা কুড়ি-পঁচিশ নারী পুরুষ নিচু গলায় কথাবার্তা বলছে, চা-স্যান্ডউইচ-কাবাব-সন্দেশ খাচ্ছে। আদিত্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, সকলেই তার অচেনা। সে ভেবেছিল, অন্তত দুএকজন চেনা বেরিয়ে পড়বে। হিন্দুস্তানি মার্গসঙ্গীত যারা নিয়মিত শোনে তারা অনেকেই আদিত্যর মুখচেনা, কারও কারও সঙ্গে পরিচয়ও আছে। এদের কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বেশির ভাগই কর্পোরেট জগতের লোক। কিংবা নাম করা উকিল বা ডাক্তার। ইংরেজি করে এক কথায় বললে সোশালাইট, সমাজের উঁচুতলার মানুষ। কোনও অভিজাত ক্লাবের জলসায় এই ধরনের মানুষদের খুব দেখা যায়। এরা গান-টান খুব একটা বোঝে বলে মনে হয় না। তবে বোঝার ভান করে।

প্লেটে স্যান্ডউইচ তুলতে তুলতে আদিত্য রত্নাকে বলল, 'তুই এখানে কাউকে চিনিস নাকি?'

'নাঃ। শুধু ওই কোণে যে লাল শাড়ি পরা সাদা চুলের মহিলাকে দেখছিস, উনি কিছুদিন আগে মাঝে মাঝেই আমার কলেজে চলে আসতেন। আবদার, ওঁর নাতনিকে ভর্তি করতে হবে, যদিও নাতনির রেজাল্ট পাতে দেবার মতো নয়। এখন মনে হয় ভদ্রমহিলা আমাকে দেখেও চিনবেন না। কারণ ওঁর নাতনিকে আমরা নিতে পারিনি।'

অমিতাভ দু-একজনের সঙ্গে কথা বলছে। নিশ্চয় চেনা। আদিত্য লক্ষ করল, কমলিকা সেন ঘরে ঢুকেছেন। সঙ্গে একজন আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধ। এই জমায়েতে নিতান্তই বেমানান। বৃদ্ধর চেহারাটা আদিত্যর ভীষণ পরিচিত লাগছে। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে। কমলিকা সেন আদিত্যর কাছে এগিয়ে এলেন। আদিত্যকে দেখিয়ে বৃদ্ধকে বললেন, 'চিনতে পারছ?'

বৃদ্ধ চিনতে পারুন না পারুন আদিত্য বৃদ্ধকে চিনতে পেরেছে। তারাপদ গাঙ্গুলি। গান পাগল মানুষ। বাবার বন্ধু, তবে বাবার থেকে অনেকটা ছোট। আদিত্য দুপা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তারাপদকাকা আমি আদিত্য, অসিত মজুমদারের ছেলে।'

কমলিকা সেন অমিতাভ-রত্নার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি আমার ছোটকাকা, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, আদিত্যবাবুর বাবার বন্ধু।'

গান হল নেহাতই সাদামাটা। একটি বছর পঁচিশের মেয়ে শুদ্ধ কল্যাণ গাইল, তারপর একটা ঠুংরি। এমনিতে শুদ্ধ কল্যাণ আদিত্যর ভীষণ প্রিয় রাগ, কিন্তু এই মেয়েটা এখনও সুরের গভীরে ঢুকতেই শেখেনি। গানের পর সেতার, বাগেশ্রী। এবার বছর তিরিশের এক যুবক। সুরের বিস্তার বিশেষ করল না, সাত-তাড়াতাড়ি গতে পৌঁছে কালোয়াতি দেখাতে লাগল। কত তাড়াতাড়ি সে তান করতে পারে দেখাতে গিয়ে বেশ কয়েকবার বেসুরো হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে তবলাটাও কান ফাটিয়ে বাজছিল। আদিত্যর শুনতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল।

আসর ভাঙল সাড়ে আটটায়। কমলিকা সেন আদিত্যদের কাছে এসে বললেন, 'আপনারা একটু দাঁড়াবেন? কথা ছিল।'

একটু পরে অতিথিদের বিদায় করে দিয়ে কমলিকা তার কাকাকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন। বললেন, ছোটকাকা আমার বাড়িতে আজ রাত্রে খেতে রাজি হয়েছেন। আপনারাও যদি আজ রাত্তিরে এখানে সামান্য ডিনার করে যান আমার খুব ভাল লাগবে। ছোটকাকাকে আমি আদিত্যবাবুর কথা বলেছিলাম। ছোটকাকার খুব ইচ্ছে আদিত্যবাবুর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর।'

'আসলে, আমাদের আর একটা জায়গায় ডিনারের নেমন্তন্ন আছে।' রত্না বিনীতভাবে বলল।

আদিত্য বুঝল রত্না গুল মারছে। কমলিকা সেনও সেটা বুঝলেন কিনা কে জানে, হয়ত বুঝলেন। মুখে বললেন, 'তাহলে তো আপনাদের আমি আটকাতে পারি না, কিন্তু আদিত্যবাবুরও কি নেমন্তন্ন আছে?'

রত্না তাড়াতাড়ি বলল, না, না আদিত্যর নেমন্তন্ন নেই, ও থেকে যেতেই পারে। তবে থেকে গেলে ওকে একা একা বাড়ি ফিরতে হবে।'

'সেটা কোনও সমস্যা হবে না। আমার গাড়ি তো ছোটকাকাকে বাগবাজারে নামাতেই যাবে। পথে কোথাও আদিত্যবাবুকে নামিয়ে দেবেখ'ন। আদিত্যবাবু আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমহার্স্ট স্ট্রিট।' আদিত্য কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'তাহলে তো আপনার বাড়ি বাগবাজার যাবার পথেই পড়বে।'

নৈশভোজনের মান গানের আসরের মতো খেলো নয়। বস্তুত, প্রতিটি আইটেমে বনেদি বাড়ির খানসামা-বাবুর্চির ছোঁয়াটা আদিত্য পরিষ্কার টের পাচ্ছিল। ভোজনের শেষে একটি পান মুখে দিয়ে তারাপদ গাঙ্গুলি বললেন, 'খাওয়াটা তো জব্বর হল, কিন্তু গান শুনে মন ভরল না। এরা তো এখনও গান বাজনা শিখেই উঠতে পারেনি। কোন সাহসে আসরে বসে এতগুলো লোকের সময় নষ্ট করে?'

'আসলে ম্যাকনীল-ম্যাকফারসনের মন্টু রায় এদের কথা বললেন। উনি অবশ্য আজ আসতে পারেননি। মেয়েটি ওঁর ভাইজি হয়। ছেলেটি আবার মেয়েটির বন্ধু।' কমলিকা সেন খানিকটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতে বললেন।

'মন্টু রায় কে আমি জানি না। জানতে চাইও না। আর তার ভাইজি বা তার বন্ধুর সম্বন্ধে তো যত কম জানা যায় ততই ভাল। আমি তো মাঝে মাঝে বুঝতেই পারছিলাম না মেয়েটা শুদ্ধ কল্যাণ গাইছে না ভূপালি গাইছে। যাই হোক, একটা কথা বলতে পারি। আমাদের অসিতদা হলে মাঝপথে উঠে যেতেন। সঙ্গীত নিয়ে কোনও ছ্যাবলামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না।'

এরপর আড্ডাটা বেশ কিছুক্ষণের জন্য অসিত মজুমদারের দিকে ঘুরে গেল। কোন কোন ওস্তাদ কবে কবে অসিত মজুমদারের আলিপুরের বাড়িতে গান গেয়েছিলেন তার পুরো ইতিহাস তারাপদ গাঙ্গুলির কণ্ঠস্থ। সেসব ওস্তাদদের বিচিত্র স্বভাব, খেয়াল, চরিত্র নিয়েও অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলল। আদিত্যরও অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে সে খেয়াল করল, একটু একটু করে সে-ও আলোচনায় ঢুকে পড়েছে।

তারাপদ গাঙ্গুলি বাথরুমে যাবার জন্য উঠলেন। আদিত্য কমলিকা সেনকে বলল, 'আমি কিন্তু এই বাড়িতে আগে কয়েকবার এসেছি। চন্দ্রা কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। আমরা কাছাকাছি থাকতাম বলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতাম।'

'চন্দ্রা আপনার বন্ধু ছিল?' কমলিকা সেনের মুখে বিরাট বিস্ময়। 'আপনি আগে বলেননি তো?'

'বলার সুযোগ পাইনি। আপনি কি জানেন চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'আগে জানতাম না। সদ্য জেনেছি। আমার লইয়ার আমাকে জানিয়েছেন। চন্দ্রা এ-বাড়ির সঙ্গে তো কোনও সম্পর্কই রাখত না। জানব কী করে?' কমলিকা সেনের গলাটা বেশ কঠিন শোনাল। 'আপনি জানেন নাকি সে কোথায় আছে?'

'জানি না, তবে জানবার চেষ্টা করছি। চন্দ্রা যাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে সে-ও আমাদের ক্লাশমেট। সে-ই আমাকে চন্দ্রার খোঁজ নিতে বলেছে।'

'চন্দ্রা বিয়ে করবে? কাকে বিয়ে করবে?' কমলিকা সেন যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'সে-ই ছেলেটি নয়ত যে চন্দ্রাকে এখানে রেখে অ্যামেরিকা চলে গিয়েছিল?'

'সেই ছেলেটিই। সে পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে আসছে। চন্দ্রা ঠিক করেছে তাকেই বিয়ে করবে।'

'চন্দ্রা কোথায় থাকতে পারে? আপনি খোঁজ-খবর নিয়ে কতটা জানতে পারলেন?'

'এখনও খুব বেশি জানতে পারিনি। কিছু জানতে পারলে নিশ্চয় আপনাকে জানাব।'

তারাপদ গাঙ্গুলি বাথরুম থেকে ফিরে এসেছেন। এসে বোধহয় টের পেয়েছেন কোনও কারণে ঘরের আবহাওয়াটা ভারি হয়ে উঠেছে।

'কী হল? কী ব্যাপার?' তারাপদ গাঙ্গুলির গলাটা খানিকটা উদ্বিগ্ন শোনাল।

তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কমলিকা সেন আদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চন্দ্রা কবে বিয়ে করবে ঠিক করেছে আপনি জানেন?'

'আপনাকে কিছু বলেনি?' আদিত্য উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল।

'না, আমাকে কিছু বলেনি। চন্দ্রার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল তিন-চার মাস আগে। তখন অন্তত কিছু বলেনি।'

'কী নিয়ে তাহলে তখন আপনাদের কথা হয়েছিল?'

'দেখুন এটা সকলেই জানে যে চন্দ্রার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল না। শেষ দেখা হয়েছিল এই বাড়িতেই। আমি একটা আলোচনার জন্য চন্দ্রাকে আসতে বলেছিলাম।'

'কী নিয়ে আলোচনা বলা যাবে কী? যদি না অবশ্য খুব গোপনীয় কিছু হয়।'

'আলোচনা এই বাড়িটা বিক্রি করা নিয়ে। চন্দ্রার সঙ্গে আমার সেদিন তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। আমাদের কাজের লোক, রান্নার লোক সকলেই সেটা শুনেছিল। তাছাড়া নবীন সরাফ বলে একজন রিয়াল এস্টেট প্রোমোটারও সেদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ব্যাপারটা মোটেই আর গোপনীয় নেই।'

'কী নিয়ে আপনাদের ঝগড়া হয়েছিল?'

'চন্দ্রা এই প্রপার্টিটা প্রোমোটিং-এ দিতে চায় না, আমি চাই। এই নিয়েই আমাদের মতবিরোধ। আমাদের দুজনের অংশ অবশ্য ভাগ করা আছে। আমার ভাগে পুব দিকটা পড়েছে, পশ্চিম দিকটা চন্দ্রার ভাগে। আমি চাইলে আমার অংশটা বিক্রি করে দিতে পারি। কিন্তু পুরো প্রপার্টিটা একসঙ্গে বিক্রি করতে পারলে অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে। প্রোমোটার তাই বলছে। কিন্তু চন্দ্রা কিছুতেই তার অংশটা বিক্রি করতে রাজি নয়।'

'বেশ রাত হয়ে গেছে। আমাকে ফিরতে হবে।' তারাপদ গাঙ্গুলি একটু বিরক্ত গলায় বললেন। 'তুই আমাকে একটা গাড়ি করে পৌঁছে দিবি বলেছিলি না?' শেষ প্রশ্নটা কমলিকাকে।

'হ্যাঁ, বেশ রাত হয়েছে। আমি ড্রাইভারকে ডাকছি। আদিত্যবাবু তোমার সঙ্গে ফিরবেন।'

'আদিত্য আমার সঙ্গে ফিরবে? সে তো অতি উত্তম কথা।' তারাপদ গাঙ্গুলির মুখটা উজ্জ্বল দেখাল।

বেরনোর সময় কমলিকা সেন বললেন, 'যদি চন্দ্রা কোথায় আছে জানতে পারেন, আমাকে প্লিজ একটু জানাবেন।'

'অবশ্যই জানাব।'

ফেরার পথে তারাপদ গাঙ্গুলির সঙ্গে আরও অনেক কথা হল আদিত্যর। তার মধ্যে একটা কথায় আদিত্যর খটকা লাগছে।

তারাপদ গাঙ্গুলি বললেন, 'আমার ভাইজি আমাকে আগে কখনও তার বাড়িতে ডাকেনি। এত খারাপ গান শোনানোর জন্যে আজ হঠাৎ কেন ডাকল, বুঝতে পারছি না।'

দুপুরে আদিত্য তার আপিসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, এমন সময় দরজায় টোকা। খুলে দেখে নূপুর মণ্ডল। সঙ্গে একটা চাকা লাগানো সুটকেস।

'তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে ফোন করিনি। কাল রাত্তিরে কলকাতায় এসেছি। বাড়িভাড়া দেবার ছিল। টুকিটাকি আরও দুএকটা কাজ। আজ সন্ধের ট্রেনে আবার বসিরহাট ফিরে যাব। তোমাকে কিছু কিছু জিনিস রিপোর্ট করার আছে।' নূপুর চেয়ারে বসে সুটকেসটা পায়ের কাছে রাখল।

'সব শুনব। আগে স্থির হয়ে বোসো। কফি খাবে তো?' আদিত্য কফি বানানোর জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কিছু খাওয়াবে আদিত্যদা? সকাল থেকেই কিছু খাওয়া হয়নি।'

'আরে, আগে বলবে তো? দাঁড়াও দেখি কী আনানো যায়। আগে খেয়ে নাও তারপর কফি বানাব।'

আধঘন্টা পরে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে, কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে নূপুর বলতে শুরু করল।

'স্কুলের নাম বনবীথি, জায়গাটা ইছামতি নদীর খুব কাছে। এখানেই চন্দ্রলেখা সেন পড়াত, থাকতও। স্কুলটাতে আশেপাশের গ্রাম থেকে গরিব মেয়েরা পড়তে আসে। ক্লাশ ফোর অব্দি পড়ানো হয়। চন্দ্রলেখা সেনকে এখানকার ছাত্রীরা মেমদিদি বলে, তার ফরসা রঙের জন্যে নিশ্চয়।'

'তুমি ইস্কুলে কোন পরিচয়ে ঢুকলে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমি বড়দিদি, মানে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে বললাম, শুনেছি এখানকার একজন দিদিমনি বেশ কিছুদিন ধরে আসছেন না। আমি কি তার জায়গায় চাকরি পেতে পারি? বড়দিদি একটু ইতস্তত করে কাকে যেন ফোন করলেন। পরে শুনলাম, উনি রণবীর রায়কে ফোন করেছিলেন। যে এন জি ও ইস্কুলটা চালায় রণবীর রায় তার মালিক। তারপর ফোন রেখে আমাকে বললেন উনি আমাকে টেম্পোরারি কাজ দিতে রাজি আছেন তবে চন্দ্রা সেন ফিরে এলে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। ওখানে আমার এক সপ্তাহ চাকরি করা হয়ে গেল।'

'থাকছ কোথায়?'

'থাকার জায়গা নিয়ে প্রথম দিকে খুব অসুবিধে হয়েছিল। প্রথম দুটো দিন বসিরহাটের একটা হোটেল থেকে যাতায়াত করলাম। তারপর গৌরবাবু স্কুলের সামনেই একটা থাকার জায়গা জোগাড় করে দিলেন। একটাই ঘর, কিন্তু সঙ্গে একটা নিজস্ব বাথরুম আছে আর এক চিলতে বারান্দা। রান্নাবান্না ওই বারান্দায়। একটা স্টোভ কিনেছি।'

'গৌরবাবু কে?'

'ও হো। সেটাই তো বলতে ভুলে গেছি। গৌরবাবু, মানে গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কুলের ক্লার্ক। নিপাট ভালোমানুষ। খুব হেল্পফুল। ওঁর কথায় পরে ভাল করে আসছি।'

'চন্দ্রার ওখানে কোনও শত্রু-টত্রু ছিল?'

'একেবারেই নয়। ছাত্রীরা তো বটেই, দিদিমনিরাও সকলে চন্দ্রা সেনকে ভালবাসে। ও হঠাৎ এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ায় সবাই অবাক এবং চিন্তিত। তবে উধাও হয়ে যাবার আগে দু-দুবার চন্দ্রার ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল। কপাল জোরে বেঁচে গেছে।'

'ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট? খুলে বলবে?'

'অ্যাক্সিডেন্ট না বলে ঘটনাই বলা উচিত বোধহয়। প্রথম ঘটনাটা ঘটে পুজোর মাস খানেক আগে। এক্স্যাক্ট তারিখটা কারও মনে নেই। তবে ঘটনাটা সকলের মনে আছে। চন্দ্রা সেন যে বাড়িটায় থাকত সেটা বেশ বড় আর পুরোনো একটা বাড়ি। এক সময় ওই অঞ্চলের এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি ছিল ওটা। বাড়িটা করেছিলেন বর্তমান মালিকের ঠাকুর্দা। মালিক তার পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকেন। মালিকের বাবা-মা বাড়িটায় থাকতেন, তাঁরা দুজনেই মারা গেছেন। বাড়িটা তেমন যত্ন পায় না। ভাড়াটের অভাবে বেশ কিছুদিন ফাঁকাই পড়েছিল, ওই পাড়াগাঁয় কে আর অত বড় বাড়ি ভাড়া করবে? সে যাই হোক, চন্দ্রা সেন পুরো বাড়িটাই ভাড়া করেছিল। তবে কয়েকটা ঘর বন্ধই পড়ে থাকত। দোতলার একটা বড় ঘর শোবার ঘর

হিসেবে ব্যবহার করা হতো আর একতলায় একটা ঘর বসার ঘর হিসেবে। তাছাড়া বাড়ির পেছন দিকে ছিল রান্নাঘর, কাজের মাসির থাকার ঘর। আমি, ভাড়া করতে পারি এই অজুহাতে, বাড়িটা ঘুরে দেখে নিয়েছি। পাশের বাড়িতে এই বাড়িটার একটা চাবি ছিল, বাড়ির মালিকই রেখে গেছে, আমি গিয়ে চাইতে বাড়িটা ঘুরে দেখিয়ে দিল।'

নূপুর মণ্ডল একটু থেমে কফির কাপে একটা চুমুক দিল। আদিত্য উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিয়েছে। মতলব, একটা সিগারেট খাবে। কালীপুজো এসে গেল বলে, বউবাজারের ঘড়ির দোকানগুলোতে দেওয়ালির সেল-এর বড় বড় বিজ্ঞাপন ঝুলছে। আদিত্য সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ জানলার বাইরে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর টেবিলে ফিরে এসে জ্বলন্ত আধখানা সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে বলল, 'তারপর?'

'ঘটনাটা ঘটে রাত্তিরবেলায়। রাত্তির তখন আড়াইটে-তিনটে হবে। চন্দ্রা সেন বাথরুমে যাবার জন্য উঠেছিলেন। দোতলায় তার শোবার ঘরের পাশেই বাথরুম। বাথরুমের আলো জ্বেলে কয়েক পা এগোতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ফুট তিনেক লম্বা একটা সাপ দেয়াল থেকে মেঝেতে নেমে আসছে। একেবারে জাত সাপ, মিশকালো কেউটে। কামড়ালে অবধারিত মৃত্যু। সেই রাত্তিরে নেহাত কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন চন্দ্রা সেন। ঘুম চোখে আর একটু হলেই সাপটাকে মাড়িয়ে দিচ্ছিলেন।'

'তারপর কী হল?'

'চন্দ্রা সেনের নার্ভের জোর আছে। অন্য কেউ হলে হয়ত ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত। চন্দ্রা সেন ঠাণ্ডা মাথায় এক পা এক পা করে পিছু হটে বাথরুমের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর উল্টোদিকের বাড়ির একতলায়, যেখানে গৌরবাবু থাকেন, সেখানে গিয়ে কড়া নাড়লেন। গৌরবাবু উঠে স্কুলের দরোয়ান সফিকুলকে জাগাল। সে স্কুলের মেন গেটের ধারে একটা ঘরে রাত্তিরে ঘুমোয়। সফিকুল আরও কয়েকজনকে নিয়ে লাঠিসোটা হাতে চন্দ্রা সেনের বাথরুমে ঢুকে দ্যাখে সাপটা তখনও সেখানেই রয়েছে। সবাই মিলে সাপটাকে পিটিয়ে মারল।'

'ওসব অঞ্চলে কি সাপের খুব উপদ্রব?'

'এটাই আশ্চর্য ব্যাপার যে ওই অঞ্চলে ওই রকম কালো কেউটে সাপ আগে কেউ দ্যাখেনি। সবাই বলল, নদীর ধারে কিছু সাপ আছে। কিন্তু তারা জলের সাপ, তেমন বিষাক্ত নয়। কেউ কেউ বলল, এটা বাস্তুসাপ, এই বাড়িতেই থাকত। বাস্তুসাপ কখনও কারও ক্ষতি করে না। একে মারাটা অন্যায় হয়েছে। বন বিভাগের লোকেরাও নাকি এসেছিল। তারা বলছে, ঠিক সময় খবর পেলে তারা এসে সাপটাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেত। আবার কেউ বলছে, এই সাপটার নাকি একটা জোড়া থাকবে। সে এবার এসে বদলা নিতে পারে। অনেকে চন্দ্রা সেনকে ওই বাড়িটা ছেড়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু চন্দ্রা সেনের ভীষণ জেদ। সে ওই বাড়িতেই থেকে গেল।'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দ্বিতীয় ঘটনা আরম্ভ হবার আগে আর একবার কফি হোক।'

'চা হলে আর একটু ভাল হতো।' নূপুর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'বেশ তো, চা-ই হোক।' আদিত্য ইলেকট্রিক কেটলিতে জল বসিয়ে আবার জানলার ধারে গিয়ে রাস্তা দেখছে এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠল। পার্থ সান্যালের ফোন, অ্যামেরিকা থেকে করছে।

'বল, কেমন আছিস?' ফোন ধরে আদিত্য বলল।

'আমি তো একরকম আছি। ওদিকে তোর কাজ কিছু এগোল?' ওপার থেকে পার্থর গলায় কিছু উৎকণ্ঠা রয়েছে।

'এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনছি। আশা করছি আর কয়েকদিনের মধ্যে চন্দ্রাকে খুঁজে বার করে ফেলব।'

'তার মানে তুই মনে করছিস চন্দ্রা এখনও জীবিত আছে?' পার্থ খানিকটা আকুল হয়ে বলল।

'আমার স্থির বিশ্বাস চন্দ্রা বেঁচে আছে। কোনও কারণে লুকিয়ে রয়েছে। সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবে।'

'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। শোন, যে-কারণে তোকে ফোন করছি। আমার জাপানে একটা কাজ আছে। কলকাতা হয়ে যাব। পরশু দুপুরে কলকাতা পৌঁছচ্ছি। রাত্তিরটা থাকছি। ওই আগের হোটেলটা, যেখানে তুই একবার আমার সঙ্গে দেখা করেছিলি, এবার সেখানে থাকছি না। এবারের এই হোটেলটার ডিরেকশন পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটাও বলছে এয়ারপোর্টের কাছে। তুই পরশু রবিবার সন্ধে ছটা নাগাদ একবার আসতে পারবি? এলে ভাল করে কথাবার্তা হবে।'

'অবশ্যই পারব।'

'তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে। আজ রাখছি। কিছু গোছগাছ বাকি আছে।'

আদিত্য মোবাইলটা টেবিলে রাখতে রাখতে দেখল নূপুর ইতিমধ্যে দুকাপ চা করে ফেলেছে। আদিত্যর ফোনে কথা বলা শেষ হতেই নূপুর আবার বলতে শুরু করল।

'দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল প্রথম ঘটনা ঘটার সপ্তাহ দুয়েক পরে। এক্ষেত্রেও সঠিক তারিখটা কেউ বলতে পারল না। তবে ঘটনাটা যে পুজোর ঠিক আগে ঘটেছিল এটা অনেকেই বলেছে। তোমার নিশ্চয় মনে আছে এবার সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পুজোর ঠিক আগে একটা অসহ্য গুমোট গরম পড়েছিল। যার ফলে পুজোর সময় অত বৃষ্টি হল। এই গুমোট গরমটাই দ্বিতীয়বার চন্দ্রা সেনকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কেমন করে সেটা বলি।'

নূপুর তার চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল। আদিত্য আবার সিগারেট ধরিয়েছে। এবার নিজের চেয়ারে বসে।

'চন্দ্রা সেনের শোবার ঘরের পাখাটা কিছুদিন ধরেই একটু গণ্ডগোল করছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আস্তে হয়ে যায়। একটা ঝুলঝাড়ু দিয়ে ধাক্কা দিলে আবার ঠিকমতো চলতে শুরু করে। চন্দ্রা রোজই ভাবে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে সারিয়ে নেবে, কিন্তু গ্রামে একজনই ইলেকট্রিকের কাজ জানে। সে কিছুদিনের জন্যে গ্রামের বাইরে কোথাও গেছে। তুমি ভাবছ আমি এত কথা জানলাম কী করে? চন্দ্রা এইসব কথা গৌরবাবুকে গল্প করেছিল। আমি গৌরবাবুর কাছ থেকে জেনেছি।'

'তারপর?' গল্পটা আদিত্যর রীতিমত ইন্টারেস্টিং লাগছিল।

'তারপর একদিন মাঝরাত্তিরে পাখাটা ভেঙে পড়ল। ভেঙে পড়ার ঠিক আগে পাখাটা দুএক মিনিটের জন্য থেমে গিয়েছিল। প্রচণ্ড গুমোট ছিল বলে পাখা বন্ধ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রা সেনের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে দ্যাখে পাখাটা থেমে গেছে। আর তার পর মুহূর্তেই চন্দ্রা সেন দেখল পাখাটা খুলে নিচের দিকে নেমে আসছে। চন্দ্রা সেনের রিফ্লেক্স মনে হয় চমৎকার। সে এক নিমেষে বিছানা থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে খাটের ওপর ভেঙে পড়ল পাখাটা। পুরোনো দিনের ভারি সিলিং ফ্যান। চন্দ্রা সেন ঠিক সময়ে সরে না আসতে পারলে পাখাটা তার মাথার ওপর এসে পড়ত, এবং কোনও সন্দেহই নেই যে সে মারা যেত। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে চন্দ্রা সেন নিখোঁজ হয়ে যায়।'

আদিত্য গভীরভাবে ভাবছিল। সন্দেহ নেই, কেউ বা কেউ কেউ চন্দ্রাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। দুবার চন্দ্রা নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। তৃতীয়বার কি তাহলে এরা সফল হল? যদি তাই হয়, চন্দ্রার বডিটা গেল কোথায়? ইছামতি নদীর কথা প্রথমেই মনে হয়। কিন্তু বডি ইছামতিতে ভাসিয়ে দিলে এতদিনে ভেসে উঠত। অবশ্য যদি পাথর-টাথর বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে অন্য কথা। নাকি চন্দ্রা তার আততায়ীদের ভয়ে নিজেই কোথাও লুকিয়ে আছে? আদিত্যর মন বলছে চন্দ্রা বেঁচে আছে।

আদিত্য একটু অন্যমনস্কভাবে নূপুরকে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানকার লোকগুলোকে কেমন দেখলে?'

'খুব বেশি দিন তো দেখার সুযোগ পাইনি। ওপর ওপর দেখে মনে হল স্বাভাবিক মানুষ যেমন হয়, এরাও তেমন। হেড মিস্ট্রেস বয়স্ক গম্ভীর মানুষ, বহুদিন এই ইস্কুলে আছেন। ইস্কুলকে ভালবাসেন। একজন সেলাই দিদিমনি আছেন, দুস্থ মহিলা, কারও সাতে পাঁচে থাকেন না, ভিতু প্রকৃতির, সকলের মতে মত দিয়ে চলেন। আর একজন দিদিমনি আছেন যাকে সবাই ছোড়দিদি বলেন। বেশ মুখরা। একমাত্র হেড মিস্ট্রেসকে একটু

মান্য করেন। এছাড়া আছে সিকিউরিটি গার্ড সফিকুলদা, দেখে মনে হয় তার বয়েস চৌষট্টি-পঁয়ষট্টির কম হবে না। কিন্তু এখনও শরীরে বেশ শক্তি ধরে। আর গৌরবাবু, স্কুলের ক্লার্ক, যার কথা আগেই বলেছি, কিন্তু আর একটু ভাল করে বলা দরকার।'

নূপুর একটু থামল। পায়ের কাছে রাখা সুটকেসের ফ্ল্যাপ থেকে বোতল বার করে কয়েক ঢোঁক জল খেল। তারপর আবার বলতে লাগল।

'গৌরবাবু ভীষণ সুদিং একটি চরিত্র। মৃদুভাষী। গলা তুলে কথা বলতেই পারে না। তাছাড়া খুব হেল্পফুল। এক কথায় চমৎকার একজন মানুষ। ইস্কুলের সামনেই থাকেন। বাচ্চাদের সঙ্গে তার বেজায় ভাব। ইস্কুল ছুটির পর অনেক বাচ্চাই ওর কাছে গল্প শুনতে যায়। উনি তাদের মুড়ি-বাতাসা খাওয়ান। ওঁর আর্থিক অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়। তবু তার মধ্যেই ভাল রেজাল্ট করলে নিজের পয়সায় বাচ্চাদের প্রাইজ দেন। ক্লাশ থ্রিতে একটা, ক্লাশ ফোরে একটা। ওঁর চরিত্রের একটা অদ্ভুত দিকও আছে। উনি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, উনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন বনবীথি ইস্কুলে ভূত আছে। উনি নাকি তাদের নিজের চোখে দেখেছেন। মিশকালো, তালগাছের মতো লম্বা। রাত্তিরে বাথরুমের জন্যে উঠতে হলে উনি নাকি তাদের দেখা পান। উনি বিশ্বাস করেন চন্দ্রা সেনের অ্যাক্সিডেন্টগুলো তেনাদেরই ঘটানো। অবশ্য শুধু উনি নন ইস্কুলের বেশির ভাগ মেয়েই বিশ্বাস করে এখানে ভূত আছে। যা শুনলাম, চন্দ্রা সেনের সঙ্গে গৌরবাবুর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। এক তো দুজনে কাছাকাছি বাড়িতে থাকতেন। তাছাড়া চন্দ্রা সেন, মনে হয়, গৌরবাবুর সারল্যটা পছন্দ করতেন। চন্দ্রা সেনের অ্যাক্সিডেন্টের গল্পগুলো গৌরবাবুর কাছেই জানলাম। সব মিলিয়ে আমি বলব, গৌরবাবু সরল, সাদাসিধে একজন গ্রাম্য মানুষ।'

নূপুর থামল। টেবিলের ওপরে রাখা জলের বোতলটা থেকে আবার জল খেল। বলল, 'আমি এবার উঠব আদিত্যদা। ট্রেন ধরার আগে দুএকটা কেনাকাটা আছে।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'শোনো নূপুর। তুমি আজ বনবীথি ফিরে যাচ্ছ, যাও। আমি খুব শিগগির ওখানে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দেব। আর কোনও ইন্সট্রাকশন থাকলে সেটাও জানিয়ে দেব। এসো তাহলে।'

নূপুর বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে আদিত্যর ফোনটা আবার বেজে উঠেছে। কেয়া বাগচি।

'খুব দরকার। একদিন দেখা করা যাবে?'

'কবে দেখা করতে চান?'

'সামনের সোমবার কলেজ স্ট্রিট যেতে হবে স্কুলের বই কেনার জন্যে। সেদিন দেখা করা যাবে?'

'কটায় বলুন?'

'আমার সাড়ে চারটের মধ্যে বই কেনা হয়ে যাবে। তাহলে সাড়ে চারটেতে আপনার জন্যে কফি হাউসে অপেক্ষা করব।'

'চলবে। তবে কফি হাউসের দোতলায় আসবেন। একতলায় খুব ভিড় থাকে। ঠিক মতো কথা বলা যাবে না।'

'ঠিক আছে। তাহলে সে কথাই রইল।'

(৩)

রবিবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আদিত্য একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, দরজায় খটখট শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজা খুলে দ্যাখে বিমল দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে রাখা প্যান্ট-শার্টগুলো সরিয়ে নিয়ে বিমলকে সেখানে বসতে বলল আদিত্য। ঘড়িতে দেখল পৌনে চারটে। তাহলে এখন চা খাওয়া যেতেই পারে। সে বারান্দায় বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলরামকে ডাকল। বলরামের সাড়াশব্দ নেই। আরও দুএকবার ডাকাডাকির পর হাল ছেড়ে দিয়ে আদিত্য ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় দ্যাখে সিঁড়ি দিয়ে বলরাম উঠে আসছে।

'চা আনতে হবে তো? পয়সা দাও।'

'তুই কেটলি করে তিন কাপ চা আনবি আর দুটো ভাঁড় দিতে বলবি। আর আর' আদিত্য একটু ভেবে বলল, 'চারটে প্রজাপতি বিস্কুট।'

আদিত্য জানে বিমল প্রজাপতি বিস্কুট খেতে খুব ভালবাসে। সে ঘরে ঢুকে পেরেকে ঝোলানো হ্যাঙারের শার্টের পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বলরামকে দিয়ে বলল, 'খুচরো নেই রে। ভাঙিয়ে আনতে হবে।'

মিনিট পনের পরে চায়ের ভাঁড়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, এবার বল বিমলবাবু কী জানতে পারলে?'

'কিছু খবর পেয়েছি স্যার। তবে সেটা কাজের না বাজে আপনি বিচার করবেন।'

'বল কী খবর পেয়েছ।'

'আপনাকে বলেছিলাম না মেমসাহেবের পুরোনো ড্রাইভার ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, একজন বদলি লোক গাড়ি চালাচ্ছে, তা আমি সেই বদলির বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমালাম। বদলির নাম বিল্টু, চেতলায় একটা বস্তিতে থাকে। তাকে বললাম, আমি গাড়ি চালাই। শুনেছি, সেনেদের ড্রাইভার দেশে চলে গেছে, একটা চাকরি খালি হতে পারে। তারপর শুনলাম তুমি বদলির কাজ করছ। তা তুমি কতদিন এই কাজটা করবে? যদি বেশিদিন না কর তাহলে আমি করতে পারি। সে বলল, যতদিন পারি করে যাব, আমার হাতে আর কোনও কাজ নেই। আরও বলল, পুরোনো ড্রাইভার কবে ফিরবে সে জানে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাজে কি খুব চাপ? সে বলল, না, না। কাজ খুব হালকা। মেমসাহেব মাঝে মধ্যে ক্লাবে যান, কখনও উকিল বাড়ি যান, কখনও বিউটি পারলারে যান, ব্যাস। তবে গাড়ি চলুক না চলুক আমাকে বারো ঘন্টা থাকতে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কোথথাও যান না? বিল্টু অনেক ভেবেচিন্তে বলল, হ্যাঁ, কখনও কখনও এক প্রোমোটারের আপিসেও যান। বাড়িটা বিক্রির ব্যাপারে বোধহয় ওই প্রোমোটারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। টেলিফোনে ম্যাডামের কথা শুনে তাই মনে হয়। বিল্টুর সঙ্গে আরও বন্ধুত্ব পাতানোর জন্যে ওকে বিরিয়ানি খাওয়ালাম।'

'বিরিয়ানি খাওয়ালে? কোথায় বিরিয়ানি খাওয়ালে?'

'ফুটপাথের দোকানে স্যার। এক প্লেট চিকেন বিরিয়ানি পঁয়ত্রিশ টাকা।'

'পঁয়ত্রিশ টাকায় চিকেন বিরিয়ানি!' আদিত্য বিস্মিত।

'বোধহয় কাকের মাংসের বিরিয়ানি স্যার। নইলে এত সস্তায় দিতে পারে? বিল্টু অবশ্য সেটাই আহ্লাদ করে খেয়ে নিল। খাবার পর এমন এক-একটা ঢেঁকুর তুলছিল মনে হচ্ছিল যেন দাঁড়কাক ডাকছে।'

'খাবার পর কী বলল?'

'বিরিয়ানি খাওয়াবার পর পান-সিগারেট খাওয়ালাম। বললাম, তোমার জানা আর কোথাও কাজ-টাজ খালি আছে? বিল্টু প্রথমে কিছুতেই কিছু বলবে না। শেষে বলল, সে যতদূর জানে পুরোনো ড্রাইভার মদনবাবু আর ফিরবে না। মদনবাবু বিল্টুর কাকার বন্ধু, সে সেই সূত্রেই চাকরিটা পেয়েছে। মদনবাবু বিল্টুর কাকাকে বলেছে, মেমসাহেব মদনবাবুকে একটা মোটা টাকা দিয়ে রিটায়ার করিয়ে দিয়েছেন। মদনবাবু পাকাপাকিভাবে দেশে চলে গেছে। তবে বিল্টু হয়ত সামনের মাস থেকে উবার চালাবে। ওতে টাকা অনেক বেশি। তখন আমি ওই কাজটা করতে পারি। বিল্টু আমাকে তার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে খোঁজ রাখতে বলেছে। আর একটা কথা। বিল্টু শুনেছে, মদনবাবু নাকি কী একটা কাগজে সই করেছিল। তাই ভয় পেয়ে দেশে চলে গেছে। তবে বিল্টু ব্যাপারটা ভাল জানে না।'

'মদনবাবুর দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'এটা তো স্যার জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে কায়দা করে জেনে নিতে পারি।'

'ওটা জানা খুব দরকার। যত তাড়াতাড়ি পার জেনে দিও।'

পার্থ সান্যালের এবারের হোটেলটা নামে এয়ারপোর্টের কাছে হলেও আসলে নিউ টাউনের এক প্রান্তে। ওসব জায়গায় এখনও তেমন বাস চলে না। অতএব গাড়ি বা ট্যাক্সি ছাড়া যাবার উপায় নেই। তবে হোটেলে যারা থাকে কিংবা কাজে কর্মে আসা-যাওয়া করে তাদের সকলেরই গাড়ি আছে। উপায় নেই বলে আদিত্য একটা উবার নিয়েছিল। শুনেছিল, উবার চালকরা জিপিএস ম্যাপ থেকে সব জায়গার হদিশ বার করে নিতে পারে। আদিত্য তাই খানিকটা নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু নিউ টাউনে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ চক্রাকারে ঘুরপাক খাবার পর ট্যাক্সিওলা যখন আত্মসমর্থনের ভঙ্গীতে বলল যে সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে তখন আদিত্য বুঝল তার চালক রাজারহাট অঞ্চলটা তার থেকেও কম চেনে। মনে হল, ছেলেটা বিহার বা ঝাড়খণ্ড থেকে সদ্য কলকাতায় এসে গাড়ি চালাচ্ছে। শেষে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে যখন আদিত্য তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছল তখন সোয়া ছটা বেজে গেছে।

রিসেপশন-এ পার্থর নাম বলতে সাদা-কালো স্কার্ট-ব্লাউজ এবং মুখমণ্ডলে উগ্র মেক-আপ পরিহিতা মেয়েটি আদিত্যর নাম জিজ্ঞেস করল। নাম জানার পর সে বলল মিস্টার সান্যাল আদিত্যর জন্য কফি শপে অপেক্ষা করছেন। কফি শপে লোকজন প্রায় নেই। পার্থ এক কোণে এক কাপ কফি নিয়ে বসে আছে। আদিত্যকে দেখে হাত নাড়ল।

মিনিট দশেক পরে এক কাপ দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'আমার কাজ এগোচ্ছে। কয়েকটা পরিষ্কার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তবে এখনই কিছু বলব না। একেবারে নিশ্চিত হয়ে বলব।'

'তুই শুধু একটা কথা বল। চন্দ্রা বেঁচে আছে তো?' পার্থর গলাটা খুব উৎকণ্ঠিত শোনাল।

'আমার বিশ্বাস চন্দ্রা বেঁচে আছে।' আদিত্য সংক্ষিপ্তভাবে বলল।

'তোর বিশ্বাসের কি কোনও কারণ আছে? নাকি এমনি এমনি বলছিস?'

'কারণ আছে। অবশ্যই কারণ আছে। ধরা যাক, চন্দ্রাকে কেউ খুন করেছে। কিন্তু খুন করে সে লাশটা লুকিয়ে রাখবে কেন? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, লাশ ইছামতির জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলেও এতদিনে সেটা কোথাও না কোথাও ভেসে উঠত। একটা সম্ভাবনা, গলায় ভারি কিছু বেঁধে লাশ ইছামতিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেটা ডুবতে ডুবতে একেবারে নদীর তলায় গিয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন, এতটা কষ্ট খুনি করবে কেন? খুন করে লাশ ফেলে রাখলেই তো হতো। তাকে যত্ন করে লুকিয়ে রাখার কী দরকার ছিল?'

বলতে বলতে আদিত্যর মনে হল তার কথাগুলো নিশ্চয় পার্থর খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। সে বলল, 'আই অ্যাম রিয়ালি সরি। আমার এভাবে কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি।'

'না না ঠিক আছে। তুই তো একটা হাইপথেটিকাল সিচুয়েশন আলোচনা করছিস। তুই তো বলছিস না এটা রিয়ালিটি।'

'এক্স্যাক্টলি। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি চন্দ্রা বেঁচে আছে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।'

পার্থ অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছে। আদিত্য তাকে খানিকটা ধাতস্থ হবার সময় দিল। তারপর বলল, 'তবে চন্দ্রাকে যে কেউ মারতে চাইছিল সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

'সেটা তুই কী করে বুঝলি?' পার্থ তীক্ষ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল।

'তোকে কেউ বলেনি নিখোঁজ হয়ে যাবার আগে চন্দ্রা দু দুবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল? এটা নিছক সমাপতন হতে পারে না।'

'আমাকে তো এসব কেউ বলেনি!'

'তোকে কেউ বলেনি যে একটা রাত্তিরে কেউ একজন চন্দ্রার বাথরুমে একটা জাত কেউটে সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল? বরাত জোরে চন্দ্রা বেঁচে গেছে। এর কয়েক সপ্তাহ পরে রাত্তিরে চন্দ্রার শোবার ঘরে সিলিং ফ্যানটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। ফ্যানটা ভেঙে পড়ছে টের পেয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে চন্দ্রা সরে যেতে পেরেছিল। তোকে কেউ বলেনি এসব কথা?'

পার্থকে বিহ্বল দেখাচ্ছিল। যেন সে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, 'আমি তো এসব কিছুই জানি না।'

আদিত্য বলল, 'এই ঘটনাগুলোকে কোয়েনসিডেন্স মনে করার কোনও কারণ নেই। আমার মনে হয়, চন্দ্রা বুঝতে পেরেছিল কেউ তাকে খুন করার চেষ্টা করছে। তাই সে গা ঢাকা দিয়ে আছে। সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবে।'

'তোর কথা শুনে খানিকটা আস্বস্ত হচ্ছি।'

'পুরোপুরি আশ্বস্ত হবার সময় কিন্তু আসেনি।' আদিত্য সাবধানি গলায় বলল। 'চন্দ্রা যেখানে লুকিয়ে আছে সেটা যদি খুনি খুঁজে বার করে ফেলতে পারে তাহলে চন্দ্রার ঘোর বিপদ।'

পার্থকে আবার খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে থেমে থেমে বলল, 'কিন্তু, চন্দ্রাকে কেউ খুন করতে চাইবে কেন?'

'নানারকম কারণ থাকতে পারে। আমি এখনও আসল কারণটা বুঝতে পারিনি। আর একটু ইনভেস্টিগেট করতে হবে।' আদিত্য অকপটভাবে বলল।

পার্থকে এখনও বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। সে ভাবছে। একটু পরে পার্থ বলল, আমি কাল জাপান যাচ্ছি, সামনের সোমবার ফিরব। ফিরে একবার বসিরহাটে চন্দ্রার স্কুলে যেতে হবে। ওখানে এক ভদ্রলোক আছেন। নামটা মনে পড়ছে না। ওই বনবীথি স্কুলের ক্লার্ক। চন্দ্রার প্রতিবেশি ছিলেন। আগেরবার যখন গিয়েছিলাম, বলেছিলেন চন্দ্রার কিছু জিনিসপত্র চন্দ্রার বাড়িতে পড়ে ছিল, উনি বাড়িওলাকে বলে যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। সেগুলো আমার হাতে তুলে দিতে চান। আমি তখন জিনিসগুলো নিতে পারিনি। ভাবছি এবার গিয়ে নিয়ে আসব। এনে আমার দিদির বাড়িতে রেখে দেব।

'দেশে এখন তোর কে আছে?'

'বাবা মা দুজনেই চলে গেছে। রানাঘাটে আমাদের পুরোনো বাড়িটাও আর নেই। আমার আত্মীয় বলতে শুধু দিদি আর দিদির ছেলে। দিদির স্বামী মারা গেছে। অল্প বয়সে ক্যান্সার হয়েছিল। ভেরি স্যাড। দিদির শ্বশুর-শাশুড়িও আর নেই। আমার জামাইবাবু এক সন্তান। শ্বশুরবাড়িতে দিদি একা একা ছেলে নিয়ে থাকে। স্কুলে পড়ায়। দিদির শ্বশুর যে স্কুলে পড়াত সেই স্কুলের প্রাইমারি সেকশনে। আমি দিদির সঙ্গে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকি।'

'দিদির শ্বশুরবাড়িটা কোথায়?'

'রানাঘাটের কাছেই দিদির বিয়ে হয়েছিল। ঠিক রানাঘাটে নয়। রানাঘাটের আগে পায়রাডাঙা বলে একটা স্টেশন আছে। ওখানে নেমে রিক্সায় মিনিট পনেরো। গ্রামের নাম হেতমপুর। আমাদের মতই দিদির শ্বশুরবাড়িটাও উদ্বাস্তু পরিবার। দেশভাগের পর ওরা হেতমপুরে চলে আসেন। ওখানকার স্কুলে দিদির শ্বশুর অঙ্ক পড়াতেন।'

একটু থেমে পার্থ বলল, 'শোন, তুইও আমার সঙ্গে বসিরহাট চল। আমরা দুজনে মিলে ইস্কুলটা ঘুরে দেখব। যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারি।'

আদিত্য ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। তাই হোক। আমি তো একবার বসিরহাট যাবই ভাবছিলাম। তোর সঙ্গেই না হয় যাব। তুই কবে যাবি ভাবছিস?'

'আমি সোমবার ফিরছি। মঙ্গলবার গেলে কেমন হয়? এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবার? তোর কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'না না কোনও অসুবিধে নেই।'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এবার যেতে হবে রে। যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। খুব ভাল করে ভেবে দ্যাখ। চন্দ্রা কি কখনও তোকে কোনও হিন্ট দিয়েছিল সে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে?'

পার্থ অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, সেরকম কিছুই মনে পড়ছে না।'

কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসটা আজকাল বদলে গেছে। বদলে গেছে মানে আদিত্যর ছাত্রজীবনে যেমন ছিল তেমনটা আর নেই। আগে বেয়ারাদের ডাকলেও আসতে চাইত না। এখন নিজের থেকে এসে জিজ্ঞেস করে কী খাবেন। আগে লোকে ঘন্টার পর ঘন্টা কিছু না খেয়ে বসে থাকত। এখন অনেকেই চট করে একটা কফি খেয়ে উঠে যায়। আগে কফি হাউসে চাউমিন চিলি চিকেন বিক্রি হবার কথা ভাবাই যেত না। এখন অনেকে ওসব খেতেই কফি হাউসে আসে। আবার অনেক কিছু বদলায়নি। ইনফিউশন নামধারী কালো কফি, পকৌড়া, চিকেন কিংবা এগ স্যান্ডউইচ, মটন আফগানী যা আসলে মটন কাটলেটের গরগরে ঝোল, যা লম্বা করে কাটা দুটুকরো সেঁকা পাঁউরুটি সহযোগে খেতে হয় এবং যা খেলে পেটের গণ্ডগোল অবধারিত, এ সবই এখনও আছে।

আদিত্য সাড়ে চারটের বেশ আগেই কফি হাউসে পৌঁছে গিয়েছিল। একটা কফির অর্ডার দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল চেনা কেউ চোখে পড়ে কিনা। কোথাও কেউ চেনা নেই। আদিত্যর মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে পড়া সেই লাইনগুলো : ''যৌবন যায়। যৌবন বেদনা যে/ যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে/ স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাত সাগরের দোলানি/ চেনা মুখ আর দেখায় না কফিখানা/নতুন শহর, পথঘাট নয় জানা/ বন্ধুরা মৃত, অপরিতৃপ্ত, গোঙানি।''। সত্যি এই কফিখানায় কোথাও কোনও চেনা মুখ আর নেই। অথচ এমন সময়ও ছিল যখন প্রায় প্রত্যেক টেবিলেই চেনা বেরিয়ে পড়ত। এক টেবিলের আড্ডা শেষ করে বহুবার আদিত্য আরেক টেবিলে গিয়ে বসেছে।

সোয়া চারটে নাগাদ কেয়া বাগচি দোতলার দরজা দিয়ে ঢুকল। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে, সবুজ পাড়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের মাঝে সবুজ টিপ। কেয়া নিজেই আদিত্যকে দেখতে পেয়ে তার টেবিলে এসে বসল।

'বই কোথায়? বই কিনলেন না?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'অনেক বই কেনা হয়েছে। আমার সঙ্গে স্কুলের দুজন দরোয়ান এসেছিল। তাদের হাত দিয়ে বইগুলো স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি এখন ঝাড়া হাত-পা।'

আদিত্যর মনে হল কেয়াকে কিছুটা শীর্ণ দেখাচ্ছে। সে মুখে বলল, 'স্যান্ডউইচ খাবেন?'

'খাব। এগ স্যান্ডউইচ। এখানকার চিকেনের থেকে এগ স্যান্ডউইচটাই বেশি ভাল লাগে। আর একটা কোল্ড কফি খাব। কোল্ড কফি উইথ ক্রিম। গরমটা যাচ্ছে না। আপনি খাবেন না?'

'আমিও তাহলে এক প্লেট এগ স্যান্ডউইচই খাই। আর একটা কালো কফি।'

বেয়ারাকে অবশ্য দোতলায় বেশি দেখা যায় না। যখন আসবে তখন অর্ডার দিতে হবে।

'আপনাকে বেশ রান ডাউন দেখাচ্ছে। বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে।' আদিত্য আস্তে আস্তে বলল।

কেয়ার শরীর থেকে পারফিউম আর ঘাম মেশানো একটা গন্ধ আসছে। গন্ধটাতে মাদকতা আছে। আদিত্য বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল।

'রান ডাউন লাগার কারণ আছে। জ্বরে পড়েছিলাম। তিনদিন স্কুলে যেতে পারিনি। গত সোমবার থেকে আবার স্কুলে যাচ্ছি। ভীষণ উইক করে দিয়েছে। যে কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম সেটা অবশ্য একেবারে অন্য একটা ব্যাপার। তার জন্যেও খানিকটা চিন্তায় আছি। একটু জিরিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা বলছি।' কেয়া তার শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'জ্বরের ওপর কোল্ড কফি খাবেন? আবার ঠাণ্ডা লাগবে না তো?' আদিত্য ঈষৎ মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করল।

'কিচ্ছু হবে না। একে তো জ্বর সেরে গেছে। তার ওপর আমার তো ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়নি। ভাইরাল ফিবার হয়েছিল। এই ভাইরালটা শহরে খুব হচ্ছে। তবে একবার সেরে গেলে আর ফিরে আসে না। শুধু খুব দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া এই গরমে হট কফি খাওয়া অসম্ভব।'

তারপর একটু থেমে কেয়া বলল, 'আপনার সঙ্গে তো অনেকদিন দেখা হয়নি। তদন্ত কেমন এগোচ্ছে? চন্দ্রার কোনও খোঁজ পেলেন?'

'এখনও পাইনি, তবে খুব শিগগির পেয়ে যাব। কয়েকটা জিনিস এখনও জট পাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে ছাড়াতে হবে।'

বেয়ারা অর্ডার নিতে এসেছে। আদিত্য বলল, 'আর কিছু খাবেন না? ইস্কুল থেকে আসছেন, নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে?'

'না না আর কিছু খাব না। জ্বরের পর খিদেটা একেবারে চলে গেছে।' কেয়া ব্যাগ খুলে একটা ছোট জলের বোতল বার করল। কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে বলল, 'বসিরহাট গিয়েছিলেন? চন্দ্রার স্কুলে?'

'এখনও যাওয়া হয়নি। তবে পুরুলিয়ায় গিয়েছিলাম। চন্দ্রা যে ইস্কুলে পড়াত সেখানে গেলাম। চন্দ্রা যে বাড়িটাতে থাকত সেখানেও গেছি। দরকারি কিছু তথ্য জানতে পেরেছি।'

'যে প্রশ্নটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে সেটা হল, চন্দ্রা বেঁচে আছে তো?' কেয়ার গলাটা খুব বিষণ্ণ শোনাল।

'দেখুন, আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে এটা পরিষ্কার যে চন্দ্রাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছিল। আমার মনে হয়, খুনিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য চন্দ্রা কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সে বেঁচে আছে।'

'কিন্তু, চন্দ্রাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করবে কেন?' কেয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলল।

'সেটাই তো বার করার চেষ্টা করছি।'

বেয়ারা কফি-স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসেছে। কফি হাউসের সার্ভিসের বেশ উন্নতি হয়েছে আজকাল। খাবার অর্ডার দিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কেয়া কোল্ড কফির স্ট্রতে ঠোঁট ছোঁয়াল। আদিত্য কেয়াকে দেখছে। মুখে বয়েসের একটা হালকা ছাপ পড়লেও এখনও বেশ অ্যাট্র্যাক্টিভ বলা যায়। কেয়া কেন বিয়ে করেনি কে জানে? আদিত্য এই প্রশ্নটা আগেও নিজেকে করেছে।

'আমি তাহলে আমার সমস্যাটার কথা বলতে শুরু করি।' কেয়া প্রায় এক নিশ্বাসে কফিটা শেষ করে বলল।

'বলুন।' আদিত্য ঘাড় নাড়ল।

'আগেই বলেছি, আমার একটা ভাইরাল ফিভার হয়েছিল। একটা বুধবার জ্বরটা এল, ধুম জ্বর। দুদিন ভোগার পর শুক্রবার সকালে দেখলাম জ্বর নেই। ভাবলাম, জ্বর যখন নেই তখন আর মিছিমিছি স্কুল কামাই করি কেন? দুদিন স্কুল কামাই হয়ে বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে। সাড়ে দশটা নাগাদ খাবার ঘরে গিয়ে অল্প ভাত খেয়ে নিলাম, যদিও খাবার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। সাড়ে এগারোটায় স্কুল। ঘরে ফিরে স্কুল যাবার জন্য শাড়িটা বদলাতে যাচ্ছি হঠাৎ শরীরটা ভীষণ দুর্বল মনে হল। বুঝলাম, এই শরীরে স্কুল যাওয়া অসম্ভব। কোনও রকমে স্কুলে একটা ফোন করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়েই ঘুম।'

আদিত্য খুব মন দিয়ে শুনছে। একটু জিরিয়ে নিয়ে কেয়া আবার বলতে লাগল, 'আমার পরিষ্কার মনে আছে, শাড়ি বদলাবার জন্যে ঘরে এসে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার দরজাটার কথা একটু বলি। দরজায় একটা গোদরেজের ইয়েল লক লাগানো আছে। বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়, আবার ভেতর থেকে টেনে দিলেও বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খোলা যায়। আর ভেতর থেকে নব ঘুরিয়ে দরজা খুলতে হয়।

'ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ বাইরে থেকে চাবি দিয়ে দরজা খুলে আমার ঘরে ঢুকেছে। ঘরে আধো অন্ধকার। দিনের বেলা দরজা-জানলা বন্ধ থাকলে যেমন হয়। সেই আধো অন্ধকারে চিনতে পারলাম যে ঘরে ঢুকেছে সে আমাদের নতুন কাজের লোক চম্পা। ঘর ঝাঁট দেয়, ঘর মোছে, বাসন মাজে। এই কাজগুলো আমাদের এক রাতদিনের মাসিই করত। সে কিছুদিনের জন্য দেশে গেছে বলে চম্পাকে দিয়ে গেছে। চম্পা আমাদের হস্টেলে থাকে না। কাজ করে বাড়ি চলে যায়। আমার মনে হয় আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে চম্পা ঠিক বুঝতে পারেনি আমি ঘরে রয়েছি। আমি

চম্পাকে দেখে 'কে কে' বলে চেঁচিয়ে উঠতে সে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমতা আমতা করে বলল সে জানত আমি স্কুলে গেছি। তারপর ওপরে এসে আমার ঘরের দরজা খোলা দেখে ভেবেছিল আমি বোধহয় ভুল করে দরজা খোলা রেখে চলে গেছি। তাই ভেতরে ঢুকে দেখছিল। চম্পার কৈফিয়তটা মোটেই যুতসই হল না। কিন্তু আমি সে সময়ে এতটাই দুর্বল বোধ করছিলাম যে বেশি কথা না বলে চম্পাকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে বললাম। কিন্তু পরে খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি যে দরজাটা আমি অবশ্যই বন্ধ করেছিলাম। আমাদের হস্টেলের সব থেকে সিনিয়ার মেম্বার রানুদি, আমাদের সকলের অভিভাবকের মতো, তাকে কথাটা বললাম। রানুদি আমার আশঙ্কাটা হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, তোর কথা সত্যি হলে ধরে নিতে হবে ওই মেয়েটা আমাদের সকলের ঘরের চাবি ডুপ্লিকেট করে রেখেছে আর নয়ত ও দেখেছে তোর ঘরে কোনও সাত রাজার ধন মানিক রয়েছে যা আমাদের ঘরে নেই। তাই হয়ত কষ্ট করে তোর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা শুধু করে রেখেছে। এবার তুই ভেবে দ্যাখ তোর ঘরে সেরকম কিছু আছে কিনা। আমি চুপ করে গেলাম।'

কেয়া একটু থামল। এখনও ওর দুর্বলতা কাটেনি তাই একটানা বেশিক্ষণ কথা বলতে পারছে না। ওরা জানলার ধারে একটা টেবিল পেয়েছিল। আদিত্য জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। নিচে বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট দিয়ে জনস্রোত চলেছে। রিক্সাভ্যানে চড়ে উপুড়-চুপুড় বই দোকানে যাচ্ছে। একটু দূরে, কলেজ স্ট্রিটের দিকটায় কয়েকটি ছেলেমেয়ে বক্তৃতা আরম্ভের তোড়জোড় করছে, যদিও তাদের সামনে এখনও তেমন কোনও শ্রোতা নেই।

'আমার গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মনে হয় কফি হাউসের জলটা না খাওয়াই ভাল। আর একটা কোল্ড কফি খেলে খুব রাগ করবেন?'

'মোটেই না, মোটেই না। আমিও একটা কোল্ড কফি খাব।'

ভাগ্যক্রমে বেয়ারা ধারে কাছেই ঘুরছিল, তাকে দুটো কোল্ড কফি উইথ ক্রিম আনতে বলে আদিত্য কেয়াকে বলল, 'তারপর?'

'শনি, রবি দুদিন রেস্ট নেবার পর শরীরে একটু জোর পেলাম। সোমবার স্কুলে জয়েন করলাম আর তার পরেই আসল ঘটনাটা ঘটল। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ঘর খুলে দেখি ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল। ঘরে ঢুকে কিছু একটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কী খুঁজেছে আমি জানি না, তবে আমার আলমারি, ড্রয়ার, সুটকেস সব হাট করে খোলা। এমনকি খাটের নিচে চন্দ্রার দুটো সুটকেস ছিল, একটা আগে থেকেই ছিল আর একটা সেদিন সোনামাসি রেখে গিয়েছিল, দুটোই খোলা, আর তাদের ভেতরের জিনিসপত্রগুলো মেঝেতে ছড়ানো। শুধু তাই নয়, দুটো সুটকেসেরই লাইনিং ব্লেড দিয়ে কেটে ভেতরটা দেখা হয়েছে। আমার সুটকেস দুটো অবশ্য অক্ষতই ছিল। বলাই বাহুল্য, চম্পা বলে মেয়েটাকে আর আমাদের হস্টেলে দেখা গেল না। রানুদি পুলিশে খবর দিতে বলেছিল, আমি দিতে দিইনি। কী হবে পুলিশে খবর দিয়ে? তাছাড়া আমার কিছু খোয়া গেছে বলেও তো মনে হল না।'

আদিত্য কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'চন্দ্রার নতুন সুটকেসটাতে কী ছিল মনে আছে?'

'বলার মতো কিছু নয়। কিছু পুরোনো জামাকাপড়, বাতিল সোয়েটার, পুরোনো কাগজপত্র।'

'কী ধরনের কাগজপত্র?'

'আমার ঠিক মনে নেই। কিছু পুরোনো ফিজিক্সের খাতা, বোধহয় কলেজ-ইউনিভার্সিটির নোট, যেগুলোর সঙ্গে চন্দ্রার আর খুব একটা সম্পর্ক নেই, কিছু পুরোনো চিঠি, স্কেচবুক। জানেন তো, চন্দ্রা ছবি আঁকত?'

'একসময় জানতাম। তবে ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এখন যদি আপনার সঙ্গে আপনার হস্টেলে যাই, চন্দ্রার এই দ্বিতীয় সুটকেসের জিনিসপত্রগুলো একবার দেখা যাবে?'

'অবশ্যই যাবে। চলুন আমার সঙ্গে। আপনার কী সন্দেহ হচ্ছে চন্দ্রার ওই সুটকেসটার জন্যে চোর আমার ঘরে ঢুকেছিল?' কেয়ার গলায় সংশয়।

'সন্দেহ নয়। আমি নিশ্চিত।'

কোল্ড কফি শেষ করে আদিত্য আর কেয়া বাগচি যখন মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড় থেকে ট্যাক্সি ধরছে তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। রাস্তায় বেশ ভিড়, দেয়ালির কেনাকাটা চলছে। কলেজ স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড় থেকে বাগবাজারে কেয়ার হোস্টেলে পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। ট্যাক্সিতে কেয়ার পাশে বসে আবার কেয়ার শরীরের সেই গন্ধ! আদিত্যর অস্বস্তিটা ফিরে এসেছিল।

হস্টেলে পৌঁছে কেয়া আদিত্যকে একতলায় বসার ঘরে বসাল। বলল, 'চা খাবেন তো? এই সময় আমাদের চা হয়।'

'চা খেতে আমার কখনই আপত্তি নেই।'

'চন্দ্রার সুটকেসের জিনিসগুলো আমি সুটকেসেই তুলে রেখেছি। সুটকেসটা নিয়ে আসি?' কেয়া একটু ইতস্তত করে বলল। তারপর একটু থেমে বলল, 'আসলে দোতলায় পুরুষ ভিজিটারদের নিয়ে যাওয়া বারণ। নাহলে আপনাকে ওপরেই নিয়ে যেতাম।'

'না না আমার ওপরে যাবার দরকার নেই। আপনি সুটকেসটা আনলেই হবে।' আদিত্য কিছুটা কুণ্ঠিতভাবে বলল।

মিনিট পাঁচেক পরে কেয়া যখন সুটকেসটা নিয়ে ফিরে এল, আদিত্য লক্ষ করল সে ইতিমধ্যে বাইরে পরার শাড়িটা বদলে একটা সাধারণ শাড়ি পরে নিয়েছে। কপালের টিপটাও আর নেই। হয়ত চোখে-মুখে জলও দিয়ে এসেছে। কারণ কেয়াকে অনেকটা আটপৌরে দেখাচ্ছিল।

আদিত্য সুটকেস খুলে তার ভেতরের জিনিসগুলো বার করে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল। পুরোনো শাড়ি, চুড়িদার, বাতিল অন্তর্বাস, কাগজপত্রের একটা বান্ডিল, কিছু অঙ্ক-কষা খাতা, একটা স্কেচবুক।

আদিত্য স্কেচবুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ঘোড়ার স্কেচ, কুকুরের স্কেচ, টিয়া পাখির স্কেচ, সবই পেনসিলে। কিছু স্কেচপেনে আঁকা দৃশ্যাবলী, পাহাড়ের ছবি, পুকুরের ছবি, পুরুলিয়া রেল স্টেশনের ছবি, পুরুলিয়া শহরের টুকরো টুকরো ছবি। কয়েকটা চন্দ্রাদের আলিপুরের বাড়ির পেনসিল স্কেচ। বনবীথি ইস্কুলের স্কেচ। ইছামতির ছবি। প্রত্যেকটা ছবির নিচে ক্যাপশান দেওয়া আছে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা জায়গায় আদিত্যর চোখ আটকে গেল। আবার নীপবীথি ইস্কুল বাড়ির স্কেচ। একটা নয়, বেশ কয়েকটা। বিভিন্ন দিক থেকে। একটা ছবিতে একটা ট্রাক দেখা যাচ্ছে। ট্রাকটা নীপবীথি ইস্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুটো লোক পিঠে করে ট্রাক থেকে বস্তা নামাচ্ছে। আর একজন ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না ইস্কুলের সামনে মিড ডে মিলের চাল-ডাল নামছে। ছবিটা আদিত্য খুব মন দিয়ে দেখছিল। ছবিটাতে কিছু একটা আছে যেটা সে আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না জিনিসটা কী বা কোথায় সেটা দেখেছে। এই ছবিটার পরে স্কেচবুকে আর কোনও ছবি নেই।

আদিত্য কেয়াকে বলল, 'আমি কি এই স্কেচবুকটা কয়েকদিনের জন্যে নিতে পারি?'

'ওই স্কেচবুকের মধ্যে চন্দ্রার অন্তর্ধান রহস্য লুকিয়ে আছে বলছেন?' কেয়া হাসছে।

'না, না। তা বলছি না। তবে মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা কিছু আছে যা আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। স্কেচবুকটা নিয়ে যেতে পারলে খুব ভাল হত। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করতাম। যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে।'

'নিয়ে যান, নিয়ে যান। নিয়ে গিয়ে যতদিন খুশি রেখে দিন। আমার কোনও আপত্তি নেই। প্রাণ ভরে ওই ছবিগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করুন। আমি আবার আর্ট জিনিসটা একেবারে বুঝি না।'

চা এসেছে। সঙ্গে বিস্কুট। বিস্কুটটা বেশ নতুন ধরনের।

'আপনি চা-টা খেয়ে নিন। আমি ততক্ষণ সুটকেসটা ওপরে রেখে আসি। তারপর আপনাকে না হয় গলির মোড় অব্দি এগিয়ে দেব।'

একটু পরে আদিত্য যখন নিবেদিতা লেন ধরে কেয়া বাগচির পাশাপাশি হাঁটছিল, আর কেয়ার শরীরের সেই ঘাম মেশানো পারফিউমের গন্ধটা আদিত্যকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল, তখন আদিত্যর মনে সেই প্রশ্নটাই ঘুরছিল, কেয়া বিয়ে করেনি কেন? সন্দেহ নেই, কেয়া বাগচির সঙ্গে হাঁটতে তার বেজায় ভাল লাগছিল।

(৫)

বিমল খবর এনেছিল মদন ড্রাইভারের বাড়ি বারুইপুর স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায় মিনিট পনের। বিমল নিজে একবার সেখানে ঘুরে এসেছে। মদনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে সে সেনবাড়িতে আর কাজ করবে কিনা। মদন বলেছে তার বয়েস হয়েছে বলে মেমসাহেব তাকে রিটায়ার করিয়ে দিয়েছেন। কিছু টাকাপয়সাও দিয়েছেন। আপাতত সে আর কাজ করবে না। বাড়ি বসে কিছুদিন আরাম করবে। এখন বিল্টু বলে একটা ছেলে তার কাজটা করছে। বিল্টু কতদিন কাজ করবে মদন জানে না। বিল্টু যদি কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে তার কাজটা বিমল অবশ্যই করতে পারে।

বিমলের অবশ্য মদনকে খুব বুড়ো মনে হয়নি। তাই বুড়ো বলে তাকে রিটায়ার করিয়ে দেওয়ার গল্পটা বিমলের অবিশ্বাস্য লেগেছে। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু সে মদনের মুখ থেকে আর কোনও কথা বার করতে পারেনি। মদনকে একটু বেশি প্রশ্ন করাতে সে রেগে মারমুখি হয়ে উঠেছিল। বিমল আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

বিমলকে দিয়ে কাজ হল না বলে আদিত্য ঠিক করেছিল নিজেই একবার মদন ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করে আসবে। কিন্তু বিমল যখন কার্যোদ্ধার করতে পারেনি, সেও একা গিয়ে কিছু করে উঠতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই আদিত্য অন্য রাস্তা ভেবেছে। সমাদ্দারের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য চেয়েছে। বারুইপুর থানার ওসির সঙ্গে আদিত্যর কথা বলিয়ে দিয়েছে সঞ্জয় সমাদ্দার। ঠিক হয়েছে থানার ছোটবাবু মনসুর আলমকে নিয়ে আদিত্য মদন ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পুলিশ ধমক দিয়ে যদি মদনের পেট থেকে কথা বার করতে পারে।

বেলা দশটা নাগাদ আদিত্য শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দেখে সাউথ স্টেশনে লোক থইথই করছে। সবই আপিসযাত্রী, ট্রেন থেকে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে আপিসের পথে ধাবমান। তবে আদিত্যর সৌভাগ্য, ভীড়টা একমুখী। যে ট্রেনগুলো শেয়ালদা ঢুকছে, সেগুলোতে অমানুষিক ভীড়। আর যে ট্রেনগুলো শেয়ালদা ছেড়ে যাচ্ছে সেগুলো একেবারে ফাঁকা। আদিত্য বারুইপুর লোকাল ধরে একেবারে বারুইপুরে গিয়ে নামবে। তাতে দুটো সুবিধে। এক, ভীড়ের বিপরীতে যাচ্ছে বলে মনে হয় ট্রেনটা ফাঁকাই থাকবে। দুই, অরিজিনেটিং স্টেশনে উঠে একেবারে টারমিনাল স্টেশনে গিয়ে নামবে বলে ওঠা এবং নামা দুটোই শান্তিপূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

বারুইপুর লোকাল বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়তে মিনিট পনের বাকি। ধূমপান করে এই পনের মিনিটের সদ্ব্যবহার করা যেত। কিন্তু আজকাল ট্রেনের কামরায় তো বটেই, এমনকি প্ল্যাটফর্মেও সিগারেট খেতে দেয় না। অগত্যা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো করে আদিত্য পরপর দুকাপ চা খেল, কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে প্ল্যাটফর্মে হাঁটাহাঁটি করল, তারপর একটা ইংরেজি খবর কাগজ কিনে সামনে যে কামরাটা পেল তাতে উঠে বসল।

ট্রেন ছাড়ল পাঁচ মিনিট দেরি করে, বারুইপুর পৌঁছল কুড়ি মিনিট লেটে। স্টেশনে নেমে একটা রিক্সা ধরে আদিত্য যখন থানায় পৌঁছল তখন বারোটা বেজে গেছে। পথে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি, শুধু মল্লিকপুরের কাছে এসে এক অন্ধ গায়ক 'কী দ্বন্দ্ব করলে জারি/ও গোঁসাই, কোন রঙ্গে বেঁধেছো ঘরখানি', এই গানটা গেয়ে আদিত্যর মনটাকে রীতিমত নরম করে দিয়েছিল।

ছোটবাবু মনসুর আলম একজন অত্যন্ত সুপুরুষ, স্বল্পবাক, ব্যক্তিত্বশালী পুলিশ অফিসার। বয়েস চল্লিশের কমই হবে। আদিত্য তাকে অল্প কথায় চন্দ্রলেখা সেনের উধাও হয়ে যাবার কাহিনি শোনাল। এটাও বলল যে এই মদন ড্রাইভার সম্ভবত কোনও একটা ডকুমেন্টে সই করেছিল যার সঙ্গে চন্দ্রলেখার উধাও হয়ে যাবার

একটা যোগ থাকতে পারে। মদনকে চাপ দিয়ে জানতে হবে সে কোন ডকুমেন্টে সই করেছিল কিংবা আদৌ কোনও ডকুমেন্টে সই করেছিল কিনা। আদিত্যর মনে হল মনসুর আলম সমস্যাটা বুঝেছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে ছোট রাস্তা, তারপর খানিকটা এবড়ো খেবড়ো মাটির পথ। একে ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে যখন পুলিশের জিপ মদন ড্রাইভারের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন সে মধ্যাহ্নভোজন সেরে কুয়োতলায় মুখ ধুচ্ছে। মনে হল, পুলিশের জিপ দেখে মদন এতটাই ঘাবড়ে গেছে যে তার হাত-পা চলছে না। তার ওপর মনসুর আলমের পুলিশি ধমক। মদনের বুকে যেটুকু সাহস ছিল সেটাও উধাও হয়ে গেছে।

আদিত্য, মনসুর আলম ও একটি কনস্টেবল সামনের ঘরে ঢুকেছে। ঘরে একটা তক্তাপোষ, গোটা দুই চেয়ার, একপাশে একটা মান্ধাতার আমলের রেফ্রিজারেটার ঘড়ঘড় শব্দ করে চলছে। একটু আগে মাটিতে বসে কেউ ভাত খেয়েছিল, হয়ত মদন নিজেই, এঁটো থালাটা এখনও পড়ে আছে। একগলা ঘোমটা দিয়ে একজন মহিলা জায়গাটা মুছে এঁটো থালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল। আদিত্য ও মনসুর আলম তক্তাপোষে বসল, কনস্টেবল দাঁড়িয়ে রইল। মদন বাড়ির ভেতরে গেছে।

একটু পরে মদন ঘরে ঢুকতে মনসুর আলম জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম মদন মান্না?'

মদন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমি কী দোষ করেছি স্যার? আমার বাড়িতে পুলিশ কেন?'

'চোপ! একদম বাড়তি কথা নয়। যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে। নাহলে ঘাড় ধরে লক-আপে নিয়ে যাব।' মনসুর আলম গর্জে উঠল। মদন তার উদ্গত কান্নাটা গিলে চুপ করে গেল।

'তুমি কলকাতায় কমলিকা সেনের গাড়ি চালাতে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কতদিন ওখানে গাড়ি চালিয়েছ?'

'স্যার, আগে আমি সাহেবের গাড়ি চালাতাম। সাহেব গত হবার পর থেকে মেমসাহেবের গাড়ি চালাচ্ছি। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর ওই বাড়িতে গাড়ি চালিয়েছি।'

'তাহলে চাকরি ছাড়লে কেন? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আরও দশ বছর চাকরি করতে পারতে।'

'পারতাম স্যার। নিশ্চয় পারতাম। কিন্তু মেমসাহেব আমাকে রিটায়ার করিয়ে দিলেন।'

'মেমসাহেব আপনাকে কেন রিটায়ার করিয়ে দিলেন?' এবার আদিত্য প্রশ্ন করল।

'মেমসাহেব বললেন অনেক দিন চাকরি করেছ। তোমার বয়েস হয়েছে। এবার রিটায়ার করে আরাম করো।'

'মেমসাহেব কেন একথা বললেন? আপনার কি গাড়ি চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'না স্যার, কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। গাড়ি আমি এখনও আগের মতই চালাতে পারি।'

'তাহলে কেন মেমসাহেব আপনাকে রিটায়ার করিয়ে দিলেন?' আদিত্য গলা না তুলে সেই একই প্রশ্ন করল।

'বোধহয়, মেমসাহেবের মনে হয়েছিল আমি অনেকদিন চাকরি করেছি, এবার রেস্ট নেওয়া দরকার। কিছু টাকাও দিলেন। মেমসাহেবের দয়ার শরীর।'

'তুই ঢপ মারার জায়গা পাস না?' এবার মনসুর আলমের হুঙ্কার শোনা গেল। 'এই শ্যামা, এই শুয়োরের বাচ্চাটাকে জিপে তোল। থানায় নিয়ে গিয়ে দুচারটে কোঁৎকা না দিলে সত্যিটা বেরোবে না।' শেষের কথাগুলো দণ্ডায়মান কনস্টেবল-এর উদ্দেশে।

মিতবাক, সুদর্শন মনসুর আলমের মুখ থেকে হঠাৎ এরকম ভাষা বেরোতে পারে আদিত্য কল্পনাও করতে পারেনি।

'আমি সত্যি বলছি স্যার।' মদন ক্ষীণ কণ্ঠে বলল।

'তুই সত্যি বলছিস না মিথ্যে বলছিস থানায় গেলেই বোঝা যাবে। এই শ্যামা, শালাকে জিপে তোল।'

কনস্টেবল শ্যামাচরণ এবার এগিয়ে এসে মদনের হাত ধরল। চাপা গলায় বলল, 'চল গাড়িতে।'

মদন ভয় পেয়েছে। হয়ত সে নিজের থেকেই কিছু একটা বলত, হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে একটি রোগা মাঝবয়সী মহিলা তীরবেগে বেরিয়ে এসে বলল, 'বলে দাও না কী হয়েছিল। এই বয়েসে থানায় গিয়ে হাত-পা ভাঙবে নাকি?'

আদিত্য আন্দাজ করল এই মহিলা মদনের স্ত্রী। এ-ই একটু আগে ঘোমটা মাথায় এঁটো বাসন নিয়ে যেতে এসেছিল।

মহিলার দিকে তাকিয়ে মদন তীক্ষ্ন গলায় বলল, 'বলছি, আমি সব বলছি। তুমি আগে ভেতরে যাও।'

মহিলার নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সে গলা তুলে বলল, 'আমি কোথথাও যাবনি। এইখানেই দেঁইড়ে থেকে শুনতে চাই আমাকে তুমি যা যা বলেছ ঠিক সেটাই পুলিশকে বলছ। পুলিশের কাছে কথা নুকুলে আমরা সবাই কিন্তু বিপদে পড়ব। মনে রেখো তোমার ছোট মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি। পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে আর মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেনি।'

যেটুকু প্রতিরোধ মদন মান্নার বাকি ছিল, মহিলার কথায় সেটাও ভেসে গেল। সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'মারা যাবার কিছুদিন আগে সাহেব আমাকে তার চেম্বারে ডেকে পাঠান। তখন সন্ধে আটটা সাড়ে আটটা হবে। ওই সময় সাহেবের ঘরে আর ওয়েটিং রুমে মক্কেল উপচে পড়ে। সেদিন কিন্তু কেউ কোথাও ছিল না। শুধু সাহেবের খাস আর্দালি রামসেবক সাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব তাকে দিয়েই আমাকে ডেকে এনেছিলেন।'

'ব্যাপারটা আপনার অদ্ভূত মনে হয়নি?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'বেশ অদ্ভূত মনে হয়েছিল স্যার। কিন্তু একটু পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।'

'বলে যাও তারপর কী হল।' এবার মনসুর আলমের গলা।

'সাহেব আমাকে বললেন একটা কাগজে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হবে। এই বলে তিনি ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা কাগজ বার করলেন। আমি দেখলাম কাগজে ইংরেজিতে কীসব লেখা আছে। আমি ইংরেজি পড়তে পারি না। তাই সাহেবকে বললাম, সাহেব এতে কী লেখা আছে বলবেন না? সাহেব বললেন, নিশ্চয় বলব। কিছু না জানিয়ে একটা কাগজে তোমাকে দিয়ে সই করাব কেন? এতে লেখা আছে আমার আলিপুরের বাড়ি এবং তার সঙ্গে যে জমি আছে তার পুরোটাই আমি আমার মেয়ে চন্দ্রলেখাকে দিয়ে যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর পরে সেই হবে এই পুরো বাড়ি এবং জমির মালিক। আর আমার হাজারিবাগের বাড়ির পুরো মালিক হবে আমার স্ত্রী কমলিকা সেন। আর আমার টাকা-পয়সা যা থাকবে তা আমার স্ত্রী এবং মেয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। তবে আমার স্ত্রী তার যতদিন ইচ্ছে আলিপুরের বাড়িটায় থাকতে পারবেন, তাঁকে এখান থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না। এটাই আমার উইল। এতে রামসেবক আর সরকারবাবু সাক্ষী হিসেবে সই দিয়েছে। আর একটা সই দরকার। তাই তোমাকে বলছি। একটা কথা। এই উইলের কথা কেউ যেন এখন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। তবে পরে কখনও যদি এসব নিয়ে কোর্ট-কাছারি হয় তখন সাক্ষী দিতে হবে।'

'সরকারবাবু কে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সরকারবাবু সাহেবের ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখেন। অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক।'

'বুঝেছি। তারপর কী হল?'

'তারপর কিছুদিন ব্যাপারটা ভুলেই গেছিলুম। এর মধ্যে সাহেবের শরীর খারাপ হল, কয়েকদিন ভোগার পর সাহেব চলেও গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর আলিপুরের বাড়িটা মেমসাহেবেরই হয়ে গেল। ছোট মেমসাহেব তো এমনিতেই বাড়িতে কম আসতেন, সাহেব চলে যাবার পর আলিপুরের বাড়িতে আসা বন্ধই

করে দিলেন। অথচ সবই তো তার। আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। আমি মেমসাহেবের গাড়ি চালাতাম। রামসেবক আর সরকারবাবু অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে চলে গেল। তাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।'

'তারপর একদিন কি মেমসাহেব তোমাকে ছাড়িয়ে দিলেন?' মনসুর আলম জিজ্ঞেস করল।

'না স্যার। আমি মিথ্যে বলেছিলাম। মেমসাহেব আমাকে কখনও ছাড়াননি। আসল ব্যাপারটা কী হল বলছি। একদিন একটা লোক আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। আলিপুরের বাড়িরই বারমহলে ছিল কাজের লোকেদের থাকার ব্যবস্থা। আমি সেখানে একটা ঘর নিয়ে থাকতাম। পরিবার থাকত এখানে। তা সেই লোকটা এসে আমাকে বলল আমি যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই আর ওই সই করার কথা কাউকে না বলি তাহলে আমাকে অনেক টাকা দেবে।'

'কত টাকা?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'বলেছিল এক লক্ষ টাকা দেবে। পঞ্চাশ হাজার প্রথমে, দেশে ফিরে গেলে আরও পঞ্চাশ হাজার। আর ওই উইলটা নিয়ে যদি কখনও মামলা হয় তখন কোর্টে বলতে হবে কেউ জোর করে ওই কাগজটাতে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিল। সেরকম কিছু হলে আরও দুলাখ টাকা পাওয়া যাবে।'

'তুমি কী করলে?'

'স্যার, তখন আমার বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। টাকার খুব দরকার। আমি রাজি হয়ে গেলাম। ভেবে দেখলাম, এক্ষুনি তো আর মিথ্যে সাক্ষী দিতে হচ্ছে না, শুধু চাকরিটা ছাড়তে হচ্ছে। সেটা তো আর বেআইনি কিছু নয়। আমি মেমসাহেবকে গিয়ে বললাম আমার শরীরটা ভাল নেই। চাকরি ছেড়ে দেব। চাকরি ছেড়ে কিছুদিন বাড়িতে রেস্ট নিতে চাই।'

'মেমসাহেব কী বললেন?'

'মেমসাহেব প্রথমে একটু অবাকই হয়ে গেলেন। তারপর অনেকবার আমাকে ভেবে দেখতে বললেন। বললেন, এই বাজারে একবার চাকরি ছাড়লে এরকম চাকরি আর চট করে পাওয়া যাবে না। আসলে মেমসাহেব আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন, তাই চট করে আমাকে ছাড়তে চাইছিলেন না। তারপর যখন দেখলেন আমি কিছুতেই আর কাজ করতে রাজি নই তখন মেমসাহেব বেশ রেগে গেলেন। বললেন, চাকরি ছাড়ার আগে একটা লোক দিয়ে যাবে। আমি তখন বিল্টুকে কাজে ঢুকিয়ে দিলাম।'

'দুটো প্রশ্ন করব।' আদিত্য বলল। 'যে লোকটি আপনাকে চাকরি ছাড়ার জন্য টাকা দিয়েছিল তাকে কি আপনি আগে কখনও দেখেছিলেন?'

'না স্যার। তাকে আগেও কখনও দেখিনি। আর টাকা নেবার পরেও কখনও দেখিনি। তবে লোকটা বাঙালি নয়। হিন্দি আর ভাঙা ভাঙা বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল।'

'দুনম্বর প্রশ্ন। যে কাগজটায় আপনি সই করলেন, অর্থাৎ সেই উইলটার কী হল কিছু জানেন?'

'না স্যার। এব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। হয়ত সাহেব ওটা ছোট মেমসাহেবকে দিয়ে গেছিলেন। হয়ত ওটা সাহেবের কাছেই ছিল। না স্যার। ওটা কোথায় গেল আমি কিছুই জানি না।'

'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।' আদিত্য মনসুর আলমকে বলল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

মাথাভাঙা নদীর উৎপত্তি পদ্মায়। কুষ্ঠিয়ার মুনশিগঞ্জ অঞ্চলে পদ্মা থেকে বেরিয়ে কিছু পথ অতিক্রম করার পর নদীয়া জেলায় ঢুকে এই নদী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগের নাম চূর্ণী, অন্যভাগ ইছামতী। উইকিপডিয়া থেকে এইটুকুই জানতে পেরেছিল আদিত্য। এছাড়া অবশ্য অনেকদিন আগে ইছামতি নদীর সঙ্গে একবার সামনা সামনি দেখা হয়েছিল তার। কলেজে পড়ার সময় তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে বনগাঁয় বিভূতিভূষণের বাড়ি দেখতে গিয়েছিল। বাড়ির পেছনেই ইছামতি। তবে আদিত্যর যতদূর মনে পড়ে, সেদিনের ইছামতি ছিল ক্ষীণকায়া, কচুরিপানায় ভর্তি। আর আজ পার্থ সান্যালের সঙ্গে সে যেখানে এসেছে সেখানে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে সেই একই ইছামতি বিপুল আকার ধারণ করেছে।

পার্থ বলেছিল, প্রথমে নদী দেখবে তারপর অন্য কাজ। আগে বার দুয়েক যখন এসেছিল তখনও তাই করেছিল। এখন নদীর ধারে বালির ওপর বসে তারা দুজন কফি সহ চিকেন স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। খুব ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছিল বলে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। পার্থর হোটেল কিছু স্যান্ডউইচ এবং কফি তৈরি করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। তারা নদীর ধারে বসে সেই খাদ্যেরই সদ্ব্যবহার করছে।

নদীর ধারে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। আর খুব হাওয়া। একটা ঘাটও আছে। পায়ে চলা পথ বালির মধ্যে দিয়ে ঘাট অব্দি পৌঁছেচে। দুচারটে নৌকো ঘাটে ভাসছিল। আরও কয়েকটা মাঝ নদীতে। নদীর মাঝ বরাবর কোথাও একটা ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে। চোখে দেখা যায় না, আন্দাজ করে নিতে হয়। একটা রোগা, কালো লম্বা মত লোক ঘাটে নৌকো বেঁধে ডাঙায় উঠল। এখন সে পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে আদিত্যদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'ও দাদা, বনবীথি ইস্কুলটা কোনদিকে বলতে পারেন?' লোকটা একটু কাছে আসতে আদিত্য গলা তুলে বলল।

'ইস্কুল? বনবীথি ইস্কুল? এই যে পথটা পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠেছে, ওই রাস্তায় উঠে ডানদিকে যাবেন। মিনিট দশেক হাঁটলেই বনবীথি ইস্কুল। তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'আমরা আসছি কলকাতা থেকে।' আদিত্য আলাপ জমানোর ভঙ্গীতে জানাল। 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

'আমার গ্রাম এই সামনেই। তা আপনারা সেই কলকাতা থেকে এতদূর এসেছেন বনবীথি ইস্কুল দেখতে?'

'ঠিক ইস্কুল দেখতে আসিনি। একটা জরুরি কাজ আছে। ওই ইস্কুলে একজন খুব ফরসা দিদিমনি পড়াতেন। আপনি জানেন?' এবার পার্থ বলল।

'জানি। মেমদিদি। খুব বেশি দিন তিনি আসেননি, তাও এই তল্লাটে সকলেই চেনে তাকে। তা তিনি নাকি কাউকে কিছু না বলে কোথায় জানি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি তো সব জানেন দেখছি।' আদিত্যর গলায় হালকা বিস্ময়।

'আমি কেন? সকলেই জানে। তাছাড়া আমার মেয়ে তো বনবীথি ইস্কুলেই পড়ে। তা আপনারা মেমদিদিকে চেনেন নাকি?'

'খুব ভালই চিনি। আমরা ওর বন্ধু। ওর খোঁজেই তো এখানে এসেছি।' আদিত্য বলল।

'তা ওর খোঁজে এখানে কেন? উনি কি আর এখানে কোথাও লুকিয়ে বসে আছেন?'

কথাটায় যুক্তি আছে। তাই আদিত্য সরাসরি এর উত্তর দিতে পারল না। প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'আপনাদের এদিকে এবার ইলিশ উঠেছে?'

'ইলিশ? কোথায় ইলিশ? দুচারটে যা উঠছে সব চারশো পাঁচশো গ্রাম। এক কেজির ওপরের ইলিশগুলো সব বেপাত্তা হয়ে গেছে। ওই মেমদিদির মতো।' লোকটা নিজের রসিকতাতেই হেসে উঠলো।

আদিত্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করেছে। লোকটার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চলবে?'

লোকটা আদিত্যদের সামনে উবু হয়ে বসল। নদীর ধারে খুব হাওয়া। দেশলাই জ্বালালেই নিভে যাচ্ছে। হাতের আড়াল দিয়ে হাওয়া আটকে আদিত্য তিন-চারবারের চেষ্টায় নিজের সিগারেটটা ধরালো। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি এটা থেকে ধরান।'

সিগারেট ধরিয়ে লোকটা হাত মুঠো করে একটা লম্বা টান দিল। আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কাছেই থাকেন?'

'এই দুপা গেলেই আমার বাড়ি। আমরা সাত পুরুষের জেলে। ছেলেটাও এখন নদীতে যেতে শুরু করেছে। এখানে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলবে কিরণ দলুই-এর মতো মাছ-ধরিয়ে এ-তল্লাটে আর নেই।'

'কী মাছ ওঠে এখানে? ইলিশ তো উঠছে না বললেন।' পার্থর গলায় অকৃত্রিম কৌতুহল।

'রুই-কাতলা-মিরগেল তো ওঠেই। তাছাড়া ভেটকি ওঠে। বড় ট্যাংরা ওঠে। পাবদা-কাজলি ওঠে। এই তো শীতকাল আসছে। এবার ভাল মাছ উঠবে।'

'মাছ বিক্রি করেন কোথায়?' পার্থ জিজ্ঞেস করল।

'হাসনাবাদে মাছের বড় আড়ত আছে। ওখানেই সব মাছ বিক্রি হয়ে যায়।'

'তাহলে তো আপনাদের কোনও সমস্যাই নেই। ইছামতির মতোই শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবন।' আদিত্যর দ্বিতীয় বাক্যটা খানিকটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল। তাতে হয়ত হালকা শ্লেষও ছিল।

'সমস্যা কেন থাকবে না দাদা? সমস্যা তো জীবনে থাকবেই। মাঝে মাঝে দিনভর জাল ফেলে গেঁড়ি-গুগলি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তখন বুঝে উঠতে পারি না বাজারে কী বিক্রি করব আর ঘরেই বা কী নিয়ে ফিরব? তবে এটুকু দুশ্চিন্তা তো সব জেলেরই আছে। সেসব নিয়ে দিব্যি ছিলাম আমরা। কিন্তু কিছুদিন হল এই এলাকায় নানারকম অপদেবতার উৎপাত দেখা দিয়েছে।'

'অপদেবতার উৎপাত?' আদিত্য খানিকটা উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল।

'অপদেবতার উৎপাত ছাড়া আর কী বলব? গত কয়েক মাসে চারখানা লাশ পড়েছে এখানে। যারা মরেছে তারা সকলেই বাইরের লোক। তবে চারজনই চেনা মুখ। কাজে—কম্মে এখান দিয়ে যাতায়াত করত। কেউ চালের ব্যাপারি, কেউ শাক-সবজির ফড়ে। একজন আবার ভ্যান রিক্সা চালাত। আর একজন দূরের গ্রাম থেকে এসে নদীর ঘাটে মোট বইত। নৌকোতেও কাজ করত। একটা ব্যাপারে কিন্তু সকলের মিল। কাজের খাতিরে চারজনের সবাইকেই রাতবিরেতে বাড়ি ফিরতে হতো।'

'কী করে মারা গেল লোকগুলো?' পার্থ জিজ্ঞেস করল।

'সকলেরই ঘাড় ভাঙা। যেন খুব শক্তিশালী কেউ হাতের চাপ দিয়ে ঘাড়টা মটকে দিয়েছে। এ তো বোঝাই যাচ্ছে অপদেবতার কাজ।'

'পুলিশ আসেনি?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'পুলিশ অনেকবার এসেছিল। কিন্তু এসব ব্যাপারে পুলিশ কী করবে? পুলিশ বলছে এখান দিয়ে নাকি চোরাকারবারিরা বাংলাদেশ থেকে মাল পাচার করে। তাদের নিজেদের মধ্যে বখরার গণ্ডগোল নিয়ে এইসব খুন খারাপি। গ্রামের লোক কিন্তু সেটা বিশ্বাস করে না।'

'গ্রামের লোক কী বিশ্বাস করে?'

'গ্রামের লোক বিশ্বাস করে এখানে তেনারা অনেকদিন ধরে থাকতেন। কারও কোনও ক্ষতি করতেন না। আমরাই তাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছি না। তাই তাঁরা রেগে গেছেন।'

'তেনারা কোথায় থাকতেন?' পার্থ সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে বাড়িটায় এখন বনবীথি ইস্কুল হয়েছে, ওটা খুব পুরোনো একটা বাড়ি। একসময় নীলকুঠি ছিল। তারপর বহু বছর জঙ্গলে ঢাকা পড়ে থাকত। ওখানেই তেনারা থাকতেন। ইস্কুলের মালিক ওই বাড়িটা কিনে সারিয়ে নিয়ে ইস্কুল চালাচ্ছে। তখন থেকেই তেনাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটছে। আমরা খেয়াল করে দেখেছি বনবীথি ইস্কুলটা চালু হবার পর থেকে এই অঞ্চলে অপদেবতার উপদ্রব শুরু হয়েছে।'

'কেউ কি কখনও বনবীথি ইস্কুলে ভূত-টুত কিছু দেখেছে?' পার্থর আবার সরল প্রশ্ন।

'দেখেছে বৈকি বাবু, নিশ্চয় দেখেছে। আমার মেয়ের ক্লাশে একটা মেয়ে পড়ত। দুষ্টুমি করার জন্য তাকে দিদিমনিরা ইস্কুলের একটা ঘরে সারা রাত্তির বন্ধ করে রেখেছিল। সে দেখেছে রাত্তিরবেলা তালগাছের মতো লম্বা লম্বা কিছু লোক ইস্কুলের পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকছে। দিদিমনিরা অবশ্য বলছে এসব বাজে গুজব। গুজব রটানোর জন্য সেই মেয়েটিকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এটাকে গুজব মনে করি না। তাছাড়া গ্রামের প্রায় সক্কলে বিশ্বাস করে মেমদিদিকে তেনারাই গায়েব করে দিয়েছেন। আসলে মেমদিদি চারদিকে বলে বেড়াচ্ছিল যে ইস্কুলে ভূত-টুত কিছু নেই। তাই তেনারা রেগে গেছেন। গ্রামের সবাই তাই ঠিক করেছে একটা বড় করে শান্তি-স্বস্তয়ন করবে। এদিকে তো আবার ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। ইস্কুলের কেরানিবাবু গৌর বাঁড়ুজ্জেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুজো-আচ্চা করেন। তিনি শান্তি-স্বস্তয়ন করতে রাজি হয়েছেন।'

আদিত্য আবার সিগারেট বার করল। তাদের নবলব্ধ মৎসজীবী বন্ধুটিকে আর একটা সিগারেট দিয়ে বলল, 'কিরণবাবু, আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে?'

'নিশ্চয় যাবে। চলুন না, সামনেই আমার বাড়ি। ঝর্ণার ইস্কুল যেতে এখনও ঘন্টাখানেক বাকি আছে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবেন। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। শেষ যে লাশটা নদীর ধারে পাওয়া গেছিল সেটা আমার মেয়ে ঝর্ণাই প্রথম দেখতে পায়।'

ঝর্ণার সঙ্গে কথা বলে আদিত্যরা যখন কিরণ দলুই-এর বাড়ি থেকে বেরোল তখন বনবীথি ইস্কুল বসব বসব করছে।

(২)

পার্থকে সঙ্গে নিয়ে আদিত্য বেলা এগারোটা নাগাদ বনবীথি ইস্কুলে ঢুকল। ঝর্ণা দলুই-এর কাছ থেকে ইস্কুল সম্বন্ধে তার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। নূপুর মণ্ডলকে আগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল বনবীথি ইস্কুলে আদিত্যদের সঙ্গে দেখা হলে সে যেন না চেনার ভান করে। তবে গেট দিয়ে ঢুকেই আদিত্যদের সঙ্গে যার দেখা হল সে নূপুর মণ্ডল নয়, ইস্কুলের ক্লার্ক গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌরবাবুর সঙ্গে পার্থর আগে কয়েকবার দেখা হয়েছে। সেই সুবাদে পার্থকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। নমস্কারের ভঙ্গীতে দুই হাত বুকের ওপর জড়ো করে বললেন, 'আরে, আসুন আসুন। ভাল আছেন তো?' তারপর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?'

'ইনি আমার বন্ধু আদিত্য মজুমদার। পেশায় বেসরকারি গোয়েন্দা, চন্দ্রার ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছেন।' পার্থ আলাপ করিয়ে দিল, 'আর ইনি গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবীথি স্কুলের অফিসটা দেখাশোনা করেন, এর কথা তো তোকে আগেই বলেছি।'

আদিত্য হাত তুলে নমস্কার করল। নূপুর আর ঝর্ণার কথা শুনে গৌর বাঁড়ুজ্জে সম্বন্ধে তার মনে যে ছবিটা তৈরি হয়েছিল আসল লোকটার সঙ্গে তার পুরো মিল না থাকলেও খানিকটা মিল আছে। সে লক্ষ করল গৌরবাবুর উচ্চতা বেশি নয়, সাড়ে পাঁচ ফিটও পুরো হবে না, গৌরবর্ণ, ঈষৎ নাদুসনুদুস, উন্নতনাসা, মাথা

ভর্তি উস্কোখুস্কো, কাঁচাপাকা চুল, গোলমরিচের সঙ্গে নুন মেশালে যেমন হয়। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, সরল দৃষ্টি। আদিত্য বলল, 'চন্দ্রার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। হাতের দুএকটা কাজ সেরে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে বসছি। চলুন ততক্ষণ একটু আপিস ঘরে বসবেন। চা খাবেন তো?'

আপিস ঘরে জায়গা খুব বেশি নেই। চেয়ারও একটা। সম্ভবত গৌরবাবুই সেটাতে বসেন। আর দুটো টুল আছে। গৌরবাবু খুব কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'চেয়ার তো একটার বেশি নেই, একজনকে মনে হয় টুলে বসতে হবে।'

'কোনও ব্যাপারই না। আমি টুলে বসছি।' পার্থ এগিয়ে গিয়ে টুলে বসল। বলল, 'আপনি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে আসুন।'

আদিত্য চেয়ারে না বসে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। কিরণ দলুই ভুল বলেনি। সত্যিই পুরোনো আমলের কড়ি-বরগা দেওয়া বাড়ি। দু-একটা জায়গায় দেয়ালের চুন খসে গিয়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। ছোট চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ইঁট। দেখে মনে হয়, বাড়ির বয়েস অন্তত দুশো বছর। এত পুরোনো বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, এটা আশ্চর্য। কিংবা হয়ত পুরোনো বলেই এখনও টিকে আছে।

লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা এক ব্যক্তি মাটির ভাঁড় ও চায়ের কেটলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। সাদা চুল, বলিষ্ঠ চেহারা, কষ্টিপাথরের মতো কালো গায়ের রং। আদিত্য আন্দাজ করল এ এই ইস্কুলের দরোয়ান, সফিকুল। সে মুখে বলল, 'আপনি সফিকুল?'

'হ্যাঁ সাহেব।'

আদিত্যর মনে হল সফিকুল অল্পকথার মানুষ। তাছাড়া কৌতুহল ব্যাপারটা তার মধ্যে নেই, কারণ সে একবারও জিজ্ঞেস করল না আদিত্যরা কে, তারা কেন এখানে এসেছে, সফিকুল নামটার সঙ্গে তাদের পরিচয়ই বা কী ভাবে ঘটল। এরকম অধীনতাবোধ বোধহয় একমাত্র মিলিটারিতেই সম্ভব। তবু সে খানিকটা ব্যাখ্যা করার মতো করে বলল, 'আপনি তো জানেন চন্দ্রা দিদিমনিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ওর ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে এসেছি।'

সফিকুল উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আদিত্য আন্দাজে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মিলিটারি থেকে কবে রিটায়ার করেছেন?'

'বছর দশেক হল সাহেব।'

আদিত্যর আন্দাজ মিলে গেছে। পার্থ অবাক হয়ে আদিত্যর দিকে তাকাল। সফিকুল নির্বিকার।

'এখানে কত বছর হল?'

'তিন বছর পুরো হয়নি।'

'তার আগে কী করতেন?'

'বেশ কিছুদিন বর্ধমানে একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে গানম্যানের কাজ করেছি। চা-টা ঢালব?'

মনে হল সফিকুল তার নিজের অতীত নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চায় না। উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ভাঁড়ে চা ঢালল। চা টেবিলে রেখে ফাঁকা কেটলি নিয়ে চলে যেতে যাবে, আদিত্য তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়ান, আরও দুএকটা জিনিস জানার আছে।'

সফিকুল দাঁড়িয়ে পড়ল। অ্যাটেনশন বললে ফৌজিরা যেভাবে দাঁড়িয়ে যায়, প্রায় সেইভাবে।

আদিত্য বলল, 'সিকিউরিটি কম্পানিতে আপনি কী কাজ করতেন?'

'বললাম তো। গানম্যানের কাজ করতাম।'

'গানম্যানের দরকার পড়ত কেন?'

'কম্পানির কাজ ছিল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে গাড়ি করে চেস্ট-এ পৌঁছে দেওয়া। আমি গাড়িতে বন্দুক নিয়ে থাকতাম।'

'চাকরি ছাড়লেন কেন?'

'বয়েস হয়ে যাচ্ছিল। আমার বাড়ি বসিরহাটে। সেখানে আমার ছেলে, ছেলের বৌ থাকে। দুটো নাতি আছে। তাদের কাছাকাছি থাকতে চাইছিলাম।'

'আপনার স্ত্রী?'

'আমার বউ অনেকদিন আগে মারা গেছে।'

'অন্য একটা প্রশ্ন। আপনি তো রাত্তিরে গেটের পাশের ঘরটাতে থাকেন। কখনও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে?'

সফিকুল অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'না, তেমন কিছু আমার কখনও চোখে পড়েনি।'

'একটু ভাল করে ভেবে দেখুন। একটা গুজব রটেছে, ইস্কুলে নাকি ভূত আছে। আপনি কিচ্ছু দেখেননি?'

'ভূত-প্রেত-জিন এসব বানানো কথা। আমি এসব বিশ্বাস করি না। না সাহেব, আমি কিচ্ছু দেখিনি।'

'ঠিক আছে সফিকুল ভাই। আপনি এখন আসতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ।'

পার্থ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সফিকুল চলে যেতে মৃদুস্বরে বলল, চা-টা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।'

গৌর বাঁড়ুজ্জে ফিরে এল আধঘন্টা পরে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বলল, 'ছোড়দিদি হিসেব দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল। তাই দেরি হয়ে গেল। আপনারা চা খেয়েছেন?'

'আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা হাতে সময় নিয়েই এসেছি। আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে দিদিদের সঙ্গে কথা বলব। আমরা এসেছি ওরা জানেন তো?' আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল।

'জানেন। তবে বড়দিদি নেই। কলকাতায় গেছেন। কালকে ফিরবেন। আমি ছোড়দিদিকে বলে দিয়েছি। একটা কথা বলি। এখানে কথা বলার একটু অসুবিধে। জায়গা নেই। চেয়ার নেই। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে আমার বাড়ি গিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। ইস্কুলের পেছন দিকে আমার বাড়ি। এখান থেকে দুপা।'

'আপত্তি নেই। চলুন।' কথাটা বলে আদিত্য পার্থর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হয় আমার বন্ধুরও আপত্তি হবে না।'

দেড় কামরার বাসা। একটা শোবার ঘর, আর বাকি আধখানাতে রান্নাবান্না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা মাটিতে। বসার ব্যবস্থা শোবার ঘরে। গৌরবাবুর বাসাবাড়িটা ছোট হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শোবার ঘরে তক্তোপোষ পাতার পর যেটুকু জায়গা বেঁচেছে তার মধ্যে একটা উঁচু টুল আর দুটো মোড়া রাখার জায়গা হয়েছে। টুলের ওপর একটা টেবিল ফ্যান শব্দ করে ঘুরছে। মোড়াগুলো বেশ নিচু, বসে আরাম নেই। সেটা আন্দাজ করে আদিত্য তক্তপোষের একদিকে বসে পড়ল, তার দেখাদেখি পার্থও তক্তপোষের অন্য দিকে বসল। ঘরের মাঝখান দিয়ে আড়াআড়িভাবে টাঙানো দড়িতে গৌরবাবুর ধুতি, গামছা, লুঙ্গি ঝুলছে। গৌরবাবু লজ্জিতভাবে সেগুলো এক কোণে সরিয়ে দিয়ে একটা মোড়ার ওপর বসলেন।

'আপনি তো জানেন আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। চন্দ্রা সেনের হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা তদন্ত করছি। আমার বন্ধু পার্থ সান্যাল এই কাজে আমাকে নিযুক্ত করেছে।' আদিত্য শুরু করল।

গৌর বাঁড়ুজ্জে কথা না বলে শুধু শুনছে। আদিত্যর প্রশ্নের অপেক্ষা করছে।

'চন্দ্রাকে আপনি কতটা চিনতেন?'

'অন্য দিদিমনিদের থেকে চন্দ্রা দিদিমনিকে অনেক বেশি চিনতাম। চন্দ্রা দিদিমনি আমার দুটো বাড়ি পরে থাকতেন। অন্য দিদিমনিরা যেমন ইস্কুল শেষ হলে এখান থেকে চলে যেতেন, চন্দ্রা দিদিমনি সেরকম নয়। তাই তার সঙ্গে অনেক বেশি দেখা হতো। কথাবার্তাও হতো অনেক বেশি। বলা যায়, বিপদে আপদে তিনি আমার ওপরেই নির্ভর করতেন।'

'মানুষ হিসেবে চন্দ্রাকে আপনার কেমন মনে হত?'

'চমৎকার মানুষ। অন্য দিদিমনিদের সঙ্গে চন্দ্রা দিদিমনির বেশ তফাত ছিল। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে, তবু বলব, অন্য দিদিমনিদের কাছে ইস্কুলের কাজটা হচ্ছে পেটের দায়ে করা চাকরি। চন্দ্রা দিদিমনির কাছে ইস্কুলের কাজটা ছিল সখের, মানে, ঠিক সখেরও নয়, ভালবাসার তাগিদে করা চাকরি। অত যত্ন করে আর কেউ মেয়েদের পড়াতেন না। এটা আমি মেয়েদের কাছ থেকেই শুনেছি। তাছাড়া চন্দ্রা দিদিমনি যতটা লেখাপড়া জানতেন, অন্য দিদিমনিরা তার অর্ধেকের অর্ধেকও জানতেন না। মনে হয়, চন্দ্রা দিদিমনির নিজস্ব টাকা-পয়সা অনেক ছিল, তাই তাঁকে ইস্কুলের মাইনের ওপর নির্ভর করতে হতো না। কিন্তু যেটা সব থেকে বড় কথা, নিজের বিদ্যে বা টাকা-পয়সা নিয়ে চন্দ্রা দিদিমনির বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন। এমনকি আমার মত অতি নগন্য একজন পাড়া-গাঁয়ের ইস্কুলের কেরানির সঙ্গেও সমানের মতো মিশতেন। এমনভাবে মিশতেন যে মনে হত আমি যেন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, টাকা-পয়সায় তারই মত একজন কেউ। এর জন্য আমি তার কাছে খুব কৃতজ্ঞ।' কথাগুলো বলতে বলতে গৌরবাবুর গলাটা ধরে এল।

আদিত্য গৌরবাবুকে স্বাভাবিক হবার জন্য কিছুটা সময় দিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো জানেন, হারিয়ে যাবার কিছুদিন আগে দু-দুবার চন্দ্রা নেহাত ভাগ্যের জোরে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। আপনার কি মনে হয় কেউ চন্দ্রাকে খুন করার চেষ্টা করছিল?'

'চন্দ্রা দিদিমনির মতো মানুষকে কে খুন করতে চাইবে দাদাভাই?' গৌরবাবুর গলার আওয়াজটা রীতিমত বিপন্ন শোনাল। তারপর প্রশ্নের ওজনটা একটু সামলে নিয়ে গৌরবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'চন্দ্রা দিদিমনি হারিয়ে যাবার পর পুলিশ এসে একই প্রশ্ন করেছিল। আমি তাদের আসল উত্তরটা দিতে পারিনি। আসল কথাটা বললে আমাকে তারা বিশ্বাস করত না। কিন্তু আপনারা চন্দ্রা দিদিমনির আপনজন। আপনাদের আমি সত্যি কথাটাই বলব। বিশ্বাস করা না করা অবশ্য আপনাদের হাতে।'

বাইরে গাড়ির শব্দ। মনে হয় সরু রাস্তা দিয়ে ভারি কোনও গাড়ি সাবধানে এগিয়ে আসছে। আদিত্য গাড়ির শব্দ শুনে বাইরে তাকাল। তাই দেখে গৌরবাবু বললেন, 'আজ তো মঙ্গলবার, তাই মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে লরি এসেছে। আমি সফিকুলকে বলে এসেছি। সে-ই সব সামলে দেবে।'

আদিত্য গভীর কোনও চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। গৌরবাবুর কথায় বাস্তবে ফিরে এসে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি আসল কথাটা বলবেন বলছিলেন।'

'যেটা বলতে যাচ্ছিলাম দাদাভাই সেটা আমার নিজের চোখে দেখা। তবে অনেকে আমার কথাটা বিশ্বাস করেনি। আমার বাড়িটা দেখছেন তো? জানলা দিয়ে ইস্কুলের পেছন দিকটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইস্কুলের পেছনে ওই অশথ গাছটা দেখছেন, ওইটা খুব গণ্ডগোলের গাছ। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, ওই গাছটাতে কয়েকজন অতৃপ্ত আত্মা বাস করেন।'

'অতৃপ্ত আত্মা!' পার্থর গলা শুনে মনে হল সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে।

'ওই যে বললাম। আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আমি কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি।'

'কী দেখেছেন সেটা বলুন।' আদিত্য খানিকটা ব্যগ্রভাবে বলল।

'ওই গাছে কয়েকজন অতৃপ্ত আত্মা আছেন। তাঁরা যখন মাটিতে নামেন তখন দেখেছি তাদের মাথা দোতলা ছাড়িয়ে যায়। মাঝরাত্তিরে মাঝে মাঝে বাথরুম করতে উঠে দেখেছি তাঁরা গাছ থেকে নেমে নদীর দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু এদের অতৃপ্ত কেন বলছেন?'

'অতৃপ্ত বলছি কারণ এঁরা মানুষ পছন্দ করেন না। এঁদের সামনে কেউ পড়লে তার আর নিস্তার নেই। জানেন তো এই অঞ্চলে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে? অতৃপ্ত আত্মারাই এদের মেরেছে। আর সব কটা মৃত্যুই ওই গাছটার নিচে ঘটেছে।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি শেষ মৃতদেহটা নদীর ধারে পাওয়া গিয়েছিল।' আদিত্য সন্দেহের গলায় বলল।

'আপনি ঠিক শুনেছেন দাদাভাই। কিন্তু পুলিশকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন মৃত্যুটা ঘটেছিল ওই গাছটার নিচে। লোকটা মারা যাবার পর তার শরীরটাকে অতৃপ্ত আত্মারা টেনে-হিঁচড়ে নদী অব্দি নিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবার চিহ্ন দেখতে পেয়েছে।'

'অতৃপ্ত আত্মারা মানুষের ওপর এত রেগে আছে কেন?' পার্থ সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

'কারণ আছে দাদাভাই, যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের ইস্কুলবাড়িটা একসময় নীলকুঠি ছিল। নীল বিদ্রোহের সময় নীলকুঠির কয়েকজন সাহেবকে এখানে পুড়িয়ে মারা হয়। তাদের অতৃপ্ত আত্মা এখানেই বাস করত। কারো কোনও ক্ষতি তারা করত না। তারা যে ঘরটাতে বাস করত সেটা বন্ধই থাকত। সকলেই জানত ওই ঘরটাতে ঢুকতে নেই। কিন্তু কিছুদিন আগে চন্দ্রা দিদিমনি ওই ঘরটা খুলিয়ে, পরিষ্কার করিয়ে ওটাতে মেয়েদের ইংরেজি শেখার ক্লাশ নিতে শুরু করেন। তখন থেকেই অশান্তি। সেই অতৃপ্ত আত্মারা তাদের এত বছরের থাকার জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন ওই অশথ গাছে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। সমস্ত মানুষের ওপর তাদের রাগ।'

'আপনার কথা ঠিক হলে তো চন্দ্রার ওপরেই ওই আত্মাদের সব থেকে বেশি রাগ হওয়া উচিত। ও-ই তো ঘর থেকে আত্মাদের তাড়িয়েছে।' আদিত্য চিন্তিত গলায় বলল।

'চন্দ্রা দিদিমনির ওপর তাদের রাগ কি কম? আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না কে চন্দ্রা দিদিমনিকে মারতে চাইবে, আমি সেই প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি। ওই অতৃপ্ত আত্মারা দু-দুবার চন্দ্রা দিদিমনিকে মারতে চেষ্টা করেছে। বিশ্বাস করুন, শুধু আমার জন্যে পারেনি।'

'আপনার জন্যে পারেনি? কীভাবে?' পার্থ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তাহলে আমার জীবনের কাহিনিটা একটু বলি দাদাভাই। আমাদের দেশ বর্ধমান জেলার রায়নায়। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। কাকার বাড়িতে থাকতাম, কেউ ভালবাসত না। গলার কাঁটা মনে করত। মাধ্যমিক পাশ করার পর লেখাপড়ায় আর মন বসল না। ছোটবেলা থেকেই আমার সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ খুব ভাল লাগত। ইলেভেন ক্লাশে পড়ার সময় এক সাধুদের দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে পালালাম। কেউ খোঁজও করল না আমি কোথায় গেলাম। কাকা-কাকি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারও ভালবাসা না পেয়ে বেঁচে থাকাটা যে কী দারুণ কষ্টের সেটা আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না, দাদাভাই।'

গৌর বাঁড়ুজ্জে একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'কতদিন সাধুদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরলাম তার হিসেব নেই। এক সাধুদের দল ছেড়ে অন্য সাধুদের দলে গেলাম। হিমালয়ের পায়ের নিচে এক জঙ্গলে অনেক দিন কাটালাম। নর্মদার তীরে প্রায় এক বছর কাটল। সাধুদের সকলে ভাল লোক নয়। অনেক খারাপ লোক পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য সাধু সেজে লুকিয়ে থাকে। তাদের থেকে সাবধানে থাকতে হয়। আবার কিছু সত্যিকারের সাধুও আছেন। তাদের আশ্চর্য সব ক্ষমতা। তবে সংখ্যায় তাঁরা খুবই অল্প। আমার পরম সৌভাগ্য একজন সত্যিকারের সাধুর সন্ধান পেয়েছিলাম। উনি একা একাই থাকতেন। বাঙালি। আমি গিয়ে ওঁর পায়ে পড়ে গেলাম। বললাম, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন। আমি শুধু আপনার সেবা করব। উনি কিছুতেই রাজি হতে চান না, আমিও নাছোড়। শেষে এক মাস ধরে পেড়াপেড়ি করার পর উনি রাজি হলেন। সেই গুরুর সঙ্গে আমি প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়েছি। অনেক মন্ত্র-তন্ত্র শিখেছি। গুরুর কাছে শেখা কিছু মন্ত্র পড়ে আমি চন্দ্রা দিদিমনির জন্য শান্তি-স্বস্তয়ন করেছিলাম। আর কেউ না জানুক আমি জানি ওই স্বস্তয়নের জোরেই চন্দ্রা দিদিমনি দু-দুবার বেঁচে গেছেন।'

'আপনি সাধুর জীবন ছেড়ে আবার গৃহীর জীবনে ফিরে এলেন কেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সে আরেক গল্প। পাঁচ বছর পর একদিন গুরু আমায় বললেন, শোন, সন্ন্যাসীর জীবন তোর জন্যে নয়। তুই সংসারে ফিরে যা। ফিরে গিয়ে গরীব বাচ্চাদের সেবা কর। তাতেই তোর মুক্তি। আমি তোকে কলকাতার একটা ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। এই ঠিকানায় গিয়ে রণবীর রায়ের সঙ্গে দেখা করবি। আমার কথা বলবি। গরিব

মেয়েদের জন্যে এ অনেকগুলো ইস্কুল চালায়। কোনও একটা ইস্কুলে তোর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। ওখানেই তুই ভাল থাকবি, শান্তিতে থাকবি। গুরুর কথা মেনে আমি সংসারে ফিরে এসেছি। বনবীথি ইস্কুলে চাকরি পেয়েছি। এখানকার ছোট ছোট মামনিরা আমাকে খুব ভালবাসে। আমিও তাদের খুব ভালবাসি। খুব শান্তিতে আছি। গুরুর কথা সত্যি হয়েছে।'

গৌরবাবু থামলেন। আদিত্য এক মনে একটা কিছু ভাবছে। ঘরে শুধু টেবিল ফ্যান ঘোরার শব্দ। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আদিত্য বলল, 'রণবীর রায়, মানে এই ইস্কুলগুলো যিনি চালান, তাঁর ঠিকানাটা আপনার কাছে পাওয়া যাবে?'

গৌরবাবু মনে হল প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু থেমে বললেন, 'আমার কাছে এক সময় তো ছিল। কিন্তু এখন বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি। তবে ঠিকানাটা আপিসে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আপনারা তো এখন ওইদিকেই যাবেন। আমি ওখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি।'

'আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনি বলছেন অতৃপ্ত আত্মারা চন্দ্রার ক্ষতি করতে চাইছিল?'

'হ্যাঁ দাদাভাই। চন্দ্রা দিদিমনিই তো ওই ঘরটা খুলিয়েছিল। ওঁরা তো চন্দ্রা দিদিমনির ক্ষতি করতে চাইবেই।'

'তাহলে কি আপনার মতে ওরাই চন্দ্রাকে গায়েব করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ দাদাভাই। এছাড়া আর কী হতে পারে? তবে চন্দ্রা দিদিমনিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি নিয়মিত স্বস্ত্যয়ন করছি।'

'তাহলে আপনার মনে হয় চন্দ্রা ফিরে আসতে পারে?' এবার পার্থর ব্যগ্র প্রশ্ন।

'গুরুর মন্ত্রে সবই সম্ভব দাদাভাই। তবে আমি যত চন্দ্রা দিদিমনিকে আগলাবার চেষ্টা করছি, ওই অতৃপ্ত আত্মারা আমার ওপর তত রেগে যাচ্ছেন। চন্দ্রা দিদিমনি ফিরে এলেও আমার বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে আমি ভাবি না।'

'আর একটা প্রশ্ন। একটু ব্যক্তিগত। ইচ্ছে না হলে উত্তর দেবার দরকার নেই। এখান থেকে আপনি কত টাকা মাইনে পান?' আদিত্য আচমকা জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্ন শুনে গৌরবাবু অবাক। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আগে সাড়ে ছয় হাজার দিত, এবছর থেকে সাত হাজার হয়েছে।' তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'ওতে আমার ভালোই চলে যায়, দাদাভাই। একা মানুষ, চাহিদাও বেশি নয়। এই পাড়াগাঁয় জিনিসপত্রের দামও আপনাদের শহরের থেকে অনেক কম। তাছাড়া এ-তল্লাটে ব্রাহ্মণ নেই বলে পুরোহিত পাওয়া যায় না। বাড়িতে পুজো-পার্বণ থাকলে লোকে আমাকেই ডাকে। সেখান থেকেও কিছু আয় হয়।'

(৩)

'চন্দ্রা আমাদের থেকে বয়েসে অনেক ছোট হলেও আমাদের অভিভাবকের মতো ছিল,' বনবীথি ইস্কুলের ছোড়দিদি সুপ্রভা দে বলছিলেন, 'চন্দ্রা ইস্কুলটাকে আগলে আগলে রাখত। ইংরিজিতে চিঠিপত্র লেখাই হোক বা ইস্কুল ডিপার্টমেন্টের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, চন্দ্রা এই ইস্কুলে আসার পর থেকে এইসব কাজ সে-ই করত।'

বনবীথি ইস্কুলের বড়দিদি অনিমা সামন্ত কলকাতায় গেছেন। আগামীকাল ফিরবেন। এ যাত্রা তার সঙ্গে কথা বলা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তার বদলে স্টাফ রুমে বসে ছোড়দিদি সুপ্রভা দের সঙ্গে আদিত্যরা কথা বলছিল।

'একবার একটা গবেষণার দল ইস্কুল দেখতে এল। দলে একজন মেম, একটা সাহেব আর দুজন বাঙালি। তারা গরিব মেয়েদের নিয়ে গবেষণা করছে। গরিব মেয়েরা কেমন লেখাপড়া করছে, লেখাপড়া শিখে তারা নিজেদের বাড়িতে বেশি খাতির-যত্ন পাচ্ছে কিনা, তাদের বিয়ের বয়েসটা বাড়ছে কিনা এইসব তাদের প্রশ্ন।

দেখলাম সাহেব-মেমের সঙ্গে চন্দ্রা গড়গড় করে ইংরিজিতে কথা বলে গেল। এই পাড়াগাঁয়ে ওরকম ইংরিজি শুনে তারা তো অবাক।'

'চন্দ্রার কি এখানে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল? মানে, হঠাৎ যে সে এইভাবে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেল, এই ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?' আদিত্য সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা শুনে ছোড়দিদি খানিকটা থমকে গেল। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। এই প্রশ্নটা নিয়ে আমিও অনেক ভেবে দেখেছি। উত্তর পাইনি। এখানে চন্দ্রাকে তো বেশ সুখীই মনে হতো।'

'এই ইস্কুল সম্বন্ধে একটা কথা চালু আছে। এর চারপাশে নাকি অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। এ-ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?'

'এইসব বাজে কথা যারা ছড়াচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য অতি জঘন্য।' ছোড়দিদির গলাটা রীতিমত উত্তেজিত শোনাল। 'দেখুন, এই অঞ্চলে মর্নিং ডিউ বলে একটা ইংরিজি মিডিয়াম ইস্কুল আছে। নামেই ইংরিজি মিডিয়াম। পড়াশোনা হয় অষ্টরম্ভা। তবু ছেলেমেয়ে ইংরিজি শিখে চাকরি-বাকরি পাবে এই আশায় গ্রামের লোক ঘটিবাটি বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের ইংরিজি মিডিয়াম ইস্কুলে পাঠাত। চন্দ্রা এখানে আসার পর ছবিটা একেবারে বদলে গেছে। চন্দ্রা আমাদের মেয়েদের খুব যত্ন করে ইংরিজি শেখায়। অঙ্ক শেখায়। মর্নিং ডিউ ইস্কুলের কোনও টিচার ওর নখেরও যুগ্যি নয়। গ্রামের মানুষ সেটা বোঝে। তাই এখন গ্রামের সকলে তাদের মেয়েদের বনবীথি ইস্কুলেই পাঠাচ্ছে। ফলে মর্নিং ডিউ-এর ব্যবসা প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। ফলে ওই ইস্কুলের মালিকই এসব আজগুবি গল্প রটাচ্ছে। নেহাত আমরা ছেলেদের নিই না বলে। নইলে ছেলেরাও এখানেই আসত। আর ছেলেরাও এখানে পড়লে মর্নিং ডিউ একেবারে বন্ধ হয়ে যেত।'

'কীভাবে এই আজগুবি গল্পগুলো রটছে বলে আপনার মনে হয়?'

'কিছুদিন আগে আমাদের ইস্কুলেরই একটি মেয়ে এইসব গল্প রটাতে শুরু করেছিল। মেয়েটির রেকর্ড ভাল নয়। নানা অপকর্ম করে আগেও কয়েকবার ধরা পড়েছিল। পড়াশোনাতেও মা গঙ্গা। আমাদের ধারণা, ইস্কুলে ভূত আছে, অপদেবতা আছে এইসব গল্প রটানোর জন্যে মর্নিং ডিউ ইস্কুলের মালিক ওকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছিল। মেয়েটি অবশ্য সেসব কিছু স্বীকার করেনি। আমরা মেয়েটিকে ইস্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিলাম। ও তখন গ্রামের লোকেদের মধ্যে ওইসব গল্প রটাতে লাগল। এতে আমাদের বেশ ক্ষতি হল। বেশ কিছু মেয়ে ইস্কুল ছেড়ে চলে গেল। গ্রামের মানুষদের মন কুসংস্কারে ভর্তি এটা তো স্বীকার করবেন?'

'এখনও কি বনবীথি ইস্কুলের মধ্যে কেউ আছে যে এই গল্পগুলো রটাচ্ছে?'

উত্তরটা দিতে ছোড়দিদি খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'আছে। কেউ কেউ আছে।'

'তাদের নাম বলা যাবে?' আদিত্য কৌতুহলী গলায় জিজ্ঞেস করল।

'আমার বলতে অসুবিধে নেই। একজন আমাদেরই সেলাই দিদিমনি সোনালী সাঁতরা, আর একজন আমাদের কেরানিবাবু গৌর বাঁড়ুজ্জে।'

'এমন তো হতে পারে এরা সত্যিই বিশ্বাস করে ইস্কুলে এবং তার আশেপাশে অশরীরী আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে?' পার্থ সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

'না, না। ব্যাপারটা এতটা সোজা নয়। গৌর বাঁড়ুজ্জে বা সেলাই দিদিমনি দুজনেই অভাবী মানুষ। দুচার পয়সা দিয়ে এদের কিনে নেওয়া খুবই সহজ কাজ। আর আমার স্থির বিশ্বাস সেটাই হয়েছে।'

'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে ওই ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের মালিকই চন্দ্রাকে সরিয়ে দিয়েছে?' প্রশ্নটা করতে করতে পার্থ যেন নিজেই শিউরে উঠল।

''এটাও আমি অনেক ভেবে দেখেছি। সম্ভাবনাটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং আমি বলব এটা হবার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি। এটা ছাড়া চন্দ্রার হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াটা কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।'

'দুএকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার বাড়ি কোথায়?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমার বাড়ি বসিরহাটে। সেখান থেকেই আমি রোজ ইস্কুলে আসি।'

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'বাড়িতে থাকি আমি আর আমার স্বামী। আমাদের দুটি ছেলে, দুজনেই বাইরে চাকরি করে। একজন কলকাতায়, একজন ব্যাঙ্গালোরে। আমার স্বামী বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করতেন। বছর খানেক হল রিটায়ার করেছেন।'

'একটা শেষ প্রশ্ন। বড়দিদির সঙ্গে তো কথা হল না। হলে ওঁকেই জিজ্ঞেস করতাম। আপনার মতো কি বড়দিদিও বিশ্বাস করেন, গুজব ছড়ানোর পেছনে মর্নিং ডিউ ইস্কুলের মালিকই আছে বা চন্দ্রার হারিয়ে যাওয়ার পেছনেও তার হাত থাকতে পারে?'

'একশ পার্সেন্ট বিশ্বাস করেন। বস্তুত বড়দিদিই আমার মাথায় এই সন্দেহগুলো প্রথম ঢুকিয়েছেন।'

'অনেক ধন্যবাদ সুপ্রভাদি। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনি এবার একটু সেলাই দিদিমনিকে পাঠিয়ে দেবেন?'

সেলাই দিদিমনি সোনালী সাঁতরা মনে হয় বাইরেই অপেক্ষা করছিল। ছোড়দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল সে। আদিত্যর সন্দেহ হল, সেলাই দিদিমনি বোধহয় আড়ি পেতে আদিত্যদের কথাবার্তা শুনছিল।

'বসুন। চন্দ্রার হারিয়ে যাবার ব্যাপারে আমরা আপনাকে দুএকটা প্রশ্ন করব।'

সেলাই দিদিমনি সসঙ্কোচে চেয়ারের একধারে বসল। ক্ষয়াটে খর্বকায় চেহারা। সারা অঙ্গে দারিদ্রের চিহ্ন স্পষ্ট। তার ওপর মুখে-চোখে পরিষ্কার ভয়ের ছাপ।

'আপনাকে তো ছাত্রীরা সোনাদিদি বলে? আমরাও তাই বলব, কেমন?'

সোনালী সাঁতরা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। আদিত্য কথাবার্তা শুরু করার জন্য সহজ প্রশ্ন করল, 'আপনার বাড়ি কতদূরে?'

'আমার বাড়ি খুব কাছে। এই সোলাডাঙায়।' সোনাদিদির গলার আওয়াজ এতই ক্ষীণ যে শোনাই যায় না।

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'মা আছে, আমার বোন আছে আর আমি।' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ সোনাদিদি কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'দাদা, আমার কোনও দোষ নেই। এটা ঠিক যে আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ ভূত-প্রেত-অপদেবতায় বিশ্বাস করি। তাছাড়া আমি যেটা নিজের চোখে দেখেছি সেটা তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না। হয়ত তা নিয়ে দুচারটে কথা এদিক-ওদিক বলেছি। কিন্তু টাকা নিয়ে ইস্কুলের ক্ষতি করব এমন মানুষ আমি নই। বড়দিদি ছোড়দিদি দুজনেই বলছে আমি মর্নিং ডিউ ইস্কুলের থেকে টাকা খেয়ে বনবীথি সম্বন্ধে গুজব ছড়াচ্ছি। তাই ওরা আমাকে আর রাখতে চায় না। কিন্তু আমি কেন একাজ করতে যাব? যে ইস্কুল থেকে আমার রুটি-রুজির ব্যবস্থা হচ্ছে তাকে বন্ধ করে দিয়ে আমার কী লাভ? দাদা, আমার পুরো পরিবারের পেট চলে আমার রোজগারের টাকায়। আমার চাকরি চলে গেলে পুরো পরিবারটা না খেয়ে মরবে। আপনারা বড়দিদি আর ছোড়দিদিকে একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'আপনি নিজের চোখে কী দেখেছেন?'

'আমি কিছু দেখিনি। আমি কিচ্ছু দেখিনি।'

সোনালী সাঁতরাকে দিয়ে আর কিছু বলানো গেল না। কিন্তু তার নীরবতা বলে দিচ্ছিল সে অনেক কিছু দেখেছে।

সোনালী সাঁতরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ছোড়দিদি আবার ঘরে ঢুকল। বলল, 'আর একজন দিদিমনি এখানে অতি সম্প্রতি এসেছেন। তাকে ডাকব?'

'না তার দরকার হবে না,' আদিত্য বলল, 'তিনি তো একেবারে হালে এসেছেন। চন্দ্রাকে কখনও চোখেই দেখেননি। তাকে আর কী জিজ্ঞেস করব?'

আদিত্য ঘড়ি দেখল। দুপুর আড়াইটে বেজে গেছে। এখনও তাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। বসিরহাটে গেলে মনে হয় কিছু একটা খাবার পাওয়া যাবে। একবার বসিরহাট পুলিশ স্টেশনেও যাওয়া দরকার। যে এস আই চন্দ্রার ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছে সে হয়ত নতুন কোনও খবর দিতে পারে। দেখা যাক পার্থ কী বলে।

(৪)

বসিরহাট থানার সামনে কী একটা ঝামেলা চলছে। ঝাণ্ডা নিয়ে গোটা পঞ্চাশেক লোক খুব উত্তেজিত হয়ে স্লোগান দিচ্ছে আর পুলিশের বাপান্ত করছে। আদিত্য শুনতে পেল কোন পলিটিকাল গুণ্ডাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে বলে এত আক্রোশ। একটু আগে সে আর পার্থ একটা অতীব নিকৃষ্ট লাঞ্চ খেতে বাধ্য হয়েছিল। অত বেলায় এর থেকে ভাল কিছু পাওয়া গেল না। ভাতটা শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গিয়েছিল, ডাল বলে যেটা দিয়েছিল সেটাতে ডালের থেকে ভাতের ফ্যান বেশি ছিল। বেগুন ভাজাটা ছিল পাথরের মতো শক্ত এবং ঠাণ্ডা আর কাটা পোনা বলে যেটা দিল সেটা অন্তত এক মাস বরফে রাখা নির্ভেজাল চারাপোনা। খাওয়া শেষ করে আদিত্য পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পার্থ আসেনি। সে গাড়িতে বসে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। আদিত্যকে বলল, 'আমি থাকলে পুলিশ তোর সঙ্গে ভাল করে কথাই বলবে না।' আসলে ওর ঘুমোনোর ইচ্ছে।

দূর থেকে দেখে আদিত্য ভেবেছিল থানাতে বুঝি ঢুকতেই পারবে না। কাছে গিয়ে দেখল আন্দোলনকারীরা থানায় ঢোকার মেন দরজাটা অবরোধের বাইরে রেখেছে। সেখান দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে। আদিত্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে থানার ভেতরে ভীড়, বিরাট বিশৃঙ্খলা। বড়বাবুর টেবিল ঘিরে কিছু লোক উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। মনে হয়, এরা অবরোধকারিদের মাতব্বর কিছু নেতা, পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে এসেছে। আদিত্য ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে একজন উর্দিপরা অফিসার এগিয়ে এসে রুক্ষভাবে বলল, 'কী চাই?'

'একটা তদন্তের ব্যাপারে এস আই সম্বিত কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। লালবাজার থেকে বলা আছে। ইন্সপেক্টর সঞ্জয় সমাদ্দার বলে দিয়েছেন।'

'লালবাজার শুনে লোকটা খুব একটা বিচলিত হয়েছে বলে মনে হল না। দায়সারাভাবে বলল, 'কুণ্ডু একটা ইনভেস্টিগেশনে করিমপুর গেছে। ফিরতে রাত্তির হবে। আপনি বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন।'

বড়বাবুর কাছে পৌঁছনো অবশ্য সহজ নয়। তাকে ঘিরে ডজন খানেক লোক তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আদিত্য সেই লোকগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে কখন বড়বাবু একটু ফাঁকা হবে সেই সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর আদিত্যর ভাগ্য খুলল। লোকগুলো, হয়ত বৃহত্তর কোনও আন্দোলন করার মতলবে, একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাদের বাইরে বেরিয়ে যাবার পেছনে বড়বাবুর কোনও আশ্বাসও থাকতে পারে। এবার বড়বাবু আদিত্যকে নজর করলেন। জলদগম্ভীর গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার? আপনি এতক্ষণ থানার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দেখছেন না এখানে একটা ঝামেলা চলছে। বাইরে যান, বাইরে যান। কিছু বলার থাকলে পরে আসবেন।'

আদিত্য মরিয়া হয়ে বলল, 'আমি সাব ইন্সপেক্টার সম্বিত কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। লালবাজার থেকে ইন্সপেক্টার সঞ্জয় সমাদ্দার কুণ্ডুবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলেন। কুণ্ডুবাবু বলেছিলেন এই সময় থাকবেন।'

'কুণ্ডুকে আমি একটা কাজে করিমপুর পাঠিয়েছি। কুণ্ডুর সঙ্গে কী দরকার?'

'এখানকার একটা ইস্কুলের দিদিমনি চন্দ্রলেখা সেন যে নিখোঁজ হয়ে গেছেন, কুণ্ডুবাবু তো সে ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছিলেন। সে ব্যাপারে উনি কতটা এগোলেন সেটা একটু জিজ্ঞেস করতাম।'

'ইনভেস্টিগেশনে কতটা এগিয়েছে সেটা কুণ্ডু তোমাকে বলবে কেন? তুমি কোন হরিদাস পাল?'

অপমানে আদিত্যর কানদুটো লাল হয়ে উঠল। তবু সে নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল, 'আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। শুধু চন্দ্রলেখা সেনের কেসটা নয়, এই অঞ্চলে যে

ইদানীং বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে সে বিষয়টাও তদন্ত করছি। লালবাজার এবং দিল্লির স্পেশাল অ্যান্টিটেররিস্ট ব্রাঞ্চ আমাকে সাহায্য করছে। আমাদের ধারণা এই খুনগুলোর সঙ্গে টেররিস্টদের একটা সম্পর্ক আছে। আমার মনে হচ্ছে আমি আসছি জেনে আপনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর একটাই মানে হতে পারে। লোকাল পুলিশ বা তাদের একটা অংশ টেররিস্টদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। আমি যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। এখানে আমার আর থাকার কোনও দরকার নেই। নমস্কার।'

হতভম্ভ বড়বাবুকে থানার ভেতরে রেখে আদিত্য বাইরে এসে দেখল আন্দোলনকারিরা আবার স্লোগান দিতে শুরু করেছে।

ফেরার পথে আদিত্যরা যখন গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ধারের একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছে, পার্থ হঠাৎ ককিয়ে উঠল, 'আরে আমার পেন? আমার পেনটা কোথায় গেল?'

'কোথায় ছিল পেনটা?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আমার বুক পকেটে গোজা ছিল। সব সময় থাকে। ওটা আমার লাকি চার্ম।' পার্থর গলাটা প্রায় কাঁদোকাঁদো।

'কী পেন ছিল ওটা?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল। 'ওটা তোর পকেটে দেখেছি বটে, কিন্তু কখনও তোকে ওটা দিয়ে লিখতে দেখিনি।'

'দামী পেন। ম ব্লাঁ। হাজার দেড়েক ডলার দিয়ে কিনেছিলাম। জানিস তো আমার খুব পেনের সখ। তবে দামটা ব্যাপার নয়। বললাম না ওটা আমার লাকি চার্ম।'

'চল গাড়িতে গিয়ে দেখি। গাড়িতে পড়ে গেছে কিনা।' আদিত্য মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে গাড়ির দিকে এগোল।

গাড়িতে পেনটা নেই। আদিত্য বলল, 'বনবীথি ইস্কুলে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। খোঁজ নিতে হবে।'

বাকি পথটা পার্থ প্রায় কোনও কথাই বলল না।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর নূপুরকে ফোন করল আদিত্য।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'আরে না, না, এখন কী ঘুমোব? আমি অনেক রাত্তিরে ঘুমোই। সেক্টর ফাইভে কাজ করার অভ্যেস। তুমি বল কী বলবে। আচ্ছা তার আগে আমার দুএকটা কথা বলার আছে, সেগুলো বলে নিই।'

আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'কোনও নতুন খবর আছে?'

'দু-একটা খবর দেবার ছিল আদিত্যদা। স্কুলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছিলাম না। স্কুলে কথা বললে সকলে সব শুনতে পায়। কোনও প্রাইভেসি নেই। দুটো জিনিস বলার ছিল। প্রথমত, তুমি চন্দ্রা সেনের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে দেখতে বলেছিলে। জিনিসপত্রগুলো একটা সুটকেস ভর্তি হয়ে গৌরবাবুর বাড়িতে রাখা আছে। আমি সোনাদিদিকে নিয়ে সেগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়েদের ইংরেজি শেখানোর জন্য চন্দ্রা দিদিমনির একটা নোটখাতা ছিল, সেটা খুঁজতে যাবার অছিলায়। তুমি বলেছিলে কী কী আছে তার থেকেও কী কী নেই সেটা জানা বেশি জরুরি। সোনাদিদি বলল, চন্দ্রা দিদিমনির একটা নীল শাড়ি, একটা হলুদ শাড়ি আর দুটো সাদা শাড়ি সুটকেসের জিনিসপত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আমি অনেকবার সোনাদিদিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঠিক বলছ তো? সোনাদিদি বলল, মেয়েরা শাড়ির ব্যাপারে কখনও ভুল করে না।'

'বেশ, বেশ। আর দ্বিতীয় খবর?' আদিত্যর গলাটা খুশি খুশি শোনাল।

'দ্বিতীয় খবরটা হল, চন্দ্রা যে বাড়িটায় থাকত সেটা খুব পুরোনো একটা বাড়ি। বাড়িওলা ওখানে থাকে না। বসিরহাটে থাকে। ভাড়া নিতে পারি এই অছিলায় বাড়িওলার কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ছাতে একটা ছোট্ট চিলেকোঠার ঘর আছে। দেখে মনে হয় বহুদিন কেউ ভেতরে ঢোকেনি।

দরজায় হুড়কো লাগানো। হুড়কো খুলে দেখি নানারকম জঞ্জাল, পুরোনো জামাকাপড়, কিছু বাতিল থালাবাসনের সঙ্গে একটা বেতের মুখ ঢাকা ঝাঁপি, যে ধরনের ঝাঁপিতে সাপুড়েরা সাপ রাখে। ঝাঁপির মুখটা খানিকটা খোলা, সাপ-টাপ কিছু নেই। কিন্তু সাপের খোলস কিছুটা রয়ে গেছে। আর একটা বুনো গন্ধ। সব মিলিয়ে এটা পরিষ্কার যে কিছুদিন আগে ঝাঁপির মধ্যে একটা সাপ ছিল।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'দুটো কাজ করতে হবে তোমাকে। বনবীথির কাছে মর্নিং ডিউ বলে একটা ইংরেজি মিডিয়াম ইস্কুল আছে। চন্দ্রা বনবীথিতে আসার পর থেকে তাদের ব্যাবসার অবস্থা খারাপ। সবাই চন্দ্রার কাছে ইংরেজি শিখতে আসছে, মর্নিং ডিউতে কেউ ভর্তি হচ্ছে না। কারও কারও মতে, চন্দ্রার উধাও হয়ে যাবার পেছনে মর্নিং ডিউএর মালিকের হাত আছে। ব্যাপারটা তোমাকে একটু খোঁজ নিতে হবে। বুঝতে পেরেছ তো?'

'বুঝতে পেরেছি আদিত্যদা। আমি খোঁজ নিয়ে দুএকদিনের মধ্যেই তোমাকে জানাচ্ছি। আর কী কাজ?'

'আর তুমি বললে না, চন্দ্রার চিলেকোঠার ঘরে সাপের ঝাঁপি দেখেছ? তুমি খোঁজ নেবে আশেপাশের গ্রামে কোনও সাপুড়ে আছে কিনা। যদি কোনও সাপুড়ের সন্ধান পাও তাকে জিজ্ঞেস করবে সে কিছুদিন আগে কাউকে কোনও কালো কেউটে সাপ বিক্রি করেছে কিনা। করলে, কাকে করেছে?'

'আমি দুটো কাজ করে তোমাকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে। আজ শুয়ে পড়। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। পার্থর পকেট থেকে একটা পেন পড়ে গেছে। দামী ম ব্লঁ পেন। কালো রঙের। তুমি একটু দেখো। অন্যদেরও দেখতে বোলো।'

'কালো পেন? ইস্কুলের কোথাও পড়েছে?'

'ইস্কুলে পড়তে পারে, অন্য কোথাও পড়তে পারে। পার্থর খেয়াল নেই।'

'ঠিক আছে। দেখব। গুড নাইট আদিত্যদা।'

'গুড নাইট।'

নবম পরিচ্ছেদ

(১)

আদিত্য অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। ওই অবস্থায় ফোনটা অনেকক্ষণ বেজে বেজে থেমে গেছে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না কারণ প্রথম ফোনটা যখন এসেছিল, ঘড়িতে তখন ভোর ছটাও বাজেনি। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে জমিদাররা খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে না এবং আদিত্যর শরীরে কিছু জমিদারি রক্ত এখনও বইছে। বস্তুত, সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে, দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে, ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়ে সে যখন মোবাইলের দিকে চোখ রাখল তখন বেলা আটটা বেজে গেছে। আদিত্য দেখল পাঁচটা মিসকল, সব কটাই এসেছে কেয়া বাগচির কাছ থেকে। ফোনটা নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে বেজে গেছে। তাহলে সে টের পেল না কেন? প্রশ্নটার উত্তর পেতে অবশ্য খুব বেশি সময় লাগল না তার। গতকাল অনেক কসরত করে সে তার রিং টোনটা বদলেছে। এখন কেউ তাকে ফোন করলে তার মোবাইলে নট মল্লার রাগে জ্ঞান গোঁসাই-এর 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল' গানটার দু-একটা কলি বেজে উঠছে। গানটা তার বিশেষ প্রিয়। কিন্তু সমস্যা হল আগে কম্পানির দেওয়া রিং টোনটা যেমন গাঁকগাঁক করে বাজত, সেই তুলনায় এই গানটা নেহাতই মিনমিন করে বাজে। ফলে সজাগ না থাকলে টেরই পাওয়া যায় না টেলিফোন বাজছে। আদিত্য ঠিক করে ফেলল এই রিং টোনটা বদলে আবার আগেরটাতে ফিরে যাবে। জ্ঞান গোঁসাই তাকে যতই কানের আরাম দিন, পেটের ভাত তো আর জোটাতে পারবেন না।

সকালের প্রথম সিগারেটটা ধরিয়ে সে কেয়া বাগচিকে ফোন করতে যাবে এমন সময় মৃদু স্বরে জ্ঞান গোঁসাই 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল' গেয়ে উঠলেন। আবার কেয়া বাগচি। আদিত্য ফোন ধরে বলল, 'হ্যালো?'

'সেই সকাল থেকে আপনাকে ফোন করছি, আপনি কিছুতেই ফোন ধরছেন না। ব্যাপার কী? অসুস্থ নাকি?' ওপারে কেয়া বাগচির কণ্ঠস্বর ঝনঝন করে বেজে উঠল। কেয়া মনে হল ধরেই নিয়েছে সকলেই তার মতো ভোর পাঁচটায় উঠে পড়ে।

আদিত্যর ভেবে দেখল, জ্ঞান গোঁসাই-এর গল্পটা বলতে গেলে অযথা জটিলতা বাড়বে। তাছাড়া এই সাত-সকালে খুব বেশি কথা বলতেও তার ভাল লাগছে না। সেক্ষেত্রে একটু-আধটু মিথ্যে বলতে দোষ নেই। সে সংক্ষেপে বলল, 'না, না। তা নয়। আসলে ফোনটা ভুল করে সাইলেন্ট মোডে চলে গিয়েছিল।'

'সাইলেন্ট মোড? আমি সকাল থেকে বোধহয় দশবার ফোন করেছি। সে যাক গে। শুনুন, একটা ব্যাপার ঘটেছে যে কারণে আপনাকে ফোন করা। কাল রাত্তিরে আমি আমার মোবাইলে একটা মেসেজ পেয়েছি। অজানা নম্বর থেকে মেসেজ। তাতে ইংরেজি হরফে বাংলায় লেখা, 'আমি ভাল আছি, আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না। চন্দ্রা।' আমি বুঝতে পারছি না মেসেজটা সত্যি সত্যি চন্দ্রার কাছ থেকেই এসেছে কিনা। আপনার তো পুলিশের সঙ্গে চেনাশোনা আছে, আপনি নম্বরটা ট্রেস করতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। অবশ্যই পারব। চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে এটা একটা ভাল লিড হতে পারে।'

'তাহলে কি ধরে নেব চন্দ্রা বেঁচে আছে?'

'আমার স্থির বিশ্বাস চন্দ্রা বেঁচে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই আপনার বন্ধু ফিরে আসবে।'

কেয়া বাগচি ফোনটা রেখে দেবার পর আদিত্য খানিকক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে সিগারেট খেল। তারপর কেয়া বাগচির পাঠানো নম্বরটা নিজের মোবাইলে সেভ করল। চন্দ্রার ছবি দুটো কেয়াকে পাঠানোর জন্য মোবাইলে হোয়াটস অ্যাপ খুলে কেয়া বাগচি সার্চ দিতেই কেয়ার মুখের ছবি দেওয়া অ্যাকাউন্টটা বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে

ছবি দুটো রয়েছে। সে নিবিষ্ট মনে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, এই ছবিটা তাকে সত্য উদ্ঘাটনে খুব সাহায্য করবে।

আদিত্য আবার কফি খাবে বলে কেটলিতে জল গরম করতে দিল। আর একটা সিগারেট ধরাল। সে কেয়া বাগচির কথাই ভাবছে। কেয়া বাগচির শরীরের গন্ধটা বারবার ফিরে আসছে তার স্মৃতিতে। কিছু ব্যাপার গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল। আরও দুতিনটে সিগারেট খেল। দুকাপ চা। মোবাইলের রিংটোন বদলে আবার আগের রিংটোনটাতে ফিরে গেল। তারপর রত্নার ফোনটা ডায়াল করল।

ওদিক থেকে রত্না সাড়া দেবার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'তোর তো এখনও পুজোর ছুটি চলছে?'

'অন্যদের চলছে। প্রিন্সিপ্যালকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। কী ব্যাপার বলত?'

'তেমন কিছু নয়। ভাবছিলাম, তোর কি কিছুক্ষণ কথা বলার সময় হবে? নাকি কলেজ যাবার তাড়া আছে?'

'তুই বল কী বলবি। এই ছুটির মধ্যে সপ্তাহে তিন-চার দিন কলেজ যাচ্ছি। আজ যাব না। দুপুরে একটু হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যাব। কিন্তু তার দেরি আছে। তুই বল।'

'পুজোর সময় তোদের বাড়িতে তোর এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মনে আছে? নামটা, যতদূর মনে পড়ছে, গার্গী বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব মনে আছে। গার্গী আর তার স্বামী এসেছিল বলে তোদের গান শোনা মাটি হয়ে গেল। তা, গার্গীকে হঠাৎ মনে পড়ল কেন?'

'বলছি কেন। তোর কি মনে আছে চন্দ্রাকে খোঁজ করার ব্যাপারে গার্গী বলেছিল কেয়া বাগচি বলে চন্দ্রার একজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে?'

'একটু একটু মনে পড়ছে। চন্দ্রাকে খুঁজে পেয়েছিস?'

'এখনও পাইনি। তবে মনে হচ্ছে খুব শিগগির পেয়ে যাব। শোন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। গার্গীর কাছ থেকে জানতে হবে যথেষ্ট অ্যাট্র্যাক্টিভ হওয়া সত্ত্বেও কেয়া বাগচি এখনও বিয়ে করেনি কেন?'

'ভারি অদ্ভূত প্রশ্ন তো! কেয়া বাগচি কেন বিয়ে করেনি গার্গী জানবে কী করে?'

'জানাটা অস্বাভাবিক নয়। গার্গী কেয়া বাগচির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'গার্গী যদি জিজ্ঞেস করে কেন জানতে চাইছি? তখন কী বলব? আমি তো কেয়া বাগচিকে চিনিই না।'

'বলবি, তোর এক বন্ধু একেবারে হাত-পা ভেঙে কেয়ার প্রেমে পড়ে গেছে। কেয়াকে প্রপোজ করার আগে সে শুধু জানতে চায় কেয়া কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে আছে কিনা।'

'আমার বন্ধু? আমার কোন বন্ধু?'

'গার্গী যদি সেই বন্ধুর নাম জানতে জোরাজুরি করে, বলবি তার নাম আদিত্যবর্ণ মজুমদার।'

ওপারে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। রত্না বাস্তবিকই হতভম্ভ হয়ে গেছে। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সে বলল, 'আদিত্য, তুই কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস?'

'ইয়ার্কি মারব কেন? আমি কি প্রেমে পড়তে পারি না? শুধু তোরাই প্রেমে পড়তে পারিস? তুই শুধু আমায় জেনে দে কেয়া বাগচির কোনও স্টেডি বয় ফ্রেন্ড আছে কিনা। আর থাকলে কেয়া তাকে এতদিন বিয়ে করেনি কেন? খবরটা জেনে দে, তারপর দ্যাখ আমি কী করি। খবরটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জেনে দিতে হবে। ধর এই আজ-কালের মধ্যে।'

আরও মিনিট কয়েক পরে আদিত্য যখন ফোনটা রেখে দিচ্ছে তখনও রত্নার হতভম্ভ ভাবটা পুরো কাটেনি।

আদিত্য ফোনটা নামিয়ে রেখে ভাবছে এবার দাড়িটা কামিয়ে নেবে, আবার ফোনটা বেজে উঠল। এখন আর জ্ঞান গোঁসাই-এর গান নয়, ফোনটা গাঁকগাঁক করে বাজছিল। ফোনটা তুলতেই গৌতমের গলা। সেটাও গাঁকগাঁক করে ভেসে এল।

'কলকাতা আসছিস কবে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'বলেছিলি না নভেম্বরের শেষে কলকাতা আসবি?'

'আরে কলকাতা থেকেই তো বলছি। কাল রাত্তিরে এসেছি। দুএকদিনের জন্যে নয়, একেবারে পাকাপাকিভাবে। আজ থেকে আবার লালবাজারে বসছি।'

'তোর অ্যাসাইনমেন্টটা কি শেষ হয়ে গেল?'

'আরে না, না। অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি রয়েছে। তবে বাকি কাজটা দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা থেকে বসে করব। কারণ এটা আমরা বুঝতে পেরেছি টেররিস্টদের আর্মসগুলো বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে আসে। আমার অপারেশনের হেড কোয়ার্টারটা কলকাতা থেকে হলে কাজে সুবিধে হবে।'

'তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। মনে হচ্ছে আমি তোকে খানিকটা সাহায্য করতে পারব। তাছাড়া চন্দ্রা সেন অন্তর্ধানের কেসটা প্রায় গুটিয়ে এনেছি। সেই ব্যাপারেও তোর সাহায্য দরকার। কবে তোর সঙ্গে দেখা করব?'

'দ্য সুনার দ্য বেটার। আজ জয়েন করছি, কিছু হাবিজাবি ফরম্যালিটি আছে। কাল আবার কালীপুজো। ছুটি। তুই পরশু সকালের দিকে চলে আয়। ধর এই এগারোটা নাগাদ?'

'চলে আসছি। তুই গেটে আমার নামটা বলে রাখিস। আজকাল লালবাজারে ঢুকতে খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

'অবশ্যই বলে রাখব। তুই চলে আয়।'

'ঠিক আছে। পরশু এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

একটু পরে আদিত্য গালে সাবান লাগিয়ে রেজার বোলাতে যাবে এমন সময় আয়না দিয়ে দ্যাখে একটা মুন্ডু দরজা ফাঁক করে উঁকি মারছে। বিমল।

'ভেতরে এসে বোসো।' আদিত্য কামানো থামিয়ে বলল। 'বলরামকে একটু চা দিতে বলো। আমি ততক্ষণে দাড়িটা কামিয়ে নিই।'

একটু থেমে আবার আদিত্য বলল, 'দ্যাখো আমার ঝোলানো শার্টটার পকেটে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। বলরামকে টাকাটা দিয়ে বলো চা আর প্রজাপতি বিস্কুট আনতে।' বিমলের পছন্দের সেই প্রজাপতি বিস্কুট।

বিমল ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরে ফিরে এল। এসে বিছানার এক ধারে বসেছে। আদিত্যর দাড়ি কামানো শেষ। সে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'তারপর? সেনবাটি থেকে আর কোনও খবর পেলে?'

'একটা দরকারি খবর পেয়েছি স্যার। মনে হল আপনাকে একবার জানাই। ফোনেই জানানো যেত। তা এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখাও করে যাই।'

'ভাল করেছ। আগে বলো তোমার বউ আর মেয়ে কেমন আছে?'

'মেয়ে মোটামুটি সেরে উঠেছে স্যার। ভাইফোঁটার পর ওদের ইস্কুল খুলবে। কিন্তু গিন্নি ঠিক সারছে না। মনে হয় অপরেশনটা ঠিকমতো হয়নি। ডাক্তার বলছে আর একবার অপরেশন করতে হবে। ডাক্তার তো বলেই খালাশ। আমি এত টাকা কোথায় পাই?'

'শোনো, দ্বিতীয় বার অপরেশন করানোর আগে আর একজন ডাক্তার দেখাও। এসব ব্যাপারে সব সময় আর একটা মত নেওয়া দরকার। আমার এক বন্ধু আছে। পিজির ডাক্তার, খুব নাম করা। তাকে একবার আউটডোরে দেখাও। আমি বলে দিলে বেশিক্ষণ বসতে হবে না।'

'নিশ্চয় দেখাবো স্যার। আপনি শুধু বলে দেবেন কবে দেখাতে হবে।'

'আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তোমাকে দুএকদিনের মধ্যেই জানিয়ে দেব।'

বলরাম কেটলিতে চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে মাটির ভাঁড়, খবর কাগজের ঠোঙায় প্রজাপতি বিস্কুট।

'এবার বলো কী জানতে পারলে।' আদিত্য চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বলল।

'বলছি স্যার। এই কদিন নিয়মিত বিল্টুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। ও কোনও সন্দেহ করেনি। ওর মনে হয়েছে আমি চাকরির জন্যে ওর কাছে ঘুরঘুর করছি।'

'আবার সেই কাকের মাংসের বিরিয়ানি খাইয়েছ?'

'না স্যার এবার আর বিরিয়ানি নয়।' বিমল মুচকি হাসল। 'বিল্টুই আমাকে ওর বস্তির পেছন দিকে একটা চোলাইয়ের ঠেকে নিয়ে গেল। হাবেভাবে বুঝলাম ও চাইছে আমি ওকে কয়েক পাত্তর খাওয়াই। আমাকেও খাবার জন্য জোর করছিল। আপনি তো জানেন স্যার ওসব আমি খাই না। বললাম, আমি খাই না। পেটে ঘা আছে। মাল খেয়েই হয়েছে। ডাক্তার বলেছে আবার যদি মদ খেতে শুরু করি আমাকে আর বাঁচানো যাবে না। মনে হল ও বিশ্বাস করেছে। কয়েক গেলাস খাবার পর, যখন ওর বেশ নেশা হয়েছে, উল্টোপাল্টা বকছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাজটা তো বলেছিলে খুব ভারি নয়। মেমসাহেব কি আজকাল বাড়িতেই থাকেন? ও বলল, হ্যাঁ বাড়িতেই বেশি থাকেন। মেমসাহেবের এক বন্ধু আছে। মন্টু রায়। সে নাকি সাহেব কম্পানিতে বড় চাকরি করে। রোজই সন্ধেবেলা মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসে। মাঝে মাঝে রাত্তিরে থেকেও যায়। এই নিয়ে কাজের মাসি থেকে বাড়ির দরোয়ান পর্যন্ত সবাই নানান কথা বলে। ওই বাড়িতে যে পুরোনো বামুন ঠাকুর আছে সে বলেছে, মেমসাহেব আর মন্টু রায় নাকি রাত্তিরে একই ঘরে শোয়। অথচ বাড়িতে তো ঘরের অভাব নেই। আমি বললাম, বলো কী, এতো রীতিমতো কেচ্ছা। বিল্টু ভারিক্কি চালে বলল, সব বড় ঘরেই ওরকম কেচ্ছা একটা দুটো থাকে। যেন কত বড় বড় ঘরের লোকদের ও চেনে। সে যাই হোক, আমি বিল্টুকে একটু খুঁচিয়ে দিয়ে বললাম, এসব তো তোমার শোনা কথা। তুমি নিজের চোখে কিছু দেখেছ? শুনে বিল্টুর কী রাগ। বলল, দেখিনি মানে? আমি কি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছি? প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন কি দুদিন দুজনে মিলে ক্যামাক স্ট্রিটে প্রোমোটারের আপিসে যায়। আমার গাড়িতেই তো যায়। কখনও কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি না ফিরে দুজনে চলে যায় ডায়মন্ডহারবার কিংবা কোলাঘাট। তখনও তো আমিই গাড়ি চালাই। একবার তো দীঘায় গিয়ে দুদিন একসঙ্গে কাটিয়ে এল। আমিই তো নিয়ে গেলাম। আমার মতো ওদের কেচ্ছা আর কে জানে? বিল্টুর মতে, মেমসাহেবের মাথার ওপর বলার তো কেউ নেই। তাই যা-ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম, অত ঘন ঘন প্রোমোটারের কাছে যায় কেন? বিল্টু বলল, মনে হয় আলিপুরের বাড়িটা প্রোমোটারের কাছে বিক্রি করে দেবে। গাড়িতে উঠে মেমসাহেব আর মন্টু রায় ইংরিজিতে কথা বলে, যাতে আমি বুঝতে না পারি। কিন্তু আমি একটু একটু ইংরিজি বুঝি। তাতেই বুঝলাম বাড়িটা বিক্রির মতলব চলছে। সেদিন রাত্তিরবেলা ধরাধরি করে বিল্টুকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম। ওর বউএর কী রাগ। আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিল। বলল, আমার মতো বন্ধুদের জন্যেই নাকি বিল্টু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'প্রোমোটারের ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছিলাম। ঠিকানাটা বিল্টু বলতে পারল না। তবে বলল, সারকুলার রোড দিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে ঢুকেই বাঁদিকে যে প্রথম দশতলা বাড়িটা পড়ে সেটাতে প্রোমোটারের আপিস। কত তলায় বিল্টু জানে না। তবে প্রোমোটারের নাম জানে, নবীন সরাফ।'

'ওতেই হবে। চমৎকার খবর এনেছো। নাও আর একটা বিস্কুট খাও।' প্রজাপতি বিস্কুটের ঠোঙাটা আদিত্য বিমলের দিকে এগিয়ে দিল। বিমল যখন উঠল তখন প্রায় বেলা বারোটা।

অফিসে বেরোবার আগে আদিত্য আর একটা নম্বর ডায়াল করল। ওদিক থেকে সাড়া পেয়ে সে বলল, 'নূপুর, একটু কথা বলতে পারবে?'

'আমি ক্লাশে আছি আদিত্যদা। তোমাকে দশ মিনিট বাদে ফোন করছি।' নূপুর ফিসফিস করে বলল।

আদিত্য ফোন রেখে কফির জল বসাল। সিগারেট ধরাল। একটু বেশি সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। আজকাল মাঝে মাঝে বুকের বাঁদিকটা ব্যথা করে। একটা চিনচিনে ব্যথা। হার্ট। আদিত্যর পরিবারে হার্টের অসুখের ইতিহাস আছে। বাবা হার্ট অ্যাটাকেই মারা যান। সিগারেট যে তার মারাত্মক ক্ষতি করছে এটা যে

আদিত্য বোঝে না তা নয়। কিন্তু কিছুতেই সিগারেটটা ছাড়তে পারছে না। এমনকি কমাতেও পারছে না। বিশেষ করে এইসব সময়ে যখন একটা রহস্য একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে। আদিত্য কফি খেতে খেতে আরও কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইল।

নূপুরের ফোনটা এল মিনিট পনের পরে। 'আদিত্যদা, আমিই তোমাকে ফোন করতাম। খবর আছে। আমি এখন স্কুলের বাইরে চলে এসেছি। কাছাকাছি কেউ নেই। ফ্রিলি কথা বলা যাবে।'

'আমি দুএকটা জিনিস আগে বলে নিই। বনবীথি ইস্কুলের মালিক রণবীর রায়ের ঠিকানাটা তোমাদের অফিস থেকে জোগাড় করে আমাকে টেক্সট করতে হবে। সেদিন নিয়ে নেব ভেবেছিলাম, ভুলে গেছি। আর গৌর বাঁড়ুজ্জেকে একটু চোখে চোখে রেখ। মনে হয়, ও যতটা বলছে তার থেকে আর একটু বেশি জানে। ফলে ওর বিপদ হতে পারে। পার্থর পেনটা পাওয়া গেল?'

'না আদিত্যদা। আমি পাইনি, অন্য দিদিমনিরাও কেউ পায়নি। হয়ত অন্য কোথাও পড়ে গেছে।'

'সেই মর্নিং ডিউ ইস্কুলটার খবর নিয়েছ?'

'নিয়েছি আদিত্যদা। একটা মারোয়াড়ি স্কুলটা চালায়। ঝানু ব্যাবসাদার। বনবীথির নামে গুজব ছড়ানো ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তবে ব্যবসার স্বার্থে একটা মানুষকে লোপাট করে দেওয়াটা ঠিক ওর সঙ্গে মেলাতে পারছি না। আমার মনে হয়, অতটা রিস্ক ও নেবে না। তবে মানুষকে ওপর ওপর দেখে তো সব সময় বোঝা যায় না।'

'ঠিক আছে। আমি বুঝে নিয়েছি যা বোঝার। আর কিছু খবর আছে?'

'আসল খবরটাই তো বলা হয়নি। একজন সাপুড়ের সন্ধান পেয়েছি। তার মেয়ে আমাদের ইস্কুলে ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। সাপুড়ে বলল, কিছুদিন আগে বেশ মোটা টাকা দিয়ে একটা লোক ওর কাছ থেকে একটা কালো কেউটে সাপ কিনেছে। লোকটাকে সাপুড়ে চেনে না। এই অঞ্চলের লোক নয়। কিন্তু আসল কথাটা হল, সাপটার বিষদাঁত ভাঙা ছিল। মানে, কাউকে ক্ষতি করার কোনও ক্ষমতা সাপটার ছিল না।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং।' আদিত্য উত্তেজিত গলায় বলল।

আদিত্য আপিসে পৌঁছে দেখল নূপুরের কাছ থেকে রণবীর রায়ের ঠিকানাসুদ্ধু এস এম এস-টা এসে গেছে।

(২)

সার্কুলার রোডের দিক থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে ঢুকলে বাঁ হাতে যে প্রথম হাইরাইজটা চোখে পড়ে তার নাম মধুবন। উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আদিত্য গুণে দেখল বাড়িটা দশতলাই বটে। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথের দোকান থেকে একটা বিট নুন দেওয়া কালো চা খেল আদিত্য। একটা সিগারেট খেল। তারপর খুব স্মার্টলি মধুবন নামক বাড়ির ভেতরে ঢুকল। একতলায় ঢুকেই রিশেপশন, তবে সেখানে কেউ বসে নেই। রিশেপশনের বাঁদিকে একটা দেয়াল জুড়ে কাঠের প্যানেলে সারি সারি নেমপ্লেট। আদিত্য তার সামনে গিয়ে নবীন সরাফ নামটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগল। নেমপ্লেটগুলোতে নানা কম্পানির নাম লেখা, প্রত্যেকটির পাশে কম্পানিটির ফ্ল্যাট নম্বর এবং সেটি কত তলায় সেটা লেখা আছে। ব্যক্তির নাম নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এই বাড়িটায় সবই অফিস, রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট প্রায় নেই। নিশ্চয় এই নামের ভিড়ে নবীন সরাফের কম্পানির নামও রয়েছে, কিন্তু ঠিক নামটা না জানলে সেটা খুঁজে বার করবে কী করে? অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদিত্য ভাবছে কী করবে এমন সময় নীল ইউনিফর্ম পরা একটি লোক কোথা থেকে যেন উদয় হয়ে বলল, 'কাঁহা জানা হ্যায়?'

আদিত্য হাতে চাঁদ পেল। সে নরম গলায় বলল, 'ইধর নবীন সরাফজীকা এক রিয়াল এস্টেটকা অফিস হ্যায়। উধর জানা হ্যায়।'

এবার লোকটা বাংলায় বলল, 'সরাফ সাহেবের অফিস ছতলায়। ফ্ল্যাট সিক্স এ। কম্পানির নাম নভনীড়। এদিক দিয়ে সোজা চলে গেলে লিফট পেয়ে যাবেন।' আদিত্যর হিন্দি শুনে লোকটার নিশ্চয় করুণা হয়েছে।

তবে লোকটা নিজে অবাঙালি, তার বাংলায় পশ্চিমি টান আছে।

ছ-তলায় উঠে বাঁ দিকে তাকালেই মস্ত কাঁচের দরজা চোখে পড়ে, তার ওপরে ইংরেজিতে লেখা নভনীড়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আদিত্য দেখল সাত-আটজন সুবেশ যুবক-যুবতী নীরবে কাজ করছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্পোরেট পরিবেশ।

আদিত্যর মন বলছিল, এখানে ইংরেজিতে কথা বললে লোকে তাকে বেশি পাত্তা দেবে।

সামনেই যে মেয়েটি বসেছিল আদিত্য তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'ইজ ইট পসিবল টু সি মিস্টার সরাফ?'

'মে আই নো হোয়াট ইট ইজ অ্যাবাউট?' মেয়েটি কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে ঠান্ডা গলায় বলল।

'মাই কাম্পানি ইজ লুকিং ফর আ প্রপার্টি ইন আলিপুর। প্রেফারেবলি আ লারজ কনডো। উই হার্ড মিস্টার সরাফ ইজ সুন গোইং টু প্রোমোট ওয়ান। বাট ইট হ্যাজ নট বিন অ্যাডভারটাইজড ইয়েট। আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইট।'

মেয়েটি কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর আঙুল তুলে ডানদিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাটস হিজ সেক্রেটারি। প্লিজ টক টু হার।'

আরও কিছুক্ষণ ইংরেজিতে কথাবার্তা চালানোর পর আদিত্য নভীন সরাফের ঘরে ঢোকার অনুমতি পেল। ঢুকে দেখল এই নভেম্বর মাসেও কড়া এসি চলছে। সরাফ সাহেব তার টেবিলে নেই। পাশের একটা কাউচে আধশোয়া অবস্থায় একটা বিদেশি রিয়াল এস্টেট পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তার সামনে একটি কফি টেবিলে খাদ্য ও পানীয়ের ভুক্তাবশেষ সহ কিছু কাপ প্লেট পড়ে আছে। বোঝা যায় তিনি একটু আগে তাঁর মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত করে অধুনা বিশ্রাম নিচ্ছেন। সরাফ সাহেব ঈষৎ স্থূলকায়। তার মাথার চুলগুলো সব সাদা, সেদিক থেকে তার নাম নবীনের বদলে প্রবীণ হলে আরও লাগসই হতো।

আদিত্যকে ঘরে ঢুকতে দেখে নভীন সরাফ উঠে দাঁড়ালেন, আদিত্যকে তার টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসার ইংগিত করলেন। নিজে এসে আদিত্যর উল্টোদিকে নিজের চেয়ারে বসলেন। পরিষ্কার বাংলাতে বললেন, 'বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি বাঙালি তো?'

আদিত্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার চেহারায় নিশ্চয় একটা বাঙালিয়ানা আছে যা দিয়ে লোকে তাকে বাঙালি বলে চট করে চিনে যায়। নভীন সরাফের বাংলাটা প্রায় নিখুঁত।

'আপনার বাংলাটা কিন্তু চমৎকার।' আদিত্য বলল।

'আমি তো কলকাতাতেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। সেন্ট লরেন্স স্কুলে পড়তাম, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। আপনার কি কোনও বিজনেস কার্ড আছে?'

সরাফ সাহেব যে বিজনেস কার্ড দেখতে চাইতে পারেন সেই সম্ভাবনাটা আদিত্যর হিসেবের মধ্যে ছিল, তাই মনে মনে সে এটার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছিল। সে বলল, 'আমার বিজনেস কার্ড দেবার একটু অসুবিধে আছে। কেন সেটা বললেই বুঝতে পারবেন।'

দরজায় টোকা দিয়ে বেয়ারা ঢুকল। ব্যবহৃত কাপ-প্লেট নিয়ে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতে নভীন সরাফ আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন কী বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমি একজন বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের পারসোনাল সেক্রেটারি। আমার বসের নামটা বললেই চিনতে পারবেন, তাই বলছি না। উনি খুব কনফিডেন্সিয়ালি আলিপুরে একটা রেসিডেন্সিয়াল কনডো কিনতে চান। এটা উনি ওঁর স্পেশাল এক বন্ধুকে গিফট করতে চান। এবং উনি চান না কেউ জানুক উনি এইরকম একটা কনডো কিনছেন বা গিফট করছেন। কনডোটা হবে এক্সক্লুসিভ, সেপারেট অ্যান্ড লাক্সুরিয়াস। টাকাটা কোনও সমস্যা নয়। আমার বস শুনেছেন আলিপুরে আপনারা একটা বড় প্রপার্টি প্রোমোট করছেন। কথাটা কি ঠিক?'

নভীন সরাফ একটু ইতস্তত করলেন। তারপর থেমে থেমে বললে, 'আপনার বস ঠিকই শুনেছেন।'

'এটা আলিপুরের কোন জায়গায়?'

'প্রপার আলিপুর। বর্ধমান রোড।'

'গুড। আমার বসের আরেকটা রিকয়ারমেন্ট হল, কনডোর দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ খোলা হতে হবে।'

'আপনারা কত স্কোয়ার ফিট চাইছেন?'

'আমরা চাইছি একটা টু-স্টোরি কনডোমিনিয়াম যার দুটো ফ্লোর মিলিয়ে অন্তত পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট কার্পেট এরিয়া থাকবে। আর একটা কথা। ভেতরের ডিজাইনটা আমাদের আর্কিটেক্ট করবে। তার জন্য অবশ্য যেটা এক্সট্রা লাগবে আমরা দিয়ে দেব। আর, কনডোটা টপ ফ্লোরে হতে হবে। যাকে বলে পেন্টহাউস। আবার বলছি, টাকাটা এখানে কোনও ফ্যাক্টর নয়।'

সরাফ সাহেবের কপালে সামান্য চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তিনি সাবধানি গলায় বললেন, 'দক্ষিণ-খোলা কনডো আপনাদের নিশ্চয় দিতে পারব, কিন্তু টপ ফ্লোরটা গ্যারেন্টি করতে পারছি না। আসলে, যদিও আমরা এখনও অ্যাড দিইনি, বাই ওয়ার্ড অফ মাউথ আমাদের প্রজেক্ট-এর কথাটা রেলেভেন্ট সার্কেলে অলরেডি ছড়িয়ে গেছে। অ্যাট দিস মোমেন্ট টপ ফ্লোরে দক্ষিণ-খোলা ফ্ল্যাট একটাও আর খালি নেই। সব বুক হয়ে গেছে।'

'তাহলে অবশ্য আমার বস ইন্টারেস্টেড হবেন না। উনি বারবার আমাকে বলে দিয়েছেন দক্ষিণ-খোলা পেন্টহাউস ছাড়া উনি নেবেন না। দেখুন, আমি আবার বলছি, মানি ইজ নট আ ফ্যাক্টর। মাই বস ইজ উইলিং টু পে দ্য প্রপার প্রাইস প্রোভাইডেড হি গেটস হোয়াট হি ওয়ান্টস।'

সরাফ সাহেব চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। আদিত্যর মনে হল তিনি লোভে পড়ে গেছেন। তারপর বললেন, 'দেখুন আমাদের এই প্রজেক্টটা খুব এক্সক্লুসিভ। খুব বেশি ফ্ল্যাট এখানে আমরা রাখছি না। কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট খুব বড়। মিনিমাম সাইজ আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট, ম্যাক্সিমাম সাড়ে তিন হাজার। আপনাকে একটা পাঁচ-ছয় হাজারের ফ্ল্যাট দিতে গেলে দুটো ফ্ল্যাটকে একসঙ্গে জুড়তে হবে। দেখুন, যদিও আমরা অ্যাডভারটাইস করিনি তবু জাস্ট বাই ওয়ার্ড অফ মাউথ প্রজেক্টের খবরটা স্প্রেড করে আমার প্রায় সমস্ত ফ্ল্যাট বুক হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন, যারা বুক করেছেন দে আর অল রিচ পিপল। ফ্ল্যাট বুক করার সময় এরা অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়েছেন। মোস্ট অফ দেম আর মোর কন্সার্নড অ্যাবাউট গেটিং আ ফ্ল্যাট ইন দিস এক্সক্লুসিভ প্রপার্টি দ্যান স্পেন্ডিং মানি। আমি খুব চেষ্টা করে দেখব যাদের টপ ফ্লোরে সাউথ-ওপেন ফ্ল্যাট প্রমিস করেছি, তাদের মধ্যে অন্তত দুজন হেভি ডিস্কাউন্ট দিলে অন্য ফ্ল্যাট নিতে রাজি হন কিনা। আমাদের বালিগঞ্জেও একটা প্রজেক্ট চলছে। দেখতে হবে ডিসকাউন্ট দিয়ে সেখানেও এদের রিলোকেট করা যায় নাকি। এই ডিস্কাউন্টের কস্টটা কিন্তু আপনাদের বেয়ার করতে হবে।'

'সেটা আমরা গ্ল্যাডলি বেয়ার করব। আবার বলছি এখানে টাকাটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। তাছাড়া দেরি করে আসার জন্য একটা প্রাইস তো আমাদের দিতেই হবে। আপনি শুধু আমার বস-এর মনের মত একটা কনডো তৈরি করে দিন। সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে সিক্রেট রাখতে হবে। আপনাদের কাছ থেকে গ্রিন সিগনাল পেলে তবেই আমরা আমাদের আইডেন্টিটি ডাইভালজ করব। কিন্তু সেটা শুধু আপনি জানবেন। আর কেউ জানবে না কনডোটা আসলে কে কিনছে। আপনার একটা কার্ড দিন। আপনি কতটা এগোলেন জানার জন্য আমি আপনাকে ফোন করব। বলুন, কদিন পরে ফোন করব?'

'আপনি অন্তত দুটো উইক আমাকে সময় দিন। আপনারা যেরকম চাইছেন তাতে তিন-চারজনের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে তারা অন্য ফ্ল্যাট নিতে রাজি আছেন কিনা। ইট উইল টেক টাইম। আপনার ফোন নাম্বারটা আমাকে দেবেন?'

আদিত্য টেবিলের ওপর থেকে একটা স্লিপ নিয়ে তাতে নিজের ফোন নাম্বারটা লিখে নবীন সরাফের হাতে দিল। বলল, 'আজ চলি।'

'চললেন? একটু চা খাবেন না?'

'আজ থাক। অফিসে অনেক কাজ পড়ে আছে। যদি ডিলটা হয় তাহলে এসে মিষ্টি খেয়ে যাব।' আদিত্য উঠে দাঁড়াল।

রাস্তায় নেমে আদিত্য সারকুলার রোডের দিকে হাঁটছিল, পথে একটা চায়ের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা চায়ের ফরমাস করল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর দোকানের বেঞ্চিতে বসে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। নবীন সরাফ কি কুমুদকিশোর সেনের শেষ উইলের কথা জানে? কমলিকা সেনও কি এই উইলের কথা জানে? ভাবতে ভাবতে আদিত্য পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে বিমলকে ফোন করল।

'তোমাকে খুব চটপট একট কাজ করতে হবে। তোমার বন্ধু বিল্টুর কাছ থেকে কায়দা করে জেনে দিতে হবে তার মেমসাহেব এখন বাড়িতে আছেন কিনা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে দিতে পারবে?'

'পারব স্যার। জেনে নিয়ে ফোন করছি।'

আদিত্য আর একটা চায়ের অর্ডার দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরাল। কেউ না কেউ যে কুমুদকিশোরের শেষ উইলটার কথা জানে এবং সেটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দলে কে কে আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যারা উইলটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তারা কি চন্দ্রা সেনকেও সরিয়ে ফেলেছে? তৃতীয় প্রশ্ন, কুমুদকিশোরের শেষ উইলটা এখন কোথায় আছে?

মোবাইলটা বাজছে। বিমলের ফোন।

'বিল্টু বলল মেমসাহেব আজ সারাদিন কোথাও বেরোননি। বাড়িতেই আছেন। বিল্টুকে বলেছেন, তুমি বাড়ি চলে যেতে পার। আজ বেরোচ্ছি না।'

আদিত্য পকেটে ফোন রেখে উঠে দাঁড়াল। এখান থেকে আলিপুর যাবার সরাসরি কোনও বাস নেই। ওলা-উবার কিছু একটা ধরতে হবে।

কমলিকা সেন সম্ভবত রূপনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। উর্দি-পরা বেয়ারা আদিত্যকে সেই ঘরটিতে বসতে বলল যেখানে আগের দিন গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঘরটা হারিয়ে যাবার মতো বড়। আদিত্য এক কোণে বসে আছে তো বসেই আছে। মিনিট পঁচিশ পরে কমলিকা সেন ঘরে ঢুকলেন, মুখচোখ সামান্য ফোলা, অনেকক্ষণ ঘুমোলে যেমন হয়।

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম বলে ক্ষমা চাইছি। বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। একটা দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।'

'না, না। বিরক্ত করার কী আছে? আপনি আগে চা খান। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি বলে আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বেয়ারা সুদৃশ্য টি-পটে চা নিয়ে এল, সঙ্গে দুরকম বিস্কুট, প্লাম কেক। চায়ে চুমুক দিয়ে আদিত্যর প্রবল সুখানুভূতি হল। খাঁটি দার্জিলিং।

'আপনি আপনার প্রশ্ন শুরু করার আগে আমি একটা অনুরোধ করে নিই। আমার খুব ইচ্ছে নন্দন চক্রবর্তী একদিন আমার এখানে এসে গান করুন। আপনার বন্ধু অমিতাভ মিত্র যদি ওঁকে একবার অনুরোধ করেন তাহলেই উনি রাজি হয়ে যাবেন। আমিও অমিতাভবাবুকে ফোন করব। কিন্তু আপনি বললে তার আলাদা ওজন হবে।'

'বলব, অবশ্যই বলব।' আদিত্য আবার চায়ে চুমুক দিল। 'এই চা-টা কিন্তু সত্যিই চমৎকার।'

'আমার এক টি-টেস্টার বন্ধু আছে। এই চা-টা সে এনে দেয়।' কমলিকা সেন তৃপ্তির হাসি হাসলেন। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'এবার বলুন কী জিজ্ঞেস করবেন।'

আদিত্য প্রশ্নটা করার আগে কিছুক্ষণ নিজেকে গুছিয়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সেদিন আপনি বলেছিলেন, আপনি এই বাড়িটা বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছেন। কিন্তু যেহেতু চন্দ্রা তার অংশটা বিক্রি

করতে চাইছে না তাই বাড়িটার যা দাম হওয়া উচিত তার থেকে অনেক কম দাম আপনি পাচ্ছেন। ঠিক বলছি তো?'

'ঠিক বলছেন। এবং এটা নিয়ে যে চন্দ্রার সঙ্গে আমার একটা বড় রকমের কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে সেটাও এখন পাবলিক নলেজ।'

'ঠিক। এখন কথা হচ্ছে যে কুমুদকিশোর সেন মারা যাবার আগে তার পুরোনো উইলটা বদলে একটা নতুন উইল করেছিলেন। এটা কি আপনি জানেন?'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কমলিকা সেনের মুখের অভিব্যক্তিটা বদলে গেল। প্রথমে বিস্ময় এবং পরে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

'আমার স্বামী মারা যাবার আগে আর একটা উইল করেছিলেন? আমাকে না জানিয়ে? আপনি কি আমাকে ব্লাফ দেবার চেষ্টা করছেন? আপনার মতলবটা কী?' ভদ্রতার মুখোশ খুলে গিয়ে কমলিকা সেনের দাঁত-নখ বেরিয়ে গেছে।

'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি কুমুদকিশোরের শেষ উইলটির বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না।' আদিত্য খুব শান্তভাবে বলল।

'ওরকম একটা উইল থাকলে তো জানব। ওরকম কোনও উইলের অস্তিত্ব নেই। আপনার উদ্দেশ্যটা কী? আমি কিন্তু আপনাকে আর খুব একটা সময় দিতে পারব না।' কমলিকা সেনের গলা বেশ কয়েক পর্দা ওপরে উঠেছে।

'মিসেস সেন আপনি একটু শান্ত হোন। সত্যটা জানা ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। নতুন উইল যে একটা হয়েছিল সেটা প্রমাণ করা খুব কঠিন নয়। তিনজন সাক্ষী ছিল সেই উইলের। একজন আপনার পুরোনো ড্রাইভার মদন মান্না। অন্য দুজনের একজন আপনার স্বামীর আর্দালি রামসেবক পাসোয়ান, আর অন্যজন আপনার স্বামীর ক্লার্ক নিমাই সরকার। মদনবাবুর সঙ্গে আমার নিজের কথা হয়েছে। পুলিশও তখন উপস্থিত ছিল। উনি যে সাক্ষী হিসেবে উইলে সই করেছিলেন সেটা উনি স্বীকার করেছেন। অন্য দুজন সাক্ষীর সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে।'

'আপনি মিথ্যে বলছেন!' কমলিকা সেনের গলা এখনও চড়া পর্দায়।

'এখানেই ব্যাপারটা শেষ নয়। মদনবাবু যাতে উইলের ব্যাপারটা চেপে যান তার জন্য তাকে মোটা টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই টাকা নিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এটাও কি আপনি জানতেন না?'

'মদনবাবু চাকরি ছেড়ে দিতে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু উনি যে ঘুষ নিয়ে চাকরি ছাড়ছেন সেটা আমি কী করে জানব?' কমলিকা সেন এখনও বেশ শক্ত আছেন।

'মদনকে চাকরি ছাড়ার জন্য কে ঘুষ দিতে পারে? আপনার কোনও ধারণা আছে?' কমলিকা সেনের চোখের দিকে তাকিয়ে আদিত্য প্রশ্ন করল।

'আমি কী করে জানব কে কাকে ঘুষ দিয়েছে?'

'আমার প্রগলভতা মাফ করবেন মেসেস সেন, আপনি যাদের নিকটতম বন্ধু ভাবছেন তারা কিন্তু আপনাকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করছে। কুমুদকিশোরের শেষ উইলটা প্রকাশ পেলে তাদের অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে।'

'কী আছে সেই উইলে?' কমলিকা সেনের গলা একটু কাঁপছে।

'যেটা আছে সেটা আপনার পক্ষে ভাল নয়। কুমুদকিশোরের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী কুমুদকিশোরের মৃত্যুর পর তার আলিপুরের বাড়ি এবং সেই বাড়ির সংলগ্ন জমির সবটা পাবেন তার মেয়ে চন্দ্রলেখা সেন আর হাজারিবাগের বাড়ি ও জমির সবটা পাবেন তার স্ত্রী কমলিকা সেন, অর্থাৎ আপনি। আর টাকা যা থাকবে তা সমান ভাগে আপনাদের দুজনের মধ্যে ভাগ হবে। তবে আলিপুরের এই বাড়িটায় আপনি যতদিন খুশি থাকতে পারবেন। এখান থেকে আপনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না।'

কমলিকা সেনকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি কাঁচের জগ থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে এক ঢোঁকে প্রায় পুরোটা খেয়ে ফেললেন। তারপর অনেকক্ষণ কপালে বুড়ো আঙুল ও তর্জনী ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি খুব মৃদু গলায় প্রশ্ন করলেন, 'উইলটা এখন কোথায় আছে?'

'সেটা কেউ জানে না। আপনাদের সলিসিটররাও এই উইলটার কথা জানেন না। হয়ত ওটা চন্দ্রার কাছে আছে। কিন্তু সে নিজেই তো এখন নিরুদ্দেশ। তবে যতদিন না সে নিজে সেই উইলটা নিয়ে কোর্টে গিয়ে তার দাবী জানাচ্ছে, আইনের ভাষায় যতদিন না এই নতুন উইলটা প্রোবেট করা হচ্ছে, ততদিন কিন্তু পুরোনো উইলটাই কার্যকর থাকবে। এই দাবী জানানোর কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে কিনা আমি বলতে পারব না।'

'আমি এসবের কিছুই জানতাম না, বিশ্বাস করুন, কিছুই জানতাম না।' আদিত্যর মনে হল কথাগুলো বলতে কমলিকা সেনের কষ্ট হচ্ছে।

'আমি না হয় আপনার কথা বিশ্বাস করলাম, কিন্তু পুলিশ কি বিশ্বাস করবে?' খানিকটা কড়া গলায় আদিত্য বলল। 'নতুন উইলটা বেরিয়ে পড়লে আপনার অন্তত একশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই ওটা নষ্ট করে ফেলতে পারলে আপনার তো বিলক্ষণ লাভ আছে।'

'একশ কোটি! আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন! আপনি বলতে চাইছেন এই পুরো বাড়িটার দাম দুশ কোটি?' কমলিকা সেন আর সব কিছু ভুলে অবাক হয়ে গেছেন।

'তার থেকে বেশি বই কম হবে না।'

মিনিট দশেক পরে রত্নার ফোন এল। আদিত্য তখন সেনবাটি থেকে বেরিয়ে মেট্রো ধরবে বলে কালীঘাট স্টেশনের দিকে হাঁটছে।

'তোর কপালটা ভাল না মন্দ বলতে পারছি না রে, আদিত্য। গার্গী বলল, কেয়া বাগচির একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল। অনেক দিনের প্রেম। কিন্তু ছেলেটির মা কোনও কারণে কেয়াকে পছন্দ করত না। আর ছেলেটিও ভীষণ মাতৃভক্ত। তাই ছেলেটি কেয়াকে বিয়ে করেনি। বছর কয়েক আগে ছেলেটি মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েছে। কিন্তু কেয়া আর বিয়ে করেনি। বোধহয় পুরুষ জাতটার ওপরেই ওর একটা ঘৃণা জন্মেছে। পচা গল্প। বিশ্বাস হয় না আজকালকার দিনে এরকম হয়।' রত্না গলায় বিরক্তি।

'গার্গী কি কখনও কেয়ার বয়ফ্রেন্ডকে দেখেছে?'

'দেখেছে। অনেকবার দেখেছে।'

'তাহলে আমার খুব একটা চান্স নেই বলছিস।' আদিত্য ঠাট্টার গলায় বলল।

'জানি না। আর আমি বুঝতে পারি না তুই কখন ঠাট্টা করছিস আর কখন সিরিয়াস। আমি ভেবেছিলাম এত দিন পরে তোর একটা হিল্লে হল। সেইজন্যেই উৎসাহ নিয়ে গার্গীকে ফোন করেছিলাম। এখন দেখছি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'আহা, এতে বোঝার কী আছে? তুই তো বললি কেয়া বাগচি পুরো পুরুষ জাতটাকেই ঘৃণা করে। জানিস তো আমার কপালটা চিরকালই মন্দ।' আদিত্য গলাটা করুণ করে বলল।

(৩)

আদিত্য কাগজে পড়েছিল এবছর কালীপুজোয় নাকি শব্দবাজি শোনা যাবে না। শব্দবাজি বস্তুটা আদিত্যর প্রকৃত-অর্থেই অসহ্য লাগে, তাই খবরটা দেখে সে বেশ উৎসাহবোধ করেছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল কালীপুজোর আগের রাত্তির থেকেই শব্দবাজির বিক্রম শুরু হয়েছে। আদিত্যর মেসবাড়িটা বড়বাজারের কাছেই। তাছাড়া চিৎপুর-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর অবাঙালি অঞ্চলও তার বাসস্থান থেকে খুব দূরে নয়। বাজি পোড়ানোর ব্যাপারে বাঙালিদের তুলনায় অবাঙালিদের টাকার জোর এবং মনের ইচ্ছে দুই-ই বেশি।

তাই বাঙালি পাড়ার তুলনায় আদিত্যদের অঞ্চলে শব্দবাজির দাপটও অনেক বেশি। তার ওপর আজকাল কলেজ স্ট্রিট ও শেয়ালদার বাঙালিরাও অবাঙালিদের সঙ্গে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সেই সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বেশ কয়েক বছর হল আদিত্য কালীপুজো থেকে ভাইফোটা অব্দি অমিতাভ-রত্নাদের বাড়িতে পালিয়ে যায়। মেসে ফেরে ভাইফোঁটার পরের দিন সকালে। ভাইফোঁটার রাত্তিরে ফিরতে পারে না কারণ ভাইফোঁটা উপলক্ষে রত্না তাকে যে ফাঁসির খাওয়াটা খাওয়ায় সেটা খাবার পর বাড়ি ফেরা ঔদরিকশ্রেষ্ঠ ভীমসেনের পক্ষেও সম্ভব হত না।

রত্না বলে দিয়েছিল কালীপুজোর দিন সকাল-সকাল চলে আসবি। অমিতাভও তাই বলেছিল। অন্যান্য বছর আদিত্য তাই করে। সকালে উঠে এক কাপ চা খেয়েই চলে যায় অমিতাভদের বাড়ি। তিনদিন ধরে নিরবিচ্ছিন্ন আড্ডা চলে, গান শোনা হয়। এটা এখন প্রায় একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এবছর সম্ভব হচ্ছে না। আজ কালীপুজোর সকালে আদিত্যকে একটা দরকারি কাজ সারতে হবে। কাজটা কখন শেষ হবে আদিত্য জানে না। তাই রত্নাকে ফোন করে বলে দিয়েছে সে বিকেলের আগে আসতে পারবে না।

যেখানে যেতে হবে সেই জায়গাটা দমদম গোরাবাজারের কাছে। আদিত্যর মেস থেকে বড়জোর মিনিট চল্লিশ। বেলা এগারোটায় পৌঁছতে হবে। এখন সকাল আটটা। হাতে সময় আছে। আদিত্য কফি খেতে খেতে ল্যাপটপ খুলে খবর কাগজ পড়ছিল। আজকাল এই একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে। সব খবর কাগজই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। আদিত্য খেয়াল করল, তার টেবিলের ওপর লাল পিঁপড়ের সারি হাঁটছে। ওরা খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। বাইরে কোনও দেয়ালের ফাটলে ওদের বাসা। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসন্ন হলে ওরা ঠিক টের পায়। দুর্যোগ আসার আগেই ওরা খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। তাহলে কি বৃষ্টি আসছে? কালীপুজোর দিন বৃষ্টি হয় কখনও? অবশ্য আজ আকাশে বেশ মেঘ আছে, সুজ্জি ঠাকুর এখনও মুখ দেখাতে পারেননি। আদিত্যর মনে পড়ল, চন্দ্রার হারিয়ে যাবার গল্পটা যেদিন সে অমিতাভ-রত্নাদের বলছিল, সেদিনও খুব বৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন ছিল দুর্গাপুজো। আর আজ, সে যখন রহস্যটা প্রায় ভেদ করে ফেলেছে, আবার বৃষ্টি। কালীপুজো। সঙ্গত সমাপ্তি।

আদিত্য কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে ট্রাম ধরে যখন শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে পৌঁছল তখন বৃষ্টি নেমে গেছে। আকাশের অবস্থা দেখে আদিত্য ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিল, তার সেই লম্বা ছাতা যেটা অমিতাভ তাকে ইটালি থেকে এনে দিয়েছে। খুলতে না হলে ছাতাটা চমৎকার ওয়াকিং স্টিক-এর কাজ করে। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে ছাতা না খোলার প্রশ্নই ওঠে না। ছাতা খুলে আদিত্য রাস্তায় নামল। এবার দমদমের বাস ধরতে হবে। মাঝারি ধরনের বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা না থাকলে ভিজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই, ফাঁকা একটা পুজো মণ্ডপ থেকে পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত ভেসে আসছে। ভাগ্য ভাল, একটু দাঁড়াতেই বাস এসে গেল। একে ছুটি, তায় বৃষ্টি পড়ছে, তাই বাসে মোটে ভিড় নেই। আদিত্যকে নাগেরবাজার পেরিয়ে দমদম ক্যান্টনমেন্টের দিকে যেতে হবে। ওদিকে লর্ড ক্লাইভের একটা পুরোনো বাড়ি আছে, নামতে হবে তার সামনে। তারপর পায় হেঁটে খানিকটা ভেতরে গেলেই রায়দের বাড়ি, আদিত্যর গন্তব্যস্থল।

রণবীর রায়কে আদিত্য ফোনে বলেছিল সে একজন সাংবাদিক। বীথি বলে রণবীর রায় যে এন জি ওটি চালান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বনবীথি, নীপবীথি, কুঞ্জবীথি, কাননবীথি ইত্যাদি নামে গরিব মেয়েদের জন্য তাদের অনেকগুলো ইস্কুল আছে। সেসব নিয়ে সে একটা স্টোরি করতে চায়। একটা ইন্টারভিউ-এর জন্য রণবীর রায় যদি তাকে একটু সময় দেন তাহলে খুব ভাল হয়। রণবীর রায় তাকে কালীপুজোর দিন সকাল এগারোটায় সময় দিয়েছেন।

এগারোটার কিছু আগেই আদিত্য রণবীর রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। বাড়িটা খুঁজে বার করতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। রায়দের বাড়িটাকে স্থানীয় লোক বলে রাজবাড়ি। সকলেই চেনে বাড়িটা। রাজবাড়িই বটে। দুর্গাদালান, নাটমন্দির, বারমহল, অন্দরমহল সব নিয়ে অন্তত দুশো বছরের পুরোনো বাড়িটা এখনও

মহাকালের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় থাম ফুঁড়ে বট-অশথের চারা বেরিয়েছে। গায়ে শেওলা, বাগানে আগাছা। বোঝাই যায় বাড়িটা এখন আর তেমন যত্ন পায় না। আদিত্য লক্ষ করল, তবু দুর্গাদালানে কালীপুজো হচ্ছে। তার সামনে দিয়ে হেঁটে আদিত্য বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সে যে আসবে এটা বোধহয় বলা ছিল। বাড়ির বয়সের সঙ্গে মানানসই একজন অতিবৃদ্ধ পরিচারক তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল, কর্তামশাই পুজোর তদারকি করছেন, খবর দিচ্ছি, এখনই এসে পড়বেন।

কর্তামশায়ের আসতে আসতে অবশ্য মিনিট কুড়ি লেগে গেল। সেই অবসরে আদিত্য বৈঠকখানা ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। মস্ত ঘর, দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে, কড়ি-বরগা দেওয়া পুরোনো আমলের সিলিং—সবই একটা শেষ হয়ে যাওয়া সময়ের ইতিহাস বহন করছে। তার মধ্যে দুতিনটে আসবাব—একটা দেরাজ, একটা সোফা সেট, একটা শ্বেত পাথরের সেন্টার টেবিল—আদিত্যর চোখে পড়ল। এগুলোর ধাঁচ সে চেনে, কাঠ থেকে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে হাতে বানানো অতি সূক্ষ্ম সব কারুকাজ। তাদের পুরোনো বাড়িতে এই ধরনের আসবাব অনেক ছিল। আদিত্য লক্ষ করল, বাড়িটা যত্নে না থাকুক আসবাবগুলো বেশ যত্নে আছে। আদিত্য এক মনে দেরাজের কারুকার্যগুলো দেখছিল, হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বলল, 'আপনার বুঝি পুরোনো ফার্নিচারে ইন্টারেস্ট আছে?'

বাড়ির মালিক রণবীর রায় কখন ঘরে ঢুকেছেন আদিত্য টের পায়নি। পেছন ফিরে আদিত্য দেখল বক্তা ষাট-উত্তীর্ণ গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ পুরুষ, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় রাজার বংশ। বাঙালিদের মধ্যে এত লম্বা চট করে দেখা যায় না।

'ল্যাজারাসের ফার্নিচার না?' আদিত্যর গলায় কিছু অকৃত্রিম মুগ্ধতা ছিল।

'একেবারে সঠিক ধরেছেন। কম্পানির নাম সি ল্যাজারাস অ্যান্ড সানস। ১৮২০ সালে ইংরেজ বণিক বি ডাব্লিউ ল্যাজারাস এই কম্পানির পত্তন করেন। প্রত্যেকটি আসবাব হ্যান্ডমেড। ওদের মতো ফার্নিচার আর কেউ তৈরি করতে পারত না।'

রণবীর রায় একটা আরাম কেদারায় বসলেন। আদিত্যকেও বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। বললেন, 'আপনার রুচির কিন্তু প্রশংসা করতেই হবে। আজকাল কজন এসব জিনিস অ্যাপ্রিশিয়েট করে?' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনিই তো সেই সাংবাদিক যার এগারোটায় আসার কথা ছিল? কোন কাগজ যেন আপনার?'

আদিত্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর একটা নামজাদা বাংলা দৈনিকের নাম বলল যেখানে তার অনেক বন্ধু কাজ করে।

রণবীর রায় বললেন, 'দোতলায় আমার একটা পুরোনো বিলিয়ার্ড টেবিল আছে। সেটাও ল্যাজারাস কম্পানির। দেখার মতো জিনিস। আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে দেখতে পারেন। এসব জিনিস আমি শত অভাবেও বিক্রি করিনি, করার কথা ভাবতেও পারি না। এই বাড়িটাতে একটা মিউজিয়ম বানিয়ে ফার্নিচারগুলোকে রাখার ইচ্ছে আছে। অন্য কোথাও ওগুলো মানাবে না। '

'বীথি বলে যে এন জি ওটা আপনি চালান তার অফিসটাও কি এই বাড়িতে?' আদিত্য সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করল।

'আরে না, না। বীথি গরিব মেয়েদের জন্য পাঁচটা ডিস্ট্রিক্টে পাঁচটা স্কুল চালায়। উত্তর চব্বিশ পরগনায় বনবীথি, পুরুলিয়ায় নীপবীথি, পশ্চিম মেদিনীপুরে কুঞ্জবীথি, বাঁকুড়ায় কাননবীথি আর বীরভূমে পুষ্পবীথি। এই প্রত্যেকটা জেলায় আমাদের আলাদা আলাদা অফিস আছে।'

পকেট থেকে নোটবই বার করে আদিত্য নোট নিচ্ছিল। লিখতে লিখতে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল চালানো ছাড়া আপনাদের আর কি কোনও অ্যাক্টিভিটি আছে?'

'আছে। আমাদের কিছু চাষের জমি আছে। আমার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। সেখানে আমরা ফার্মিং করি। তবে চাল-ডাল-শাক-সব্জি যা উৎপন্ন হয় সবই আমাদের স্কুলগুলোতে মিড ডে মিলের কাজে লেগে যায়।

বাইরে কিছু বিক্রি করতে পারি না।'

'আপনাদের স্কুলগুলো চলে কীভাবে? মানে, স্কুল চালানোর একটা খরচ আছে তো? সেই খরচটা কি আপনি নিজেই বহন করেন?'

'না, না। স্কুলের খরচ চালানোর মতো সামর্থ আমার নেই। স্কুল চলে ডোনেশনে।'

'কারা ডোনেট করেন? একটু বিস্তারিত বলবেন?'

সেই বৃদ্ধ পরিচারক ঠেলাগাড়ি করে জলখাবার এনেছে। সাদা পাথরের প্লেটে কাটা ফল, মিষ্টি। পাথরের গ্লাসে সরবত। মনে মনে আদিত্য রণবীর রায়ের বনেদিয়ানার তারিফ না করে পারল না।

রণবীর রায় বললেন, 'সামান্য জলখাবার। একটু খেয়ে নিন। তবে এগুলো কিন্তু পুজোর প্রসাদ নয়। পুজো তো সেই রাত্তিরে হবে।'

আদিত্য সরবতের গ্লাসে একটা চুমুক দিল। মালাই সরবত। গোলাপের পাপড়ি দেওয়া।

'আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন কারা ডোনেট করেন। দেখুন, এই এন জি ওটা আমার স্ত্রীর নামে। আমার স্ত্রী বীথি অকালে চলে যান। আমি আর বিয়ে করিনি। আমাদের ছেলেমেয়েও নেই। বীথির মৃত্যুর পর আমি খুব একা হয়ে গেলাম। সময় কাটতেই চাইত না।' এত বছর পরেও স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে রণবীর রায়ের গলাটা ধরে এল।

আদিত্য চুপ করে রইল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রণবীর রায় আবার বলতে শুরু করলেন, 'মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে বীথির খুব উৎসাহ ছিল। এ-ব্যাপারে বেশ কিছু সংস্থার হয়ে ও ভলানটারি কাজ করত। তবে নিজের কোনও অরগানাইজেশন ওর ছিল না। বীথির মৃত্যুর পর ওর স্মৃতিতে এই এন জি ওটা শুরু করি। নিজের পয়সাতেই শুরু করেছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে বুঝলাম এটা একা টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করেছি। ইয়োরোপের কয়েকটা দেশে চাকরিও করেছি। তাই কিছু যোগাযোগ ছিল। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিদেশ থেকে কিছু ডোনেশন জোগাড় করতে শুরু করলাম। তাছাড়া দেশের মধ্যে অনেক পয়সাওলা মানুষ আছেন যাঁরা আমাকে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন আমি আর যাই করি টাকা তছরূপ করব না। এঁরাও হাত খুলে ডোনেশন দেন। সেইসব ডোনেশনে আমাদের এন জি ও ভালই চলছে।'

'আপনি কি এখন ফুল টাইম এই এন জি ওটাতেই কাজ করেন?'

'আমি বিলেত গিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলাম। সেই বিদ্যে ভাঙিয়ে এখনও একটু-আধটু কনসাল্টেন্সি করি। বাকি সময়টা পুরোটাই বীথির জন্য। আমার টাকার খুব প্রয়োজন নেই। একা মানুষ, চলে যায়।'

আদিত্য এক টুকরো ফল মুখে পুরে চিবোচ্ছিল। গিলে নিয়ে বলল, 'আপনার স্ত্রী কোন সালে মারা যান?'

'বীথি মারা যায় নাইন্টি ফাইভে। ওর একটা দুরারোগ্য রক্তের অসুখ হয়েছিল। বলা যায়, ওটা নিয়েই ও জন্মেছিল। চিকিৎসার জন্য আমি ওকে সুইটজারল্যান্ড নিয়ে যাই। তাতেও শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হল না। সুইটজারল্যান্ডেই ও মারা যায়।'

'আপনার স্ত্রীর কোনও ছবি কি আপনার কাছে আছে? আমার লেখার সঙ্গে কিছু ছবি দিতে পারলে ভাল হয়। আপত্তি না থাকলে, আপনারও কয়েকটা ছবি নেব।'

'আমার ছবি নিন, আপত্তি নেই। তবে বীথির ছবি নিতে গেলে একটু কষ্ট করে দোতলায় আসতে হবে। আমার বেডরুমে বীথির দুটো পোর্টট্রেট আছে। ও-দুটোই বীথির সব থেকে ভাল ছবি। তাছাড়া দোতলায় আমার বিলিয়ার্ড টেবিলটাও দেখতে পাবেন।'

বীথি রায়ের পোর্টট্রেট দুটো দেখতে দেখতে আদিত্যর মনে হচ্ছিল এরকম পরমাসুন্দরী মহিলা বাঙালির ঘরে খুব একটা দেখা যায় না। তবে একটু যেন রুগ্ন, বিষণ্ণ। হঠাৎ আদিত্যর চোখে পড়ল বিছানার ধারে সাইড টেবিলে একটা হাতঘড়ি খুলে রাখা রয়েছে। ওমেগা সিমাস্টার। আদিত্য আন্দাজ করল এই ঘড়ির দাম সাত-আট লাখের কম হবে না। রণবীর রায় সৌখিন মানুষ, সন্দেহ নেই।

বিকেলে নূপুর মণ্ডল ফোন করল। আদিত্য তখনও রত্নাদের বাড়িতে ঢোকেনি, মেট্রো থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। অনেকক্ষণ কথা বলল নূপুর। আদিত্য তাকে খুব দরকারি কয়েকটা নির্দেশ দিল।

(৪)

একটু আগে কালীপুজোর ডিনার সমাপ্ত হয়েছে। এত বেশি খাওয়া হয়েছে যে উঠে বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসার ক্ষমতাও আদিত্যর নেই। সে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে অলসভাবে বলল, 'একটা কিছু বাজা।'

বাইরে মাঝে মাঝেই শব্দবাজির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবে আদিত্যর পাড়ার থেকে অনেক কম।

'মালকোষ শুনবি?' অমিতাভ জিজ্ঞেস করল। 'শুনেছি ভাল করে মালকোষ গাইতে পারলে নাকি ভূত আসে। আজ কালীপুজোর রাত্তিরে এমনিতেই চারদিকে ভূত-প্রেত কিলবিল করছে। মালকোষ শুনলে হয়ত দুএকটা আমাদের বাড়িতে চলে আসতে পারে।'

'তোমার সব সময় যত আজেবাজে কথা। রাম রাম রাম। আজ কালীপুজোর রাত্তিরে মালকোষ-টালকোষ কিচ্ছু শুনবে না, এই আমি বলে দিলাম।' রত্না ঝংকার দিয়ে উঠল। ওর প্রচণ্ড ভূতের ভয়। এইরকম ভূতের ভয় নিয়ে কীভাবে যে ও একটা কলেজ চালায় আদিত্য ভেবে পায় না।

'তাহলে মালকোষ থাক।' আদিত্য সন্ধি করার চেষ্টা করল। 'তোর কাছে আলি আকবরের একটা মালুহা কেদার ছিল না? অনেক দিন শুনিনি। ওটা বাজা না।'

'ঠিক হ্যায়। মালুহা কেদারই হোক। তবে কোন হার্ড ডিস্ক-এ আছে একটু খুঁজতে হবে।'

অমিতাভ একটা হার্ড ডিস্ক ল্যাপটপে লাগিয়ে খুঁজতে শুরু করল। রত্না কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আদিত্যর মোবাইলটা বেজে উঠল। একটা ভীষণ উত্তেজিত গলা।

'আমি বনবীথি স্কুলের অনিমা সামন্ত বলছি।'

'অনিমা সামন্ত?' আদিত্যর চিনতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। 'ও বনবীথি ইস্কুলের বড়দিদি বলছেন? বলুন, বলুন।'

'আদিত্যবাবু, ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। গৌরবাবুর একটা সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি আছেন।'

'গৌরবাবুর অ্যাক্সিডেন্ট? কখন? কোথায়?' আদিত্য যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'এখনও পুরোটা জানি না। যেটুকু শুনলাম বলছি। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে আজ সন্ধেবেলা, শেয়ালদা স্টেশনে। যতদূর মনে হয়, বাড়ি ফিরবেন বলে গৌরবাবু হাসনাবাদ লোকাল ধরার জন্যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড় ছিল। ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে তখন ভিড়ের ঠেলায় উনি রেললাইনের ওপর পড়ে যান। যারা সেখানে ছিল তারা তাই বলছে। গৌরবাবুর ভাগ্য ভাল ট্রেনটা ভীষণ আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। তাই ড্রাইভার ওঁকে পড়ে যেতে দেখে ব্রেক কষে গাড়িটা থামাতে পেরেছিল। ফলে উনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন। তবে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগেছে। নীলরতনে ভর্তি আছেন। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওঁর পকেটে বনবীথি ইস্কুলের ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছিল। হাসপাতাল সেই নম্বরে ফোন করেছিল। এমনিতে তো কালীপুজো বলে স্কুল বন্ধ, তাছাড়া রাত্তির, কিন্তু স্কুলের সিকিউরিটি সফিকুলের ঘরে ফোনের একটা এক্সটেনশান আছে। সফিকুলই হাসপাতাল থেকে খবরটা পায়। তারপর আমাকে জানায়। আমি অন্য দিদিমনিদের জানিয়েছি। মনে হল আপনাকেও জানানো দরকার।'

'গৌরবাবু ভিড়ের ঠেলায় পড়ে গেছেন, না কেউ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে?'

'ওঁকে কেউ ঠেলে ফেলে দেবে কেন? ওঁর তো কোনও শত্রু নেই। নিশ্চয় ভিড়ের ঠেলায় পড়ে গেছেন।' আদিত্যর প্রশ্নে অনিমা সামন্ত অবাক হয়ে গেছে।

'আপনারা কি এখন হাসপাতালে?' আদিত্য প্রসঙ্গ পালটে বলল।

'না আদিত্যবাবু। যখন খবরটা পেলাম, তখন রাত্তির হয়ে গেছে। আর ট্রেন নেই। কাল ভোরের ট্রেনে সোনাদিদি আর ছোড়দিদিকে নিয়ে কলকাতা যাব। নূপুরকে ফোনে পেলাম না। সে যাবে কিনা জানি না। হাসপাতালে পৌঁছে আপনাকে ফোন করব। আপনি কি একবার হাসপাতালে আসবেন?'

'কাল আমার কতগুলো জরুরি কাজ আছে। কাল যেতে পারব না। ফোনেই জেনে নেব কী হল।'

আদিত্য ফোন কেটে দিয়ে নূপুরের নম্বরটা ডায়াল করল। সুইচট অফ। আলি আকবর খাঁ সাহেব মালুহা কেদার বাজাতে শুরু করেছেন।

(৫)

পরের দিন গৌতমের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা সেরে আদিত্য যখন লালবাজার থেকে বেরোল তখন প্রায় দুপুর দুটো। সোয়া তিনটে নাগাদ শেয়ালদা থেকে একটা কৃষ্ণনগর লোকাল আছে। আদিত্য সেই ট্রেনটা ধরে পায়রাডাঙা যাবে।

গৌতমের সঙ্গে মোটামুটি সব কথাই হয়ে গেছে। আদিত্যর নির্দেশ পালন করে সামনের কটা দিন পুলিশকে কিছু কিছু দরকারি কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। পুলিশের টিমগুলোকে নেতৃত্ব দেবার জন্য দিল্লী থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের কয়েকজন অফিসার এসেছেন। আদিত্য তাদের সঙ্গেও অনেকক্ষণ কথা বলল। নীলরতনের যে ঘরে গৌরহরি বাঁড়ুজ্জে ভর্তি আছেন আদিত্যর কথা মতো কাল রাত্তির থেকে তার সামনে সাদা পোষাকের পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। সাবধানের মার নেই। আজ সকালে গৌরবাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি পুলিশকে বলেছেন তিনি নিশ্চিত যে শেয়ালদা স্টেশনে কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন লাইনের ওপর ফেলে দিয়েছিল।

আদিত্য আগেও লক্ষ করেছে দুপুরবেলা কিছুক্ষণের জন্য শেয়ালদা স্টেশনটা ঝিমিয়ে পড়ে। ট্রেনের সংখ্যা কমে আসে বলে যাত্রীর সংখ্যাও কমে আসে। আদিত্য স্টেশনে ঢুকে দেখল সাইনবোর্ডে 'কৃষ্ণনগর সিটি' কথাটা জ্বলজ্বল করছে। এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনটা ছাড়বে। হাতে এখনও মিনিট পনের সময় আছে। তার মধ্যে টিকিটটা কেটে নিতে হবে।

টিকিট ঘর প্রায় ফাঁকা। আদিত্য একটা যাতায়াতের টিকিট কেটে নিয়ে অলস গতিতে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটা লাগাল। ট্রেন এখনও প্ল্যাটফর্মে ঢোকেনি। প্ল্যাটফর্মের একদিকে জনা চার-পাঁচ তল্পিবাহক মরিয়া হয়ে ঘুমোচ্ছে। চায়ের স্টলের ঝাঁপ নামানো। দোকানদার দুপুরের এই ঝিমিয়ে থাকা ইস্টিশনে নিজেই নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়েছে। আর একটু এগিয়ে কয়েকজন তরি-তরকারির ফড়ে তাদের শূন্য ঝুড়িগুলো একটার ওপর আর একটা জড়ো করছে। এরা নিশ্চয় বৈঠকখানা বাজারে তরকারি বেচতে এসেছিল। এখন ফিরে যাবে। আদিত্য আন্দাজ করল, যে জায়গায় ঝুড়িগুলো জড়ো হচ্ছে তার আশেপাশেই কোথাও ভেন্ডারের কামরাটা এসে থামবে। সে সেই জায়গাটা ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে চলল। আরেকটা চায়ের স্টল। এটার দোকানদার মনে হয় আগের জনের তুলনায় উদ্যোগী, তাই দোকানটা খোলা রেখেছে। আদিত্য একটা চায়ের ফরমাশ করল, সঙ্গে দুটি বিস্কুট।

কৃষ্ণনগর লোকাল প্রায় ঠিক সময়েই ছাড়ল, আদিত্যর কামরায় সে ছাড়া আর মাত্র কয়েকজন লোক। বেলঘরিয়া থেকে বেশ কিছু লোক উঠল, বারাকপুর থেকে আরও বেশ কিছু। কামরায় আর কোনও সিট খালি নেই, তিনজনের সিটে চারজন করে বসছে। ভাগ্যিস আদিত্য জানলার ধারে সিট পেয়েছিল, না হলে দুজনের মাঝখানে পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপটা হতে হতো। নৈহাটি পৌঁছে কামরাটা অর্ধেক খালি হয়ে গেল। কল্যাণীতে আরও দু-চারজন নামল, ট্রেন যখন পালপাড়া পৌঁছেছে তখন কামরা আবার ফাঁকা।

পালপাড়া, চাকদা, পায়রাডাঙা। শীতের বেলা দ্রুত পড়ে আসছে। পথে নিশ্চয় ট্রেনটা লেট করেছিল, কারণ পায়রাডাঙা পৌঁছতে তার সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। পৌঁছনোর কথা পাঁচটা বেজে দুই মিনিটে। আদিত্য ট্রেন থেকে নেমে দেখল ইস্টিশন চত্বরে আলো জ্বলে উঠেছে। আজকাল যেমন মফস্বলের দোকানে

দোকানে এলইডি আলো জ্বলে তেমনি সাদা সাদা আলো। স্টেশনে খুব বেশি লোক নেই। মনে হয় এখনও আপিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি।

ট্রেন থেকে নেমেই আদিত্য একটা দরকারি ফোন সেরে নিল। তারপর স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দ্যাখে রিক্সা স্ট্যান্ডে মাত্র দুটি রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

'হেতমপুরে যাব। ওখানে লাহিড়িদের বাড়ি চেনেন?' আদিত্য এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আগে বুড়োবাবু থাকতেন, ইস্কুলে পড়াতেন। ওর ছেলে মারা গেছেন। এখন শুধু বউমা থাকেন। উনিও ইস্কুলে পড়ান। ছোটদের পড়ান। তার একটা ছোট ছেলে আছে।'

রিক্সাওলাকে খুব বেশি ভাবতে হল না। সে বলল, 'আপনি অরুণ লাহিড়ির বাড়ি যাবেন? মাস্টারমশাই-এর বাড়ি? যে বাড়িতে বৌদির ভাই অ্যামেরিকা থেকে এসেছেন?'

আদিত্য ঠিকই আন্দাজ করেছিল। এইসব ছোট্ট জায়গায় সবাই সবাইকে চেনে।

'আপনি ও বাড়িতে কার কাছে যাবেন?' একটু পরে প্যাডেল করতে করতে রিক্সাওলা জিজ্ঞেস করল।

'বৌদির ভাই আমার বন্ধু। ওই যিনি অ্যামেরিকা থেকে এসেছেন। তার কাছে যাব। আপনি চেনেন মাস্টারমশাইদের?' আদিত্য পালটা প্রশ্ন করল।

'সবাইকে চিনি। আমার তো হেতমপুরেই জন্ম। আমার বাবা এই অঞ্চলে রিক্সা চালাত। এখন আর পারে না। আমি রিক্সা চালাই। অন্য দুই ভাই-এর একজন কলকাতায় আর একজন রানাঘাটে কাজ করে। আমিই এখানে রয়ে গেলাম। না থাকলে বুড়ো বাবা-মাকে কে দেখবে?' মনে হল রিক্সাওলা গল্প করতে ভালবাসে।

'মাস্টারমশাইকে আপনি দেখেছেন?' কিছুক্ষণ নীরবে চলার পর আদিত্য প্রশ্ন করল।

'দেখেছি মানে? মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়েওছি। উনি আমাদের ক্লাশ টেনে অঙ্ক পড়াতেন। আমি অবশ্য লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম না। উনি বলতেন বাড়িতে আয় অঙ্ক বুঝিয়ে দেব। অনেকে যেত। আমার যাওয়া হয়নি। মাধ্যমিকটাও পাশ করা হলো না।' আদিত্যর মনে হল রিক্সাওলা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ওর বউমাও তো ওই ইস্কুলেই পড়ায়?'

'হ্যাঁ। তাও অনেকদিন হয়ে গেল। মাস্টারমশাই-এর ছেলের যখন বিয়ে হল আমি তখন ছোট। আমার মনে আছে পুরো হেতমপুরের লোক নেমন্তন্ন খেয়েছিল। তারপর একদিন শুনলাম দাদাবাবুর কঠিন অসুখ করেছে। কিছুদিন পরে দাদাবাবু চলে গেলেন। তারপর একে একে দাদাবাবুর মা, মাস্টারমশাই। এখন বৌদি একা ছেলে নিয়ে অত বড় বাড়িতে থাকেন।'

তারা এখন খুব সরু একটা রাস্তায় এসে পড়েছে। এবড়ো-খেবড়ো গ্রামের রাস্তা, ঘন ঘন বাঁক, রিক্সাওলাকে মন দিয়ে চালাতে হচ্ছে। 'এই একটুখানি রাস্তা খারাপ। এর পর আবার ভাল রাস্তা। এটা দিয়ে এলে অনেক কম সময় লাগে। বড় রাস্তা ধরলে আরও দশ মিনিট বেশি লাগত। আমাকে আবার তাড়াতাড়ি ইস্টিশনে ফিরতে হবে। সোয়া ছটার গাড়িতে আমার এক বাঁধা খদ্দের আসেন। ট্রেন থেকে নেমে আমাকে দেখতে না পেলে রাগারাগি করবেন।' রিক্সাওলা এতক্ষণে মোটামুটি ভাল একটা রাস্তায় এসে পড়েছে।

'আর কতটা?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'এই তো, প্রায় এসেই গেছি।' রিক্সাওলা অভয় দিল।

'বৌদির ইস্কুলটা এখান থেকে কত দূরে?' আদিত্য কথাবার্তা চালিয়ে যেতে চাইছিল।

'ইস্কুলটা এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে আরও মিনিট দশ। রাজা মল্লিকের রিক্সায় বৌদি যাতায়াত করেন। গত একমাস অবশ্য বৌদি ছুটি নিয়েছেন। শুনেছি, তার শরীর ভাল নেই। খোকাবাবু রাজার রিক্সায় একাই ইস্কুলে যায়। এই তো এসে গেছি। সামনের একতলা বাড়ি।'

আদিত্য আরও কিছুক্ষণ রিক্সাওলার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু রিক্সাওলা তাড়ায় আছে। সে আদিত্যকে নামিয়ে দিয়ে ভাড়ার পয়সা নিয়ে চলে গেল।

ছোট একতলা বাড়ি। চারদিকে পাঁচিল। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা পুরোনো কিন্তু পাঁচিলটা সদ্য তোলা হয়েছে। সিমেন্টের পলেস্তারায় এখনও চুনকাম পড়েনি। একটা লোহার গেট আছে, তালাবন্ধ। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাড়ির সামনে একফালি বাগান, পাতকুয়ো। পাতকুয়োর সামনে একটু বাঁধানো জায়গা। তার ওপর পোড়া দাগ। গতকাল কালীপুজোয় নিশ্চয় বাজি পোড়ানো হয়েছে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদিত্য ভাবছিল কেমন করে বাড়ির লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। গেটের রেলিং-এ তালাটা ঠুকে ঠুকে শব্দ করবে? নাকি গলা ছেড়ে হাঁক পাড়বে? সৌভাগ্যক্রমে দুটোর কোনোটাই করতে হল না। আদিত্য লক্ষ করল গেটের গায়ে একটা কলিং বেল লাগানো আছে। কলিং বেলের তার খানিকটা পাঁচিলের গা বেয়ে, খানিকটা বাঁশের খুঁটির ওপর দিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে। আদিত্য কলিং বেল বাজাল।

অন্ধকার নেমে এসেছে। দ্বিতীয়বার বেল বাজানোর পর বারান্দায় একটা আলো জ্বলে উঠল। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন। আদিত্যকে অন্ধকারে চিনতে না পেরে, বলল, 'কেএএ?'

আদিত্য কিন্তু লোকটাকে চিনতে পেরেছে। পার্থ সান্যাল। আদিত্য গলা তুলে বলল, 'পার্থ, আমি আদিত্য রে। দরজা খোল।'

আদিত্যর গলা শুনে পার্থ যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, 'তুই এখানে? কী ব্যাপার?'

'তুই এখনও ফিরে যাসনি? আমি তো ভেবেছিলাম তুই ফিরে গেছিস।' আদিত্য পালটা প্রশ্ন করল।

'দিদির শরীরটা ভাল নেই বলে যাওয়াটা পিছিয়ে দিলাম।' পার্থ বাগান দিয়ে হেঁটে এসে গেটের তালা খুলল। বলল, 'তুই এখানে চলে আসবি ভাবতেই পারিনি।'

'একটা কাজে রানাঘাটে এসেছিলাম। ভাবলাম তোর দিদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল।'

'দিদি তো বাড়ি নেই। ছেলেকে কোচিং ক্লাশে পৌঁছে দিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। ছেলেকে নিয়ে ফিরবে। মনে হয় দেরি হবে। তুই বোস।'

ওরা এখন বাড়ির ভেতর ঢুকে বাইরের ঘরে বসেছে। সাদামাটা বসার ঘর। দুটো বেতের চেয়ার, একটা বেতের সোফা, বেতের সেন্টার টেবিল। ঘরের এককোণে একটা বুককেসে কিছু বই আছে, প্রায় সবই ছোটদের। মেঝেতে প্যাস্টেল, আঁকার খাতা ছড়ানো। খাতায় অর্ধসমাপ্ত কালী ঠাকুরের মুখ।

'তোর ভাগ্নে বোধহয় এখানে বসে ছবি আঁকছিল।' আদিত্য সোফায় বসতে বসতে বলল।

'ও তো সব সময়েই ছবি আঁকছে। যখন যেটা মাথায় ঢোকে সেটা আঁকে। এখন কালী ঠাকুর মাথায় ঢুকেছে। চা খাবি তো?'

'সে খাওয়া যাবে এক কাপ। কিন্তু দিদিই তো বাড়ি নেই। কে চা করবে?'

'কাজের মাসি আছে, সে-ই চা করে।'

'এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটেছে।' আদিত্য বসতে বসতে বলল। 'বনবীথি ইস্কুলের গৌরবাবুর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠতে গিয়ে ভিড়ের ধাক্কায় প্ল্যাটফর্ম থেকে রেললাইনের ওপর পড়ে গেছেন, মাথায় চোট লেগেছে। নীলরতনে ভর্তি, কাল রাত্তির পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। ভিড়ের ধাক্কায় পড়ে গেছেন না কেউ ইচ্ছে করে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'

কথাগুলো বলতে বলতে আদিত্য চোখের কোনা দিয়ে খেয়াল করল বাড়ির ভেতরে যাবার দরজার পাশ থেকে একটা নারীমূর্তি চট করে সরে গেল। কেউ যেন আড়ি পেতে তার কথা শুনছিল।

হঠাৎ আদিত্য গলার আওয়াজটা তুলে বলল, 'চন্দ্রা লুকিয়ে থাকিস না, বেরিয়ে আয়। আর তোর কোনও ভয় নেই।'

পার্থ বাড়ির ভেতরে চা বলতে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভীষণ অবাক হয়ে যাবার ভান করে বলল, 'চন্দ্রা? এখানে কোথায় চন্দ্রা? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'আমার মাথা একদম পরিষ্কার কাজ করছে। শোন পার্থ। তোর আর অভিনয় করার দরকার নেই। চন্দ্রারও আর লুকোবার দরকার নেই। আমি তোকে গ্যারেন্টি দিচ্ছি আর কেউ এখন চন্দ্রাকে মারতে পারবে না।'

পার্থ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আদিত্য আবার তাকে বলল, 'আমি জানি তোর ইনটেনশনটা খুবই ভালো ছিল। তুই যে করে হোক চন্দ্রাকে বাঁচাতে চেয়েছিলি। তাই তাকে তোর দিদির বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলি। কিন্তু আমাকে তোর কনফিডেন্সে নিলে পারতিস।'

আদিত্য আবার গলা তুলে ডাকল, 'চন্দ্রা বেরিয়ে আয়। চন্দ্রা, এই চন্দ্রা।'

এবার ভেতর মহলের দরজা দিয়ে খুব ফর্সা, ঈষৎ শীর্ণকায় যে মেয়েটি বেরিয়ে এল আদিত্য তাকে কলেজ জীবন থেকেই চেনে। তার পরনে আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজ, কপালে সবুজ টিপ।

'কেমন আছিস আদিত্য?' চন্দ্রা খুব মৃদুস্বরে বলল।

আদিত্য খেয়াল করল চন্দ্রার কথা বলার ধরনটা একই রকম আছে। তবে সাজপোষাকে অনেক বাঙালি হয়েছে। আদিত্য বলল, 'আমি ভাল আছি রে। তুই কেমন আছিস?'

পার্থর হতভম্ব ভাবটা এখনও কাটেনি। চন্দ্রা বলল, 'আদিত্য আমি তোর সঙ্গে কলকাতায় ফিরব। এখানে অনেকদিন হয়ে গেল।' তারপর পার্থর দিকে ফিরে তার হাতদুটো ধরে বলল, 'তুমি আমার জন্যে যা করেছ কোনওদিন ভুলব না। তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ। কিন্তু আমি এখন কিছুদিন আলিপুরের বাড়িতে থাকতে চাই। তুমি কাল বা পরশু একবার আসবে তো?'

পার্থ কিছু বলার আগেই আদিত্য বলল, 'বাইরে কয়েকজন আর্মড পুলিশ অপেক্ষা করছে। বড় রাস্তায় ওরা ওদের জিপটা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। আমরা ওটা করেই কলকাতায় ফিরব। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। কেউ চন্দ্রার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না'

মিথ্যে নয়। ভেজানো দরজা ঠেলে সত্যি সত্যি কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ ঘরে ঢুকে এসেছে। বাগানের বড় গেটটা নিশ্চয় খোলাই ছিল। একটু পরে একটা পুলিশের গাড়ি এসে পার্থদের বাড়ির সামনে থামল। চন্দ্রাকে নিয়ে যখন আদিত্য গাড়িতে উঠছে তখনও পার্থ হতভম্ব হয়ে রয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদ

(১)

চন্দ্রা ফিরে এসেছে। সেই উপলক্ষে সে সবাইকে তার আলিপুরের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। সে কোথায় চলে গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, কী করছিল এতদিন, কেনই বা ফিরে এল সেসব গল্প চন্দ্রা নিশ্চয় সবাইকে বলবে। অন্তত সকলে তাই আশা করছে। তবে গল্প যাই হোক, চন্দ্রা যে ফিরে এসেছে এতে সকলেই ভীষণ খুশি। চন্দ্রাকে সকলেই খুব ভালবাসে। এমন ফুলের মতো মিষ্টি মেয়েটা, যে কখনও কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, সে হঠাৎ হারিয়ে যাবে কেন? ওপরওলার এ কেমন বিচার? চন্দ্রা হারিয়ে যেতে সকলেরই মন খারাপ হয়েছিল। এখন সে যে ফিরে এসেছে তাতে সবাই তো খুশি হবেই। অন্তত ওপর ওপর সকলকেই খুশি দেখাচ্ছে। অবশ্য ভেতরে ভেতরে কার কী কাছে কে জানে? সবাইকে এক সঙ্গে করার প্ল্যানটা অবশ্য আদিত্যর। কিন্তু সেটা একমাত্র চন্দ্রাকেই সে বলেছে।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কম নয়। পার্থ সান্যাল। সে তার যাওয়া আরও কয়েকদিন পিছিয়ে দিয়েছে। পার্থর দিদি বিপাশা লাহিড়ি চন্দ্রার নেমন্তন্ন ফেলতে পারেননি, তিনিও এসেছেন। তবে কোচিং আছে বলে তার ছেলে আসতে পারেনি। চন্দ্রা চলে আসার পর থেকে পুলিশ পার্থর দিদির বাড়ির ওপর দিনরাত্তির নজর রেখেছে। পার্থ আর তার দিদি এখানেও এসেছেন কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে। গৌরবাবুর ঘটনাটা ঘটার পর থেকে পুলিশ আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না।

এছাড়া এসেছেন চন্দ্রার বনবীথি ইস্কুলের কলিগরা—বড়দিদি, ছোড়দিদি, সোনাদিদি আর গৌরবাবু। চন্দ্রার অভিন্নহৃদয় বান্ধবী কেয়া বাগচি। চন্দ্রার পুরোনো বন্ধু রত্নাবলী মিত্র এবং তার স্বামী অমিতাভ মিত্র। সেনদের পুরোনো সলিসিটার সামারভিল অ্যান্ড চৌধুরির বর্তমান কর্ণধার অভীক চৌধুরি। আর বলাই বাহুল্য আদিত্য নিজে। সে নূপুর মণ্ডলকেও সঙ্গে এনেছে। আর এনেছে তার বন্ধু গৌতম দাশগুপ্তকে যিনি এখন কলকাতার একজন অ্যাডিশানাল পুলিশ কমিশানার। তার সঙ্গে দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী আছে। এছাড়া আছেন বাড়ির অন্য বাসিন্দা চন্দ্রার সৎমা কমলিকা সেন, তাঁর বিশেষ বন্ধু মন্টু রায় এবং চন্দ্রার অনুরোধে প্রমোটার নবীন সরাফ, যিনি আলিপুরের এই বাড়িটা প্রোমোটিং করবেন বলে বাজারে গুজব। দেহরক্ষীদের বাদ দিলে সব মিলিয়ে পনের জন, চন্দ্রাকে ধরলে ষোলো। বাড়ির বাইরে দুটো পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তাতে আরও অন্তত দশজন সশস্ত্র পুলিশ অপেক্ষা করছে। মুখে যতই খুশির ভাব দেখাক না কেন সকলেই ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত। আজ একটা কিছু ঘটবে।

নেমন্তন্নটা দুপুরের ছিল। নাহলে বনবীথি ইস্কুলের কেউ ফিরতে পারতেন না। একটু আগে সেই রাজকীয় মধ্যাহ্নভোজন শেষ হয়েছে। এখন অতিথিরা বড় হলঘরে জমায়েত হয়ে বিশ্রাম করছেন। সোনাদিদি একাধারে নার্ভাস ও পুলকিত। এত বড় বাড়ি আর এরকম ভোজ সে আগে কখনও দেখেনি। বড়দিদি-ছোড়দিদিও তাই, কিন্তু তাদের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না। গৌরবাবু এখনও পুরো সুস্থ হননি, তাঁর মাথার পেছন দিকে এখনও একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। চন্দ্রা নেমন্তন্ন করাতে তিনি না এসে পারেননি, তবে খুব বেশি খেতে পারলেন না। তিনি একপাশে চুপ করে বসে আছেন। অন্যরা বেশিরভাগই যে যার বন্ধু বেছে নিয়েছে। কেয়া বাগচি চন্দ্রা আর পার্থর সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, পার্থর ব্যাপারে তার যেসব সন্দেহ ছিল সেগুলো আর নেই। গৌতম দাশগুপ্ত তার পুরোনো বন্ধু অমিতাভ আর রত্নার সঙ্গে গল্প করছে। সলিসিটর সাহেবও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কমলিকা সেন মূলত কথা বলছেন মন্টু রায় এবং নবীন সরাফের সঙ্গে। বনবীথির দিদিরা নিজেদের মধ্যে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছেন, স্বাভাবিকভাবে

কথা বললে পাছে লোকে ভাবে তাঁরা আদব-কায়দা জানেন না। নূপুর মণ্ডল কারো সঙ্গেই কথা বলছে না, আনমনে নিজেরই আঙুল নিয়ে খেলছিল, একটু আগে বিপাশা লাহিড়ির সঙ্গে তার বেশ ভাব জমে গেছে। আদিত্য একটু দূর থেকে সকলকে লক্ষ করছিল।

মিনিট পাঁচেক পরে চন্দ্রা উঠে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। গলার আওয়াজটা একটু উঠিয়ে বলল, 'আপনারা সকলে আজ আমার নিমন্ত্রণে এখানে এসেছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি কিছুদিন নিরুদ্দেশ ছিলাম। আমি নিরুদ্দেশ ছিলাম বলে আপনারা অনেকেই আমার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আমার জন্য এই উৎকণ্ঠা আপনাদের ভোগ করতে হয়েছে বলে আমি ক্ষমা চাইছি। একই সঙ্গে আমার মনে হয় কেন আমি কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম সে ব্যাপারে আপনাদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার আছে। আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার গল্পটা আজ আপনাদের বলব। তবে আমি নিজে বলব না, আমার পুরোনো বন্ধু আদিত্য মজুমদার আপনাদের গল্পটা বলবে। আপনারা হয়ত কেউ কেউ জানেন আদিত্য একজন চমৎকার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার, সে এর আগে কয়েকটা জটিল কেস সমাধান করেছে। আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কেসটার সঙ্গেও আদিত্য যুক্ত ছিল। আদিত্য উইল টেক ওভার ফ্রম হিয়ার।'

আদিত্য উঠে গিয়ে ঘরের মাঝখানে চন্দ্রার পাশে দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় চন্দ্রাকে বলল, 'একটা চেয়ার এনে দিতে বলবি? মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কথা বলতে হবে।'

চেয়ার আসার পর আদিত্য কিছুক্ষণ চেয়ারে চুপ করে বসে রইল। যেন কী বলবে মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'পার্থ সান্যাল যখন আমাকে চন্দ্রলেখা অন্তর্ধান রহস্য সমাধান করার জন্য নিয়োগ করল তখন আমি ভেবে দেখলাম এখানে মূল প্রশ্ন দুটো। এক, কেন চন্দ্রার অন্তর্ধান ঘটল? দুই, চন্দ্রা এখন কোথায়? আমার মনে হলো দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর খোঁজা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। দুটো সম্ভাবনা ছিল। প্রথম সম্ভাবনা, চন্দ্রা আর বেঁচে নেই। তাকে কেউ খুন করে ফেলেছে। আত্মহত্যার সম্ভাবনাটা মনে হল বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি চন্দ্রাকে খুন করত তা হলে এতদিনে নিশ্চয় তার লাশটা খুঁজে পাওয়া যেত। খুনি খুন করে লাশটা লুকিয়ে রেখেছে যাতে কেউ খুঁজে না পায় এমন মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ দেখতে পেলাম না। খুন করার পর লাশটা লুকিয়ে রেখে খুনির লাভ কী? অতএব ধরে নিলাম চন্দ্রা বেঁচে আছে।'

আদিত্য একটু থামল। সকলেই চুপ করে আছে। এর পর আদিত্য কী বলবে শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'দ্বিতীয় সম্ভাবনা, মনে হল, চন্দ্রা নিজেই কোথাও লুকিয়ে আছে অথবা কেউ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। যতই ভাবতে লাগলাম ততই মনে হতে লাগল এটাই ঘটেছে। আপাতদৃষ্টিতে, চন্দ্রাকে কেউ মারতে চেয়েছিল, নেহাত ভাগ্যের জোরে সে দু-দুবার বেঁচে গেছে। তাই চন্দ্রার লুকিয়ে থাকাটা স্বাভাবিক। মনে হল, সে নিজের প্রাণের ভয়েই লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে? তার পক্ষে নিজে নিজে লুকিয়ে থাকাটা সহজ নয়। কেউ সাহায্য করলে তার লুকিয়ে থাকার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। কে তাকে সাহায্য করতে পারে? বস্তুত, তার বন্ধু বলতে দুজন—কেয়া বাগচি এবং পুরোনো প্রেমিক পার্থ সান্যাল যাকে সে খুব শিগগির বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু কেয়া বাগচি তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে? তার হস্টেলে সকলেই চন্দ্রাকে চেনে। অতএব সেখানে চন্দ্রাকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। আর দেশের বাড়ির সঙ্গে কেয়ার বহুদিন যোগাযোগ নেই। তাই সেখানেও চন্দ্রাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাহলে বাকি রইল পার্থ সান্যাল। তার দিদির বাড়ি পায়রাডাঙা। চন্দ্রাকে লুকিয়ে রাখার এমন আদর্শ জায়গা আর কী হতে পারে? আমার সন্দেহটা সত্যি প্রমাণিত হল যখন কেয়া বাগচি আমাকে জানালেন চন্দ্রার কাছ থেকে তিনি একটা এস এম এস পেয়েছেন। তাতে চন্দ্রা লিখেছে সে ভাল আছে, তাকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কেয়া ভীষণ চিন্তা করবে এই ভেবে চন্দ্রা মেসেজটা পাঠিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এস এম এস-টা রানাঘাটের দিক থেকে এসেছিল। ফোনের মালিক জনৈক রাজা

মল্লিক। পরে জানতে পেরেছিলাম সে পায়রাডাঙায় রিক্সা চালায়। সব মিলিয়ে মনে হল মেসেজটা এসেছিল পার্থর দিদির বাড়ি থেকে।'

'তাহলে পার্থ তোকে হায়ার করল কেন? পার্থ তো জানত চন্দ্রা কোথায় আছে।' রত্না সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

'খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। এর উত্তরটা আমি দিচ্ছি। পার্থ আমাকে হায়ার করেছিল সবাইকে এটাই বোঝানোর জন্যে যে সে জানে না চন্দ্রা কোথায় আছে। তাই সে একজন ডিটেকটিভ নিয়োগ করছে। অর্থাৎ চন্দ্রাকে যে সে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখেনি, অন্যদের মতো সেও চন্দ্রাকে খুঁজছে, এটাই বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল পার্থর। যাতে খুনি পার্থর বাড়িতে হানা দিতে না পারে। লক্ষ করা যেতে পারে, পার্থ যে আমাকে হায়ার করেছে এটা সে সবাইকে বলে বেড়িয়েছিল। আমার পরিচয় সবার কাছে ফাঁস করে দেবার একটাই কারণ যাতে খুনির ধারণা হয় পার্থ সত্যি সত্যি জানে না চন্দ্রা কোথায় আছে। অর্থাৎ চন্দ্রা পার্থর দিদির বাড়িতে নেই। সব মিলিয়ে আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম যে চন্দ্রা পার্থর দিদির বাড়িতে দিদির কাছে নিরাপদেই আছে। আমি প্রথম প্রশ্নটার উত্তর খোঁজায় মন দিলাম—কেন চন্দ্রাকে লুকিয়ে পড়তে হল? কেন কেউ তাকে খুন করতে চাইছে?'

'এক্সেলেন্ট ডিটেকশন। এক্সেলেন্ট রিজিনিং। এক্সেলেন্ট এক্সপ্লানেশন। তুই খুব ভাল মাস্টার হতে পারতিস।' পার্থ মুগ্ধ গলায় বলল।

'আদিত্য মাস্টারি করলে এইসব জটিল কেস কে সলভ করবে?' গৌতম ফুট কাটল।

আদিত্য একটু মুচকি হেসে আবার শুরু করল, 'আমার মনে হল, দুটো আলাদা আলাদা কারণে কেউ চন্দ্রাকে খুন করতে চাইতে পারে। প্রথমত, চন্দ্রা এক সময় নকশালদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। পরে তার মোহমুক্তি ঘটে। সে নকশালদের সংস্রব ত্যাগ করে পুরুলিয়া ছেড়ে বসিরহাটে চলে যায়। পার্থকে সে তাই বলেছিল। এমন হতেই পারে, নকশালদের কিছু গোপন তথ্য চন্দ্রা জানত। তাই তারা চন্দ্রাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। দ্বিতীয় কারণ, সম্পত্তি। আলিপুরের এই বাড়িটা বিক্রি করার ব্যাপারে চন্দ্রার ঘোর আপত্তি ছিল। হাজার চাপ সত্ত্বেও নিজের অংশটা সে কিছুতেই প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়নি। ফলে কমলিকা সেনের অংশটারও বাজার দর অনেকটা পড়ে গিয়েছিল। প্রোমোটার সরাফ সাহেবও বেশ খানিকটা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, চন্দ্রা মারা গেলে পুরো বাড়িটাই কমলিকা সেনের হয়ে যায়। সেরকম কিছু ঘটলে শুধু কমলিকা সেন নন, নবীন সরাফেরও বিলক্ষণ লাভ।'

'আপনি কী বলতে চান? প্রপার্টিটা পাবার জন্য আমরা চন্দ্রা সেনকে খুন করার চেষ্টা করেছি? আপনার কোনও প্রমাণ আছে? আমি আপনাকে সু করব। তাছাড়া সেদিন ফলস আইডেন্টিটিতে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইউ আর এ ফ্রড। জানেন আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি?' নবীন সরাফ উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'কাম ডাউন মিস্টার সরাফ। হি ইজ জাস্ট সাজেস্টিং এ থিওরেটিকাল পসিবিলিটি। আই অ্যাম রেপ্রেসেন্টিং দ্য পোলিস ইন দিস রুম। আই অ্যাশিয়োর ইউ নো ল হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই হিম অ্যাজ ইয়েট। প্লিজ টেক ইয়োর সীট অ্যান্ড লেট হিম কনটিনিউ।' গৌতম দাশগুপ্ত ঠাণ্ডা পুলিশি গলায় বলল।

অনিচ্ছাসত্ত্বে নবীন সরাফ আবার চেয়ারে বসলেন। আদিত্য লক্ষ করল কমলিকা সেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন, খানিকটা ভূতে পাওয়া মানুষের মতো। কিন্তু তার বন্ধু মন্টু রায় যেন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। চেয়ারে বসে ছটফট করছেন।

আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'সম্পত্তির ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যখন জানতে পারলাম মৃত্যুর কিছুদিন আগে কুমুদকিশোর সেন একটা নতুন উইল করেছিলেন যে উইলে তিনি এই আলিপুরের বাড়ি ও জমির পুরোটাই তাঁর একমাত্র মেয়ে চন্দ্রলেখা সেনকে দিয়ে যান। আর হাজারিবাগের বাড়ি ও জমির পুরোটাই দিয়ে যান তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কমলিকা সেনকে। তবে কমলিকা সেন যতদিন চাইবেন

ততদিন এই আলিপুরের বাড়িতে থাকতে পারবেন। এখান থেকে কেউ তাঁকে তাড়াতে পারবে না। তিনজন সাক্ষী এই দলিলে সই করেছিল ড্রাইভার মদন মান্না, আর্দালি রামসেবক পাসোয়ান, আর ক্লার্ক নিমাই সরকার। তিনজনেই কুমুদকিশোরের চাকরি করত। এদের মধ্যে প্রথম দুজনের সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করতে পেরেছে। পুলিশের জেরায় দুজনেই স্বীকার করেছে তারা ওই উইলে সই করেছিল। তারা এটাও স্বীকার করেছে যে তাদের মোটা টাকা দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে কোর্টে যদি কখনও উইলটা চ্যালেঞ্জ করা হয় তাহলে তারা বলবে তারা সম্পূর্ণ না বুঝে উইলটা সই করেছিল। এখন তারা বলছে কোর্টে বিষয়টা উঠলে কবুল করবে সই নেবার আগে কুমুদকিশোর ভাল করে তাদের উইলের বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উইল গ্রাহ্য হবার জন্য দুটি সাক্ষীই যথেষ্ট। তাও পুলিশ তৃতীয় সাক্ষীটিকে খুঁজছে। অধিকে দোষ নেই। শুধু একটাই সমস্যা এবং সমস্যাটা বেশ গভীর।'

আদিত্য দম নেবার জন্য একটু থামল। টেবিলের ওপরে রাখা জলের জাগ থেকে এক গেলাস জল ঢেলে পুরোটাই খেয়ে নিল। ঘরে অখণ্ড নীরবতা। আরো খানিকটা জল গেলাসে ঢেলে ছোট একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল আদিত্য। 'সমস্যাটার কথায় পরে আসছি। তার আগে জানা দরকার, কে সাক্ষীদের ঘুষ দিয়েছিল? নবীন সরাফ ছাড়া আর কে হতে পারে?'

একথা শুনেই নবীন সরাফ আবার দাঁড়িয়ে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে গৌতম বলল, 'সরাফ সাহেব। এটা আপনার প্রথম কুকীর্তি তো নয়। তাই অনেকদিন থেকেই আপনার ওপর পুলিশের নজর আছে। আপনার সাকরেদ, যে আপনার হয়ে বাজে কাজগুলো করত, সে পুলিশের ফাঁদে পা দিয়েছে। আপাতত সে পুলিশ হেফাজতে। সে আপনার হয়ে তিন সাক্ষীকে ঘুষ দেবার কথা স্বীকার করেছে।'

আদিত্য বলল, 'নবীন সরাফ তার পার্টনার মন্টু রায়ের মাধ্যমে কমলিকা সেনের অংশটা জলের দরে কিনে নিচ্ছিলেন। কমলিকা সেনকে তার বন্ধু মন্টু রায় বুঝিয়েছিলেন প্রপার্টিটার জন্যে বিরাট দাম পাওয়া যাচ্ছে। কমলিকাও তার বন্ধুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এই ভেবে তৃপ্তিলাভ করছিলেন যে মন্টু রায় তাকে বিরাট জিতিয়ে দিচ্ছেন। কমলিকা, বলাই বাহুল্য, রিয়াল এস্টেট বাজারের কিছুই জানতেন না। বাজার সম্বন্ধে যদি তার বিন্দুমাত্র ধারণা থাকত তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন নবীন-মন্টু জুটি তাঁকে কী সাংঘাতিক ঠকাচ্ছেন। জমিটা জলের দরে পাওয়া যাবে, মন্টুবাবুর কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে নবীন সরাফ পোটেনশিয়াল বায়ারদের থেকে ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আগাম টাকা নিয়ে ফেললেন। কিন্তু টাকা নেবার পরে হঠাৎ একদিন তারা জানতে পারেন পুরো প্রপার্টিটাই আসলে চন্দ্রলেখা সেনের। আগাম নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়া অসম্ভব কারণ সেটা ইতিমধ্যেই সরাফ সাহেবের বালিগঞ্জের প্রজেক্টে ঢালা হয়ে গেছে। আবার টাকা ফেরত না দিতে পারলে সরাফ সাহেবের ব্যবসার ভবিষৎ অন্ধকার কারণ যাদের কাছ থেকে উনি টাকা নিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাই মন্টু রায় ও নবীন সরাফ সাক্ষীদের ঘুষ দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। কে কে সেনের নতুন উইলটা চুরি করার উদ্দেশ্যে দফায় দফায় কয়েকজন মহিলাকে কেয়া বাগচির বাড়িতে পাঠালেন। তাছাড়া এটা তো ঠিক যে পুরো বাড়িটাই আসলে চন্দ্রার এবং চন্দ্রা এই বাড়ি মোটেই বিক্রি করতে চায় না এটা জানার পরেও নবীন সরাফ আমার কাল্পনিক বসকে ফ্ল্যাট বেচতে রাজি হয়েছিলেন। ওর লোভের সত্যিই শেষ নেই।'

'আমি আবার এসবের মধ্যে কীভাবে এলাম?' মন্টু রায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'আপনারা কিন্তু এবার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি এই বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকব না।' মন্টু রায় সোফা থেকে উঠে প্রস্থানের ভঙ্গী করলেন।

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান। পুরো গল্পটা না শুনে যাবেন কোথায়? তাছাড়া আপনারা যে চন্দ্রাকে খুনের চেষ্টা করেননি সেটাও তো এখনও প্রমাণ হয়নি।' এবার আদিত্যর গলা।

মন্টু রায় বসে পড়লেন। আদিত্য বলল, 'একটা জিনিস কিন্তু এক্ষুনি প্রমাণ করা যাবে। ম্যাকনীল-ম্যাকফারসন কম্পানিতে জিজ্ঞেস করলেই ওরা বলে দেবে আপনি ওখানে আর নেই। পাঁচ বছর আগে

টাকা-পয়সা গণ্ডগোল করার অভিযোগে আপনাকে ওখান থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া বছর দুয়েক আগে নিনা আগরওয়াল নামে এক মাঝবয়সী ধনী মহিলা আপনার নামে প্রতারণা এবং টাকা চুরির চার্জ আনেন। আপনাকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছিল। সেই মামলা এখনও চলছে। আপাতত আপনি বেল-এ আছেন।'

বলতে বলতে আদিত্য কমলিকা সেনের দিকে তাকাল। তার মনে হল ভদ্রমহিলা ভেতরে ভেতরে অবর্ণনীয় কষ্ট পাচ্ছেন। সে কমলিকা সেনকে বলল, 'ম্যাডাম আপনি আমাকে ভাল করে বাজিয়ে দেখার জন্যে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। আমি যাতে ডিনারে থেকে যেতে রাজি হই তার জন্য আপনার কাকাকেও জীবনে প্রথম বার নেমন্তন্ন করলেন। আপনি জানতেন তারাপদ গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলার লোভ আমি সামলাতে পারব না। আমার অনুমান, পুরো কাজটাই আপনি করেছিলে মন্টু রায়ের কথায়। মন্টু রায় জানতে চেয়েছিল চন্দ্রাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমি কতদূর এগিয়েছি। আপনি মন্টু রায়কে বিশ্বাস করে ঠকে গেছেন। আপনার একটাই সান্ত্বনা যে এই ব্যাপারে আপনি একা নন।'

বেয়ারা সরবত নিয়ে এসেছে। পাতিলেবুর সঙ্গে বিটনুন ও অন্যান্য মশলা দিয়ে বানানো সরবত। গুরুভোজনের পরে হজমে সাহায্য করে, স্বাদেও চমৎকার। সরবতের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'এবার সমস্যাটার কথায় আসি। কুমুদকিশোরের শেষ উইলের দুজন সাক্ষীকে আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু উইলটা এখনও পাইনি। উইলটা পাওয়া না গেলে কিন্তু আগের উইলটাই বহাল থাকবে। কুমুদকিশোরের শেষ ইচ্ছেটা পূরণ হবে না।'

অভীক চৌধুরি বলে উঠলেন, 'চন্দ্রলেখা সেন আমার কাছে একটা খাম গচ্ছিত রেখে বলেছিলেন তিনি না বললে যেন আমি খামটা না খুলি। খামের ভেতরে কী আছে আমি জানি না। আজ সকালে মিস সেন আমাকে খামটা সঙ্গে আনতে বলেছিলেন। আমি সেটা এনেছি। এখন উনি যদি বলেন, আমি খামটা খুলতে পারি।'

খামের ভেতর থেকে কে কে সেনের শেষ উইলটা বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেক পরে, যখন চন্দ্রার সম্মতি অনুযায়ী নতুন উইলটা সবার সামনে অভীক চৌধুরির পড়া হয়ে গেছে, তখন নবীন সরাফ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই উইল আমরা মানি না। আমরা এই উইলের বিরুদ্ধে কোর্টে যাব।'

'কে কোর্টে যাবে? আপনি একা? আমি এই উইলকে মেনে নিচ্ছি।' কমলিকা সেন শান্ত গলায় কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। আমাকে দয়া করে মার্জনা করবেন আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।'

গৌতমের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় আদিত্য কমলিকা সেনকে যেতে দিতে বলল। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আদিত্য আবার শুরু করল, 'একটা জিনিস কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার। নবীন শরাফ এবং মন্টু রায় চন্দ্রাকে খুন করতে চায়নি। সাধারণ বুদ্ধি বলে, একজন অপরাধী আগে দেখবে চুরি করে তার কার্যসিদ্ধি হচ্ছে কিনা। যদি তা না হয় তাহলেই সে খুন করার কথা ভাববে। কিন্তু এক্ষেত্রে চুরির চেষ্টার অনেক আগে খুনের চেষ্টা হয়েছিল। তাই মনে হয় খুনের চেষ্টার পেছনে সম্পূর্ণ অন্য কোনও কারণ ছিল। তাছাড়া নবীন শরাফ এবং মন্টু রায়কে চন্দ্রার খুনি হিসেবে ধরে নিলে বনবীথি অঞ্চলের অন্য খুনগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। অতৃপ্ত আত্মারা এসে মানুষের ঘাড় মটকে গেছে এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া মুস্কিল। আর সব থেকে বড় কথা, চন্দ্রাকে কেউ খুন করার চেষ্টাই করেনি। শুধু ভয় দেখিয়ে বনবীথি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। এই একই কারণে মাওবাদীরাও চন্দ্রাকে খুন করতে চাওয়ার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে।'

কথাগুলো বলে আদিত্য গৌরবাবুর দিকে তাকাল। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল না তিনি কী ভাবছেন। একটু থেমে আদিত্য বলল, 'সরাফ সাহেব, রায় সাহেব, আপনারা চাইলে এখন চলে যেতে পারেন। আপনাদের ব্যাপারে পুলিশ যদি কোনও স্টেপ নেয় পরে জানতে পারবেন। আমার মনে হয় না আপনাদের যেতে দেবার ব্যাপারে গৌতমের কোনও আপত্তি হবে।'

নবীন শরাফ এবং মন্টু রায়ের কিন্তু চলে যাবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

(২)

কার্তিকের বেলা দ্রুত পড়ে আসছে। আদিত্য জানলা দিয়ে দেখল কার্নিশে জনা পনের কাক মিটিং করছে। এটা ওদের বাসায় ফেরার প্রস্তুতি। ঘরের ভিতরে এখনও যথেষ্টই দিনের আলো আছে, তবু বেয়ারা বড় ঝাড়লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। 'একটু চা এলে বেশ হতো' কে যেন বলল। বলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেহেতু চা এসে হাজির, তাই আদিত্য ধরে নিল বক্তার কথায় চা আসেনি। চা তৈরির প্রক্রিয়া অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আদিত্য বলল, 'যেটা বলছিলাম। চন্দ্রাকে কেউ ভয় দেখিয়ে বনবীথি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রাণে মারতে চায়নি। কী করে এটা বুঝলাম? পার্থ বনবীথির সবার কাছে আমার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল, ফলে ওখানে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল। আমি তাই নূপুর মণ্ডলকে আমার সহযোগী নিয়োগ করে তাকে নীপবীথিতে পাঠালাম। নূপুর ওখানে গিয়ে ইস্কুলে চাকরি নিল। আমাদের সৌভাগ্য সে চন্দ্রার চাকরিটা পেয়ে গেল। নূপুরকে নিয়োগ করার কথাটা আমি কাউকে বললাম না, পার্থকেও নয়, পাছে তার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যায়।

'নূপুর আমাকে খুব দরকারি একটা খবর দিল। যে সাপটাকে চন্দ্রার বাথরুমে ঢোকানো হয়েছিল, সেটার বিষদাঁত ভাঙা ছিল। যে সাপুড়ে সাপটা বিক্রি করেছিল সে-ই নূপুরকে খবরটা দিয়েছিল। আরও পরে চন্দ্রার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, আরেকটা রাত্তিরে চন্দ্রার ঘরে সিলিং ফ্যানটা ভেঙে পড়ার কিছু আগে একটা অন্যরকম শব্দে চন্দ্রার ঘুম ভেঙে যায়। সে যখন উঠে দেখতে গেছে শব্দটা কোথা থেকে এল, ঠিক সেই সময় ফ্যানটা ভেঙে পড়ে। চন্দ্রার ঘুম ভাঙানোর জন্যে শব্দটা করা হয়েছিল। যিনি ফ্যানের জয়েন্টটা আলগা করে দিয়েছিলেন তিনি মোটেই চন্দ্রাকে মারতে চাননি। অর্থাৎ ফ্যান ভেঙে পড়ার যে গল্পটা বনবীথিতে চলছিল, পরে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, তার সঙ্গে বাস্তবের কিছু অমিল ছিল। প্রশ্ন হল, চন্দ্রাকে কেন কেউ ভয় দেখিয়ে বনবীথি থেকে তাড়াতে চাইবে?'

ঘরে স্তব্ধতা বিরাজ করছে। আদিত্য ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আসল সমস্যাটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার বন্ধু গৌতম দাশগুপ্ত। সরাসরি না করলেও পরোক্ষভাবে। গৌতমের কথায় আমার মনে হয়েছিল সম্ভবত বনবীথি অঞ্চলে আর্মস ডিলারদের একটা চক্র সক্রিয় আছে। এরকম কিছু হলে ওই এলাকায় মাঝে মাঝে দুএকটা খুন-টুন হওয়া স্বাভাবিক। এইসব আর্মস ডিলারদের মধ্যে বখরা নিয়ে বা অন্যান্য কারণে গণ্ডগোল লেগেই থাকে। হয়ত তার জেরে খুন। ওখানকার ওসিও দেখলাম একেবারে নিষ্ক্রিয়। দেখে মনে হল টাকা-পয়সা খেয়ে মুখে কুলুপ এঁটে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।

আমার প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে অস্ত্র বিক্রির নেটওয়ার্কটার কথা একটু বলি। অস্ত্রগুলো আসত বাংলাদেশের বর্ডার পেরিয়ে। এপারে এসে বর্ডারের কাছেই কোথাও একটা অস্ত্রগুলো জমা হতো। তারপর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তারা বিক্রি হয়ে যেত। ক্রেতা মূলত মাওবাদীরা এবং কিছু কিছু ধর্মীয় উগ্রপন্থী দল। পুলিশ জানতে পেরেছে বীথি নামক এন জি ও অস্ত্র বিক্রির এই ব্যবসাটা চালাত। বর্ডারের ওপার থেকে অস্ত্র এসে জমা হতো এপারে বনবীথি স্কুলের একটা গোপন কুঠরিতে। মনে রাখতে হবে বনবীথির ইস্কুলবাড়িটা এক সময় নীলকুঠি ছিল। এখানে দুএকটা গোপন ঘর থাকাটা মোটেই আশ্চর্য নয়, যে-ঘর অস্ত্র লুকিয়ে রাখার আদর্শ জায়গা। তাছাড়া বনবীথি বর্ডারের কাছেই। এই দুই মিলিয়ে বনবীথিকেই অস্ত্রের গুদোমঘর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বনবীথি থেকে বীথির অন্য ইস্কুলগুলোতে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হতো, সেসব জায়গা থেকে অস্ত্র চলে যেত ক্রেতার কাছে।

'বনবীথি ইস্কুলের একটা ঘর সব সময় বন্ধ থাকত। জনশ্রুতি, সে ঘরে নীলকুঠির সাহেবদের অতৃপ্ত আত্মারা থাকে যাদের বহু বছর আগে নীল বিদ্রোহের সময় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আসলে এই ঘরের মধ্যে দিয়েই বনবীথির গোপন কুঠরিতে যাবার লুকোনো দরজা, যে কুঠরি অস্ত্রের মজুতঘর। দরজাটা এমনিতে

দেখা যায় না। কিন্তু কেউ বিশেষভাবে খুঁজলে কিংবা নেহাতই দৈবক্রমে দরজাটা বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই পুরোনো জনশ্রুতিটা কাজে লাগিয়ে ঘরটা বন্ধ রাখা হয়েছিল। মেমদিদি অর্থাৎ চন্দ্রা এসে ঘরটা খোলানোর ব্যবস্থা করে। শুধু খোলানো নয়, চন্দ্রা সেখানে ছুটির পরে নিয়মিত মেয়েদের ইংরেজি আর অঙ্কের ক্লাশ নেওয়া শুরু করল। ফলে অস্ত্রের মজুতঘরটি আর নিরাপদ রইল না।

'ঘরটি যাতে ফের বন্ধ করে দেওয়া হয় তার জন্য অস্ত্র কারবারিদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কয়েকজন কালিঝুলি মাখা রণপা পরা লোককে রাত্তিরে ইস্কুলের পাশে ছেড়ে দেওয়া হল। ইস্কুলের ছাত্রী ছন্দা বাগ, সেলাই দিদিমনি এবং চন্দ্রা নিজেও এদেরই রাত্তিরে ঘুরতে দেখেছিল। আরও অনেকেই এদের দেখেছিল। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোলের ফলে যে খুনগুলো হচ্ছিল তার সঙ্গে মিশে গিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে রটে গেল ইস্কুলের চারদিকে অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৌরবাবু, যিনি পুরোহিতের কাজও করেন, বিধান দিলেন ঘরটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। অস্ত্র কারবারিদের দুর্ভাগ্য, এতসব সত্ত্বেও দিদিমনিরা ভূতের ব্যাপারে কনভিন্সড হলেন না। শুধু চন্দ্রা নয়, বড়দিদি এবং ছোড়দিদিরও ধারণা হল পাশের একটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল তাদের ব্যবসার স্বার্থে এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। আমরা অবশ্য খবর নিয়ে দেখেছি এসব ব্যাপারে ওই স্কুলের কোনও হাত নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে চন্দ্রাকে বনবীথি থেকে সরিয়ে দেবার যথেষ্ট কারণ অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল চন্দ্রাকে বনবীথি থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘরটা আবার বন্ধ করে রাখা। কিন্তু অস্ত্র ব্যবসায়ীরা চন্দ্রাকে মেরে ফেলল না কেন? চন্দ্রাকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের কী সুবিধে হচ্ছিল? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে দেখা যাক চন্দ্রা নিজে অস্ত্র ব্যবসার ব্যাপারটা কতটা সন্দেহ করতে পেরেছিল। বস্তুত, চন্দ্রা আন্দাজ করতে পেরেছিল বীথির ইস্কুলগুলোতে মিড ডে মিলের ট্রাকে চাল-ডালের সঙ্গে অস্ত্রও আসে। চন্দ্রা, এটা কি আমি ঠিক বলছি?' আদিত্য চন্দ্রার দিকে তাকাল।

সকলে চন্দ্রার দিকে তাকাতে চন্দ্রা মাথা নাড়িয়ে ধীরে ধীরে সম্মতি জানাল। বলল, 'আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে মিড ডে মিলের গাড়ির সঙ্গে আর্মস সাপ্লাইয়ের একটা সম্বন্ধ আছে। মিড ডে মিলের গাড়ি না এলে অভিজিৎ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। ইন ফ্যাক্ট আমি পরে বুঝতে পেরেছি, অভিজিৎ প্রত্যেক মাসে আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসার ছুতোয় নীপবীথি ইস্কুলে অস্ত্র কিনতে আসত। তারপর বনবীথিতেও এসে দেখলাম সেই একই দুটো লোক মিড ডে মিলের গাড়ি নিয়ে আসছে। দেখে সন্দেহটা বাড়ল।'

চন্দ্রার সমর্থন পেয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করল। 'হোয়াটসঅ্যাপে কেয়া চন্দ্রার যে দুটো ছবি পাঠিয়েছিল, আমি সেগুলো আবার ভাল করে দেখলাম। মনে হল, একটা ছবিতে দর্শকদের মধ্যে দুজন দাঁড়িয়ে আছে যাদের আমি আগে দেখেছি। কোথায় দেখেছি তাও মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে আমি যখন পুরুলিয়ায় নীপবীথি ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন দেখেছিলাম এই দুজন লোক পিঠে বস্তা নিয়ে স্কুলের ভেতরে মিড ডে মিলের চাল-আলু পৌঁছে দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, ওরা বনবীথি ইস্কুলে কী করছে?

'প্রশ্নটার কিন্তু খুব সহজ একটা উত্তর আছে। স্বাভাবিক উত্তর হলো, লোক দুটো যেমন নীপবীথি ইস্কুলে মিড ডে মিলের রসদ পৌঁছে দিতে আসত, বনবীথিতেও তাই। এসে দেখেছে বনবীথি ইস্কুলে গান-বাজনা হচ্ছে। গান শোনার জন্য তারা দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। নীপবীথি এবং বনবীথি চালায় একই এন জি ও। একই জায়গা থেকে তাদের মিড ডে মিলের রসদ যোগান দেওয়া হয়। অতএব একই লোক দুটো ইস্কুলে রসদ পৌঁছে দেবে এতে আর আশ্চর্য কী আছে? আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় কিন্তু বলছিল কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। পরে চন্দ্রার স্কেচবইটা হাতে পেয়ে দেখলাম ওই দুই ব্যক্তির সঙ্গে আর একজনকে চন্দ্রা স্কেচ করেছে। আমার মনে পড়ল, কেয়া বাগচির পাঠানো ছবিতে ওই তৃতীয় জন দর্শকদের প্রথম সারিতে বসে ছিলেন। দেখে মনে হয় ইনি যেন বনবীথি ইস্কুলেরই কেউ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে বনবীথি ইস্কুলের কেউ নীপবীথি ইস্কুলে কী করছিলেন? আমি মনে মনে একটা গল্প খাড়া করলাম।

'বনবীথি ইস্কুলে পড়াতে এসে চন্দ্রা এমন একজনকে দেখেছিল যাকে দেখে তার মনে হয়েছিল আগে যেন কোথায় দেখেছে। সে প্রথম প্রথম মনে করতে পারেনি কোথায়। পরে তার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সে ওই ব্যক্তিকে নীপবীথি স্কুলে দেখেছে। অথচ সেই ব্যক্তির নীপবীথি স্কুলে যাবার কোনও কারণই ছিল না। চন্দ্রা যখন সরল মনে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল তিনি কখনও নীপবীথি ইস্কুলে গেছেন কিনা, আমার ধারণা, সেই ব্যক্তি চন্দ্রাকে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, তিনি কখনও নীপবীথি ইস্কুলে যাননি। তার কথায় চন্দ্রার সন্দেহ হয়। কিন্তু তখন তখন তার সন্দেহের কথা চন্দ্রা কাকে বলবে? সে শুধু তার স্কেচবুকে ওই ব্যক্তির একটা ছবি এঁকে রেখেছিল। একা ওই ব্যক্তির ছবি নয়। যে দুজন মিড ডে মিলের বস্তায় অস্ত্র সাপ্লাই করত স্কেচে দেখা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে ওই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়ত ওই অবস্থাতেই চন্দ্রা ওদের দেখেছিল। বলে রাখি, এসব নিয়ে চন্দ্রার সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়নি, তবে যতদূর মনে হয় ব্যাপারটা এরকমই ঘটেছিল।'

'তুই নীপবীথি ইস্কুলে কাকে দেখে ছবি এঁকেছিলি?' রত্না ঈষৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

চন্দ্রা উত্তর দেবার আগেই আদিত্য বলে উঠল, 'চন্দ্রা স্কেচবুকে যার ছবি এঁকেছিল সে এই ঘরের মধ্যেই আছে। কিন্তু তার কাছে আমরা পরে আসছি। তার আগে আর্মস ট্র্যাফিকিং-এর ব্যাপারটা গৌতমের কাছ থেকে আর একটু ভাল করে শোনা যাক।'

'আজ খুব ভোরবেলা বীথির প্রত্যেকটা স্কুল রেড করে পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। বীথির মালিক রণবীর রায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি এই আউটফিটটির আউটার ফেস। আসল মাথা একজন বাংলাদেশি। পুলিশের খাতায় তার নাম আসলাম খান, যদিও তার কোনও ছবি পুলিশের কাছে নেই। তার গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশের ধারণাও বেশ কম। আসলামের সঙ্গে মিলে রণবীর রায় এই ব্যবসাটা করতেন। আর্মস ডিলার আসলামের সঙ্গে রণবীর রায়ের যোগাযোগ বিদেশে। এই যোগাযোগের কথা জানতে পেরে সুইটজারল্যাণ্ডে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। আমরা রণবীর রায়ের বহু কুকীর্তির হদিশ পেয়েছি।' ঘরের একদিকের কোণ থেকে গৌতমের গলা শোনা গেল।

আদিত্য আবার বলতে লাগল, 'অতৃপ্ত আত্মা তত্ত্বের সব থেকে বড় প্রচারক ছিলেন গৌরবাবু। তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে শান্তি-স্বস্তয়ন করলেন। অন্যদেরও করালেন। কিন্তু চন্দ্রাকে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে পারলেন না। চন্দ্রা তাঁকে আগে থেকেই সন্দেহ করছিল। কারণ কয়েক বছর আগে সে এই গৌরবাবুকেই নীপবীথি ইস্কুলে দেখে ফেলেছিল। স্কেচবুকে গৌরবাবুরই ছবি সে এঁকেছিল।'

'এসব আপনি কী বলছেন দাদাভাই। গরিব ব্রাহ্মণের নামে এ কী কলঙ্ক রটাচ্ছেন। আমি কোনওদিন নীপবীথি ইস্কুলে যাইনি। মনে রাখবেন মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন। তিনি সব দেখছেন।' গৌরবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছেন, তার গলা কাঁদোকাঁদো।

'আপনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে হাতটা বার করুন। দু-দুটি বন্দুক আপনার দিকে তাক করা আছে। ওকে হ্যান্ডকাফ লাগাও।' গৌতম কড়া গলায় বলল।

'গৌরবাবুই চন্দ্রার বাথরুমে সাপ ঢুকিয়ে তাকে ভয় পাওয়াতে চেয়েছিল। চন্দ্রার সিলিং ফ্যানের জয়েন্ট আলগা করে রেখেছিল।' আদিত্য বলল।

ঘরে প্রায় ম্যাজিকের মতো আরও কয়েকজন পুলিশ ঢুকে পড়েছে। গৌরবাবুকে হাতকড়া পরানোর পর তার পকেট সার্চ করে একটি ছোট্ট, অতীব সুদৃশ্য রিভলভর পাওয়া গেছে। যন্ত্রটা মিউজিয়ামে রাখার মতো সুন্দর। গৌতমের নির্দেশে গৌরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন পুলিশ লালবাজারের উদ্দেশে রওনা হল।

'কয়েকটা কারণে গৌর বাঁড়ুজ্জের ওপর আমার সন্দেহ হয়।' গৌরবাবুকে নিয়ে পুলিশরা চলে যাবার পর আদিত্য বলতে লাগল, 'প্রথম যখন চন্দ্রার স্কেচটা দেখি তখনও অবশ্য গৌরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু স্কেচের অন্য দুজনকে চেনা লাগল। একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল এদের আমি কেয়া বাগচির পাঠানো ছবিতে দেখেছি। আমার মনে হল, ছবি এবং স্কেচ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর যখন গৌরবাবুকে দেখলাম

তখন আমার সব সন্দেহ তার ওপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু এটা ছাড়াও আরও দুটো ব্যাপারে তার ওপর আমার সন্দেহ হয়। এক, গৌরবাবুর অতীতটা ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট, আন-অ্যাকাউন্টেড ফর। তিনি বললেন, ইস্কুল পাশ করার পরে অনেকটা সময় তিনি সাধুদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। তার দেশের বাড়িতেও এখন আর কেউ নেই। অর্থাৎ খতিয়ে দেখার কোনও উপায় নেই তিনি যেটা বলছেন সেটা সত্যি না মিথ্যে। একজন ইন্টারন্যাশানাল আর্মস ডিলারের পক্ষে এই ধরনের নন-ভেরিফায়েবল অতীত খুবই সুবিধেজনক। দুই, আমরা যেদিন বনবীথি ইস্কুলে গেলাম, গৌরবাবু আমাদের বললেন, স্কুলে জায়গার অভাব। তাই যদি আমাদের আপত্তি না থাকে ওঁর বাড়ি গিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে লাগল। গৌরবাবু বলছেন ওঁর বাড়ি বর্ধমানে। বর্ধমানের লোক কখনও 'আলাপ করা যেতে পারে' বলবে না। বলবে 'কথা বলা যেতে পারে'। 'কথা বলা' অর্থে 'আলাপ করা' এক্সপ্রেশনের ব্যবহারটা ভীষণ বাংলাদেশি।'

(৩)

'তাহলে কি আমাদের গৌরবাবুই ওই কুখ্যাত অস্ত্র-ব্যবসায়ী আসলাম খান?' ঘরের একদিক থেকে বড়দিদি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল। ওরা তিন দিদিমনি প্রায় নেই হয়ে বসে আছে।

'আমি তো সেই রকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু গৌরবাবুকে আসলাম খান হিসেবে কল্পনা করলে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। প্রশ্নগুলো আমাকে খুব ভাবাচ্ছে।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চিন্তিত গলায় বলল, 'আগে প্রশ্নগুলো এক এক করে আপনাদের সামনে রাখছি। পরে না হয় উত্তর খোঁজা যাবে। প্রথম প্রশ্ন, চন্দ্রা কেন তার সন্দেহের কথা বলতে একবারের জন্যেও পুলিশের কাছে যায়নি, এমনকি তার সলিসিটার অভীক চৌধুরির পরামর্শও চায়নি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, পার্থ সান্যাল আমার ফোন নম্বরটা পেল কোথায়? সে জানল কী করে আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার? আমি এমন কিছু বিখ্যাত নই যে একজন আমেরিকাবাসী পেশাদার, যার সঙ্গে কুড়ি-একুশ বছর দেশের কোনও সম্পর্ক নেই, আমার কথা জানবে। তৃতীয় প্রশ্ন...'

'তোর প্রথম দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি।' আদিত্যকে শেষ করতে না দিয়েই পার্থ বলল। 'চন্দ্রাকে আমিই পুলিশের কাছে যেতে বারণ করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল এদেশের পুলিশ এতটাই করাপ্ট যে তাদের কাছ থেকে চন্দ্রার হাইড-আউটটা লিক হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, তোর পুরোনো কোনও বন্ধু অ্যামেরিকায় তোর কথা বলেছিল। কে বলেছিল এখন মনে পড়ছে না। তোর ফোন নম্বরটাও তার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।'

'আমার তৃতীয় প্রশ্ন,' পার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আদিত্য বলতে লাগল, 'পার্থ আমার সঙ্গে সঙ্গে বনবীথি গেল কেন? কেন সে আমাকে একা যেতে দিল না? চতুর্থ প্রশ্ন, খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় গৌরবাবুর ব্যাপারে তার সন্দেহের কথা চন্দ্রা পার্থকে বলেছিল। কিন্তু পার্থ সেকথা আমাকে জানায়নি কেন? পঞ্চম প্রশ্ন, ট্রেন লাইনের ওপর পড়ে গিয়ে গৌরবাবু যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখন তার পকেট থেকে একটা পায়রাডাঙা-শেয়ালদার টিকিট পাওয়া গিয়েছিল। গৌরবাবু পায়রাডাঙায় কেন গিয়েছিলেন? পার্থর সঙ্গে দেখা করতে? নাকি অন্য কোনও কাজে? আর ষষ্ঠ প্রশ্নটা তো আগেই করেছি। আর্মস ডিলাররা চন্দ্রাকে কেন বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল? এছাড়া আর একটা কথা আছে, যেটা ঠিক প্রশ্ন নয়। বলা যায়, এটা আমার একটা অনুভব, একটা গাট ফিলিং। অনুভবটা হল, গৌরবাবুকে দেখে আমার কখনই মনে হয়নি তিনি নেতৃত্ব দিয়ে একটা আন্তর্জাতিক দল চালাতে পারেন। বরং তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি ভালমানুষের ছদ্মবেশে একজন সুনিপুণ ঘাতক, যিনি ঊর্ধ্বতন কারও হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত। গৌতমকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম কাদের মল্লিক বলে আসলাম খানের একজন ডানহাত আছে। তাকেও পুলিশ খুঁজছে। আমার মনে হল, আসলাম খান নয়, আসলামের ডানহাত কাদের মল্লিকের সঙ্গে বরং গৌরবাবুর অনেক বেশি মিল।'

পার্থ আবার কী একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। আদিত্য বলতে লাগল, 'আমি আমার কল্পনা দিয়ে একটা কাহিনি তৈরি করেছি, সেটা আগে বলি। তারপর দেখা যাবে বাস্তবের সঙ্গে সেই কাহিনি কতটা মেলানো যাচ্ছে। এই কাহিনির নায়ক আসলাম খান, আন্তর্জাতিক অস্ত্র-কারবারি। আসলামের বাড়ি বাংলাদেশে, ব্যবসা পৃথিবী জুড়ে। দুর্ভাগ্যবশত, কোনও দেশের পুলিশের কাছেই তার কোনও ছবি নেই। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের পুলিশ আসলামের ওপর তাদের জাল প্রায় গুটিয়ে এনেছিল, শেষ মুহূর্তে সে জাল থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে থাকা তার পক্ষে অতিশয় ঝুঁকির হয়ে ওঠে। তাই আসলাম, অন্তত কিছুদিনের জন্য, নতুন একটা দেশ এবং নতুন একটা পরিচয়ের খোঁজ করছিল। পশ্চিমবঙ্গটাই তার থাকার জন্যে সব থেকে সুবিধেজনক ছিল। এর একটা কারণ অবশ্যই ভাষা, আর অন্য কারণ, পশ্চিমবঙ্গেই ছড়ানো ছিল তার অস্ত্র ব্যবসার নেটওয়ার্ক এবং মজুতঘর। অবশ্য এখানে এসে একটানা থেকে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ ব্যবসার কাজে তাকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হতো। তার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা পরিচয় গ্রহণ করা যাতে সে মাঝে মাঝে পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারবে এবং তার মজুতঘরের ওপর নজর রাখতে পারবে।

'আর একটা কারণে আসলামের পক্ষে মাঝে মাঝে পশ্চিমবঙ্গে আসাটা দরকার হয়ে পড়েছিল। আগেই বলেছি, আসলামের অস্ত্রগুলো বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকে বনবীথি ইস্কুলে মজুত হতো। এই মজুতঘর থেকে ইদানীং বেশ কিছু অস্ত্র চুরি হয়ে যাচ্ছিল। চোর নিঃসন্দেহে দলের কিছু লোক। কিন্তু গৌরবাবু-বেশি কাদের মল্লিক এই চোরদের হদিশ পাচ্ছিল না। তাই আসলাম খানের নিজের বনবীথিতে ঘন ঘন আসাটা দরকার হয়ে পড়েছিল। এখানে আসার জন্য সে একটা যুৎসই পরিচয় খুঁজছিল। প্রসঙ্গত, এই চোরদেরই কেউ কেউ পরে খুন হয় যে খুনগুলো ভূতের কীর্তি বলে চালানো হয়েছিল। এই খুনগুলো প্রায় সবই বনবীথির সিকিউরিটি গার্ড সফিকুলের কীর্তি। সফিকুল ওদের লোক। আজ বনবীথি রেড করার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। অসম্ভব দৈহিক শক্তির অধিকারী সফিকুল কারাটের চপ মেরে শুধু হাতে মানুষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে।

'আসলাম যখন ভারতে আসার জন্য একটা যুৎসই পরিচয় খুঁজছে তখন ঘটনাচক্রে অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে তার কথা হয়। আসলাম অভিজিৎকে তার খদ্দের হিসেবে চিনত, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে চারপাশের হাল-হকিকত নিয়ে কথাও বলত। নিশ্চয় তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়াও ছিল। ফলে আসলাম এবং অভিজিৎ মিলে আসলামের নতুন পরিচয়টা তৈরি করল। অভিজিৎ জানত কলেজ জীবনে চন্দ্রার একজন প্রেমিক ছিল যে বহুদিন অ্যামেরিকায়। ঠিক হল, আসলাম চন্দ্রার সেই পুরোনো প্রেমিকের পরিচয় নিয়ে ভারতে আসবে। ইতিমধ্যে যদি চন্দ্রাকে কোনওভাবে পুরুলিয়ার নীপবীথি থেকে বসিরহাটের বনবীথিতে নিয়ে আসা যায় তাহলে তাকে দেখতে আসার ছুতোয় আসলামও মাঝে মাঝেই বনবীথিতে আসতে পারবে। আমার ধারণা, এই প্ল্যানটা কার্যকরী করার জন্য আসলাম অভিজিৎকে অনেক টাকা দিয়েছিল।'

পার্থ সান্যালের মুখের অভিব্যক্তি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি যে কারও অভিব্যক্তি বদলে যেতে পারে, না দেখলে আদিত্যর বিশ্বাস হতো না। আপাতত চারজন বন্দুকধারী তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আছে।

'চন্দ্রাকে আপনার বাড়ি থেকে উদ্ধার করার দিন থেকেই জনা কুড়ি আর্মড পুলিশ আপনার ওপর নজর রাখছিল। আপনার কোথাও পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না।' আদিত্য বলল।

'এই লোকটা যতক্ষণ ঘরে থাকবে ততক্ষণ আমরা শান্তিতে বসে আদিত্যর কথা শুনতে পারব না। অ্যারেস্ট হিম অ্যান্ড টেক হিম টু লালবাজার। আইল টক টু হিম লেটার।' গৌতম নির্দেশ দিল।

'লেট মি স্টে হিয়ার অ্যান্ড লিসন টু দিস রিগমারোল। আফটার অল, আমার সম্বন্ধে কী বলা হচ্ছে সেটা জানার অধিকার তো আমার আছে।' পার্থ সান্যাল ঈষৎ ঠাট্টার সুরে বলল।

'না আসলাম ভাই। সে সুযোগ এখানে আপনাকে দেওয়া হবে না। পরে কোর্টে গিয়ে যা জানার জানবেন।' আদিত্য ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল।

গৌরবাবুকে যত সহজে গ্রেফতার করা গিয়েছিল, পার্থ সান্যালের বেলায় ব্যাপারটা ততটা সহজ হল না। পার্থ সান্যাল ওরফে আসলাম খান হাত-পা ছুঁড়ে, আঁচড়ে, কামড়ে যতভাবে সম্ভব গ্রেফতার আটকাবার চেষ্টা করলেন। শেষে যখন গোটা পাঁচেক বলবান পুলিশ তাকে চেপে ধরে হাতকড়া পরাল তখন যুযুধান সব পক্ষই রীতিমত হাঁপাচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয় আসলাম খানের কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

আসলাম খান ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর রত্না বলল, 'বাব্বাঃ। আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এখন খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আদিত্য তুই বাকি গল্পটা তাড়াতাড়ি বল। আমরা আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারছি না।'

'আসলাম-অভিজিতের প্ল্যানটা ঠিকঠাক রূপান্তরিত করার দুটো বাধা ছিল। দুটোই মস্ত বাধা।' আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'এক নম্বর বাধা, চন্দ্রার পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে আসলামের চেহারার খুব একটা মিল নেই। অতএব যারা সেই প্রেমিককে অল্পস্বল্প চিনত তাদের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হলেও চন্দ্রার চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় বাধা, চন্দ্রার আসল পুরোনো প্রেমিক যদি কোনওভাবে জানতে পারে তার পরিচয়টা ব্যবহার করা হচ্ছে, কিংবা পুলিশ যদি আসল পুরোনো প্রেমিকের ছবিটা ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যায় তাহলে সমস্ত প্ল্যানটাই বানচাল হয়ে যাবে। এছাড়াও একটা ছোট সমস্যা ছিল কীভাবে চন্দ্রাকে নীপবীথি থেকে বনবীথিতে চলে আসতে রাজি করানো যায়।

'আমি পুরুলিয়ায় গিয়ে অভিজিৎ সিং সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম সে একজন অসাধারণ উওম্যানাইজার। যে কোনও মেয়েকে সে পটিয়ে ফেলতে পারে। এমনকি চন্দ্রার মতো হাই ব্রাউ ইন্টেলেকচুয়ালও তার প্রেমের ফাঁদে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কিন্তু কোনও মেয়ের প্রতি অভিজিতের নিজের কোনও টান ছিল না। মেয়েদের সে নিজের কাজে ব্যবহার করত। যেমন চন্দ্রার সঙ্গে সে সম্পর্ক রেখেছিল যাতে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করার ছুতোয় সে নিয়মিত নীপবীথিতে এসে অস্ত্র কিনতে পারে। কিন্তু চন্দ্রা যতই তার প্রেমে হাবুডুবু খাক, একজন কুখ্যাত আর্মস ডিলারকে নিজের পুরোনো প্রেমিকের পরিচয়ে আশ্রয় দিতে যে সে রাজি হবে না এটা অভিজিৎ সিং আঁচ করতে পেরেছিল। সে তখন অন্য একটা মতলব করল।

'আসলাম-অভিজিতের এই মতলবটা আমি প্রথম প্রথম কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ একদিন ভাবতে ভাবতে আমি সত্যটা দেখতে পেলাম। সত্যটা হল, চন্দ্রার কাছে আসলামকে কিছুই প্রমাণ করতে হয়নি, কারণ চন্দ্রা গোড়া থেকেই জানত এই ব্যক্তি তার পুরোনো প্রেমিক নয়। যেটা সে জানত না, মানে তাকে জানানো হয়নি, সেটা হল এই নকল প্রেমিক আসলে কুখ্যাত অস্ত্র-ব্যবসায়ী আসলাম খান।'

'তোর হেঁয়ালিটা কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।' রত্না আদিত্যকে সাবধান করার গলায় বলল।

'হেঁয়ালি নয় রে, আসল ব্যাপারটা জলের মতো সহজ। সত্যিটা আমি খানিকটা কল্পনা করতে পেরেছিলাম, যেটুকু ফাঁক-ফোকর ছিল চন্দ্রার কাছ থেকে জেনে ভরাট করে নিয়েছি। আসল গল্পটা হল অভিজিৎ সিং-এর সঙ্গে চন্দ্রার কোনও দিনই ছাড়াছাড়ি হয়নি। আমি পুরুলিয়ায় গিয়ে জানতে পেরেছিলাম অভিজিতের সঙ্গে চন্দ্রার সম্পর্কটা একেবারে হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই ভেঙে গিয়েছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করা শক্ত। নিজের রুমমেট জয়ন্তী ঘোষকে অবশ্য চন্দ্রা বলেছিল তিরিশ জন জওয়ানকে মাওবাদীরা মেরে ফেলেছিল বলে সে মাওবাদীদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাইছিল না। কিন্তু এটা নেহাতই বাজে যুক্তি। মাওবাদীরা ওই প্রথম মানুষ মারল এমন তো নয়।

'যাই হোক, চন্দ্রা যখন পুরুলিয়ায় তখন একদিন অভিজিৎ সিং তাকে এসে বলল, ভাস্কর সেনগুপ্ত বলে একজন বিখ্যাত মাওবাদী তাত্ত্বিক আছেন, তিনি বোমা-বারুদ নিয়ে বিপ্লব করেন না, শুধু তার কথা দিয়ে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁকে পুলিশ পাগলের মতো খুঁজছে। এতদিন তিনি ছত্তিসগড়ে থাকতেন, কিন্তু তার পক্ষে সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। তিনি যদি চন্দ্রার আমেরিকাবাসী পুরনো প্রেমিকের পরিচয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন, চন্দ্রা কি তাঁকে সাহায্য করতে পারবে? অভিজিতের মনে হয়েছিল, 'বিপ্লবের স্বার্থ',

'নিপীড়িত মানুষের স্বার্থ' ইত্যাদি কিছু কড়া সেন্টিমেন্টাল কথা বললে চন্দ্রা রাজি হয়ে যেতে পারে। অভিজিৎ ঠিকই ভেবেছিল, চন্দ্রা রাজি হয়ে গেল।

'আর একটা সমস্যার কথা অভিজিৎ সিং চন্দ্রাকে বলল। সমস্যাটা হচ্ছে, ভাস্কর সেনগুপ্তর পক্ষে ছত্তিসগড়ের মতো পুরুলিয়াও নিরাপদ নয়, যেহেতু মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা বলে পুরুলিয়াও পুলিশের নজরে আছে। তাই ভাস্কর সেনগুপ্তকে আশ্রয় দিতে হলে চন্দ্রাকে পুরুলিয়া ছাড়তে হবে। দুজনে মিলে ঠিক করল, মানে অভিজিৎ সিং-ই ঠিক করল, তারা ওপর ওপর দেখাবে যে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এবং এই ছাড়াছাড়ির ফলে চন্দ্রা এতটাই ভেঙে পড়েছে যে সে আর পুরুলিয়া থাকতে চায় না। আসলামের কথায় রণবীর রায় চন্দ্রাকে বনবীথিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। আসলাম ভাস্কর সেনগুপ্ত সেজে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করল। চন্দ্রাকে অনেকটা অভিনয় করতে হয়েছিল। পার্থকে বিয়ে করা নিয়ে কেয়া বাগচির সঙ্গে তার ঝগড়াটাও অভিনয়। পরে অবশ্য কেয়ার জন্যে তার খারাপ লাগে। সে অনেক কষ্ট করে এক রিক্সাওয়ালার মোবাইল থেকে কেয়াকে মেসেজ করে। তার নিজের মোবাইল তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, অত কষ্ট করে এই পুরোটা সময় সে ভাস্কর সেনগুপ্তকে নয়, আসলে আসলাম খানকে আশ্রয় দিচ্ছিল।

'আর একটা সমস্যা ছিল বিপাশা লাহিড়িকে নিয়ে। তিনি কী করে নকল ভাইকে মেনে নিলেন? আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি বিপাশা লাহিড়ি মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত। চন্দ্রা যতটা যুক্ত তিনি সম্ভবত তার থেকে অনেকটাই বেশি। বস্তুত, তাঁর স্বামীর অকালমৃত্যুর পরে তিনিও অভিজিৎ সিং-এর প্রেমের ফাঁদে পা দেন। কাজেই অভিজিতের কথায় খুব সহজেই তিনি আসলামকে তার ভাই হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। আমার অনুমান, তিনি আসলামের আসল পরিচয়টাও জানতেন। অন্তত এটা নিয়ে সন্দেহ নেই যে, চন্দ্রা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেবার পর তাকে পাহারা দেবার ভারটা বিপাশা লাহিড়ির ওপরেই পড়েছিল।'

বিপাশা লাহিড়ি কথা বলছেন না, শুধু তাঁর চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। যদি সেই আগুন দিয়ে ভস্ম করে দেওয়া যেত, আদিত্যকে তিনি তাই করতেন।

অমিতাভ বলল, 'এটা কিন্তু খুব একটা সমাপতন হয়ে গেল। পার্থ সান্যালের দিদিও নকশাল, এবং শুধু তাই নয় মোস্ট কনভিনিয়ন্টলি তিনিও অভিজিৎ সিং-এর প্রেমে হাবুডুবু? আমার কিন্তু এতটা বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'হবারই কথা।' আদিত্য রহস্য করে বলল, 'কিন্তু বাস্তবে কোনও সমাপতন ঘটেনি। কারণ, আসলে চন্দ্রার পুরোনো প্রেমিক আর বিপাশা লাহিড়ির ভাই সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একমাত্র মিল হল তারা দুজনেই দীর্ঘদিন অ্যামেরিকা প্রবাসী।'

'আমার কিন্তু এবার সত্যিই সব গুলিয়ে যাচ্ছে আদিত্যদা।' নূপুর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'গুলিয়ে যাচ্ছে কারণ আসল ব্যাপারটাই তুমি ধরতে পারনি। আসল কথাটা হল, নাম থেকে শুরু করে পার্থ সান্যাল চরিত্রটার পুরোটাই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ওই নামে কস্মিনকালেও চন্দ্রার কোনও প্রেমিক ছিল না। কলেজে যার সঙ্গে চন্দ্রার সম্পর্ক ছিল তার নাম কৃশানু মুখার্জী। তাকে আমারও খুব আবছা মনে আছে, তবে চন্দ্রার প্রেমিক হিসেবে নয়, নেহাতই একজন সহপাঠী হিসেবে। কৃশানু বহুদিন অ্যামেরিকা প্রবাসী। অপরপক্ষে, বিপাশা লাহিড়ির অ্যামেরিকা প্রবাসী ভাই-এর নাম সুপ্রতিম সান্যাল। বিপাশা লাহিড়ির শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় সকলে জানত তার এক অ্যামেরিকা প্রবাসী ভাই আছে, কিন্তু তাকে কেউ দেখেনি। বিপাশা লাহিড়ি আলাদা করেই মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত এবং পুরোপুরি অভিজিৎ সিং-এর প্রভাবাধীন। তার সঙ্গে কৃশানু বা চন্দ্রার কোনও সম্পর্কই নেই।

'আসলাম খান যদি কৃশানু মুখার্জীর পরিচয়ে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে আসত তাহলে আমি বা পুলিশ নিশ্চয় ইন্টারনেটে কৃশানুর খোঁজ খবর করতাম। ইন্টারনেটে খোঁজ করলে নিশ্চয় কৃশানুর একটা-দুটো ছবি বেরিয়ে পড়ত। তখন হয়ত আমরা আসল কৃশানুর সঙ্গে যোগাযোগও করতাম। আর তাহলেই আসলামদের

মতলবটা ফাঁস হয়ে যেত। তাই আসলাম পার্থ সান্যাল বলে একজন সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তিকে তৈরি করল। সেই ব্যক্তির নামে একটা ওয়েবসাইট খুলল। তাকে একটা কাল্পনিক কন্সাল্টেন্সি ফার্ম-এর মালিক হিসেবে দেখানো হল। তার নামে নকল পাশপোর্ট তৈরি হল। তারপর আসলাম তার পরিচয় গ্রহণ করল। আমি ইন্টারনেটে পার্থ সান্যালকে খুঁজে দেখলাম সবই ঠিকঠাক আছে। নকল পার্থর আইডেন্টিটিটা এস্ট্যাবলিস করার জন্য কিছুদিন চন্দ্রাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার ছিল। যতক্ষণ চন্দ্রা পাশে রয়েছে ততক্ষণ হঠাৎ পুরোনো পরিচিত কেউ সামনে এসে গেলেও আসলাম ঘটনাটা সামলে দিতে পারত। যেন চন্দ্রা সমানে সাক্ষী দিচ্ছে এ-ই আসলে তার পুরোনো প্রেমিক। বলা যায় এটা একটা কন্সট্যান্ট অ্যাশিয়োরেন্স। অন্তত কিছুদিন এই অ্যাশিয়োরেন্সটা নকল পার্থর দরকার ছিল। তাছাড়া চন্দ্রা নকল পার্থকে তার আসল প্রেমিক সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়েছিল যেগুলো জানার ফলে নকল পার্থর কাজ চালিয়ে যেতে অনেক সুবিধে হয়েছিল। আর নকল পার্থর চরিত্রটা আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বিপাশা লাহিড়িও তাঁর ভূমিকা পালন করছিলেন। এটা একটা ফিনিসিং টাচ।

'ইতিমধ্যে চন্দ্রা সেই নিষিদ্ধ ঘর খুলিয়ে সেখানে ক্লাশ নিতে শুরু করেছে। তাই চন্দ্রাকে বনবীথি থেকে সরানো দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে মারা যাবে না, কারণ তার প্রয়োজনীয়তা তখনও ফুরোয়নি। তাই তাকে ভয় দেখানো শুরু হল। দুটো ঘটনার পর চন্দ্রা বেশ ভয় পেয়ে গেল। পার্থ চন্দ্রাকে নিয়ে তার নকল দিদির বাড়িতে রেখে এল। চন্দ্রার ধারণা হল, সে একজন কমরেডের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে যিনি ভাস্কর সেনগুপ্ত-র ব্যাপারটা জানেন। বনবীথি ইস্কুলের সেই নিষিদ্ধ ঘরটা আবার তালাবন্ধ হয়ে গেল।'

'পার্থবাবু কিন্তু মাঝে মাঝেই বনবীথি আসতেন। আপনি যেদিন বনবীথি এলেন তারপরেও পার্থবাবু দুদিন এসেছিলেন।' এবার সোনাদিদির গলা শোনা গেল।

'আমি যেদিন বনবীথি এলাম সেদিন নকল পার্থ আমাকে আগলে আগলে নিয়ে এল। পাছে আমি সেই গোপন দরজাটা আবিষ্কার করে ফেলি। নকল পার্থর নির্দেশে গৌরবাবু মানে কাদের মল্লিক অনেকটা সময় আমাদের আটকে রাখল তার বাড়িতে। আমি ইস্কুলটা ভাল করে দেখার সুযোগই পেলাম না। তবে আমি ছিলাম বলে আসলাম খানেরও কোনও কাজ হল না। ফলে তাকে আবার আসতে হল। কিন্তু কোন ছুতোয় আসবে? চন্দ্রাই তো আর নেই। সে ভান করল তার দামী কলমটা সে বনবীথি ইস্কুলে ফেলে এসেছে। তাই আমাকে কিছু না বলে সে আবার বনবীথিতে ফিরে এল। পেনটা বলাই বাহুল্য সে খুঁজে পেল না। কী করে পাবে? পেন তো তার পকেটেই রয়েছে। এবার সত্যি সত্যি বড়দিদির ঘরে সে তার পেনটা ফেলে এল এবং সেই ছুতোয় আরও একদিন সে বনবীথি ঘুরে গেল। আসলে সে খবর পেয়েছিল পুলিশ বনবীথির দিকে নজর দিয়েছে। যে কোনও দিন রেড হতে পারে। সে ভাবল, রেড হলে পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না ঠিকই কিন্তু তার অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই সে একটু একটু করে সব মালপত্তর অন্য জায়গায় সরিয়ে দিচ্ছিল। ফলে মাঝে মাঝেই বনবীথিতে আসা তার প্রয়োজন হচ্ছিল।'

'তুই নকল পার্থকে সন্দেহ করলি কবে থেকে?' রত্না জিজ্ঞেস করল।

'বলতে পারিস একেবারে প্রথম থেকে। পার্থ আমার নম্বর এবং পেশা কী করে জানল? আমার নম্বর এবং পেশার খবর রাখে মূলত কিছু ক্রিমিনাল। কেন জানি না আমার মনে হল এদেরই কারও কাছ থেকে পার্থ আমার নম্বরটা জেনেছে। তারপর একদিন অ্যাটলান্টা থেকে পার্থ আমাকে ফোন করল। আমি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম ওদের ওখানে এখন কেমন ঠাণ্ডা? বিদেশ থেকে কেউ ফোন করলে এটা, কেন জানি না, লোকের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন। পার্থ, বলাই বাহুল্য, অ্যাটলান্টা থেকে ফোন করছিল না। কিন্তু আমি এরকম একটা প্রশ্ন করতে পারি ভেবে সে নেটে ওখানকার তাপমাত্রাটা দেখে নিয়েছিল। কিন্তু সে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল। সে আমাকে বলেছিল, হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেছে রে, দশ ডিগ্রিতে নেমে গেছে। দশ ডিগ্রি মানে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফ্যারেনহাইট হতে পারে না, কারণ অক্টোবরে অ্যাটলান্টায় অত ঠাণ্ডা পড়ে না। শুনেই আমার খটকা লাগল। অ্যামেরিকার বাসিন্দারা তো সেলসিয়াসে টেম্পারেচার মাপে না,

ফ্যারেনহাইটে মাপে। পার্থর বলা উচিত ছিল হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেছে রে, পঞ্চাশ ডিগ্রিতে নেমে গেছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে এই সত্যটা আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। সেদিন থেকে পার্থর ওপর আমার সন্দেহটা গাঢ় হল। তারপর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানলাম চন্দ্রাদের সঙ্গে পার্থ সান্যাল বলে কেউ পড়তই না। এইটুকু রিস্ক আসলাম নিয়েছিল। সে ভেবেছিল ইন্টারনেটেই তার খোঁজ করা হবে। কলেজে গিয়ে কেউ তার খোঁজ করবে এই সম্ভবনাটা সে তার হিসেবের মধ্যে আনেনি। হয়ত ভেবেছিল, কলেজে গিয়ে কেউ তার খোঁজ করার আগেই সে কাজ শেষ করে চিরতরে গা ঢাকা দেবে। এসব কাজে একটু রিস্ক নিতেই হয়।'

'একটা জিনিস কিন্তু বুঝলাম না। আসলাম খান তোকে হঠাৎ কন্ট্যাক্ট করল কেন? বেশ তো সে চুপি চুপি নিজের কাজ সেরে কেটে পড়তে পারত। বসিরহাটের পুলিশও তো তার হাতের মুঠোয় ছিল। সে তোকে এর মধ্যে জড়াতে গেল কেন?' অমিতাভ জিজ্ঞেস করল।

'আসলাম আমাকে কিছুতেই কন্ট্যাক্ট করত না। বসিরহাটের পুলিশ চন্দ্রার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা লালাবাজারকে জানায়নি। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু চন্দ্রার বন্ধু কেয়া বাগচি তার চেনাশোনা কাজে লাগিয়ে একেবারে লালবাজারে গিয়ে ব্যাপারটা জানায়। যেহেতু চন্দ্রার ওপর আগে থেকেই পুলিশের নজর ছিল, তাই লালবাজার ব্যাপারটা ফেলে রাখেনি। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের একটা টিম বনবীথিতে ইন্সপেকশনে গেল। ফলে চন্দ্রার অন্তর্ধান নিয়ে একটা সত্যিকারের ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে যায়। এই অবস্থায় আসলামের মনে হয় সে যে নির্দোষ সেটা ভাল করে প্রমাণ করা দরকার। তাই সে আমার কাছে আসে। কেয়া লালবাজারে গিয়ে ব্যাপারটা নাড়াচাড়া না করলে আসলাম আমার কাছে আসত না।'

'অভিজিৎ সিং এখন কোথায় আছে?' অভীক চৌধুরি প্রশ্ন করলেন।

'সম্ভবত ছত্তিসগড়ে। পুলিশ এখনও তাকে ধরতে পারেনি, তবে তার দলটা একেবারে ভেঙে গেছে।' গৌতম উত্তর দিল।

'এখানে আমার একটা অনুমান আছে।' আদিত্য বলল। 'আমার মনে হয় আসলাম খান চাইছিল অভিজিৎ সিং পুলিশ এনকাউন্টারে মারা যাক। তাহলে তার আসল পরিচয়টা আর কেউ জানতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে আসলামের লোক, হয়ত কাদের মল্লিক নিজে, বিজয় মাহাতো এবং তরুণ মির্ধাকে মোটা টাকা দিয়ে বলেছিল তারা যেন অভিজিতের গতিবিধির খবর পুলিশকে দেয় যাতে পুলিশ অভিজিৎ সমেত দলের সদস্যদের খতম করে দিতে পারে। এছাড়া ওই অঞ্চলে পুলিশের হঠাৎ সাফল্যের আর কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এটাও মনে রাখতে হবে যে ওই দুজন ইনফর্মার পুরুলিয়ায় আমার সঙ্গে দেখা করেনি। হয়ত তাদের মনে পাপ ছিল বলেই তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি।'

ঘরে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সকলেই চিন্তায় ডুবে আছে। কিছু পরে নীরবতা ভেঙে চন্দ্রা বলল, 'একটা প্রশ্নের কিন্তু উত্তর পেলাম না। গৌরবাবু কেন পায়রাডাঙা গিয়েছিলেন?'

'এটাই এই রহস্যের শেষ ধাপ। এটা পেরতে পারলেই সমস্ত প্রহেলিকার সমাধান হয়ে যাবে। উত্তরটা প্রথমে ছোট করে দিয়ে দিই। গৌরবাবু বা কাদের মল্লিক নকল পার্থ বা আসলাম খানের নির্দেশে পায়রাডাঙা গিয়েছিলেন তোকে খুন করতে।' আদিত্য বলল।

'এই তো বললি চন্দ্রাকে ওরা খুন করতে চায়নি। আবার এখন বলছিস চন্দ্রাকে খুন করার জন্যে আসলাম কাদের মল্লিককে ডেকে পাঠিয়েছিল। আবার সব গুলিয়ে দিচ্ছিস।' এবার রত্নার গলা।

'আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। তাহলেই বুঝতে পারবি। আমার অনুমান পায়রাডাঙায় থাকতে থাকতে চন্দ্রার মনে হতে লাগল এই লোকটা ভাস্কর সেনগুপ্ত হতেই পারে না। হয়ত নকল পার্থর সঙ্গে কথা বলে চন্দ্রার সন্দেহ হয়েছিল। চন্দ্রা, ভুল বললে আমায় শুধরে দিবি।'

'না, না। তুই একেবারে ঠিক বলছিস। আমি ভাস্কর সেনগুপ্ত ভেবে যতবার লোকটার সঙ্গে বামপন্থা নিয়ে কোনও থিওরেটিকাল আলোচনা করতে গেছি, ততবার সে আমাকে এড়িয়ে গেছে। তাছাড়া, আমার প্রতি

মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমি একটা জেলখানায় বন্দী রয়েছি। স্বাধীনভাবে কিছু করার কোনও অধিকার আমার নেই। পুলিশ, সলিসিটর, বন্ধু সকলের সঙ্গে কথা বলা বারণ। মোবাইলটাও সঙ্গে রাখতে দেয়নি। অতি কষ্টে এক রিক্সাওলার মোবাইল থেকে আমি কেয়াকে একটা মেসেজ করেছিলাম। আশা করছিলাম নম্বরটা থেকে পুলিশ আমার লোকেশানটা ট্রেস করতে পারবে। বলাই বাহুল্য, এটা নকল পার্থকে এবং দিদিকে লুকিয়ে করতে হয়েছিল।'

'চন্দ্রার যে আস্তে আস্তে সন্দেহ বাড়ছে এটা নকল পার্থও বুঝতে পেরেছিল। সে ভেবে দেখল, তার ফেক আইডেন্টিটিটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যদি বাইরের কোনও লোক এসে চন্দ্রাকে মেরে যায় তাহলে কোনও ক্ষতি নেই। পুলিশকে সে বলতে পারবে চন্দ্রার সেফটির জন্যই সে চন্দ্রাকে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। এই ভেবে সে কাদের মল্লিককে বলল কালীপুজোর রাত্তিরে সে এসে যেন বাইরে থেকে চন্দ্রাকে গুলি করে। এটা তখনই করতে হবে যখন চন্দ্রা বাচ্চাটার সঙ্গে বাগানে বাজি পোড়াতে যাবে। বাগানের চারদিকে পাঁচিল আছে। কিন্তু বাইরে কোনও গাছের ওপর উঠলে বাগানের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়।'

'তারপর কী হল?' চন্দ্রা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল।

'বাগান সংলগ্ন একটা নিমগাছে উঠে কাদের মল্লিক যখন বন্দুক বার করে তোদের জন্য অপেক্ষা করছে তখন জানি না কীভাবে পাড়ার কয়েকজন তাকে দেখতে পেয়ে যায়। ফলে কাদের মল্লিককে তাড়াহুড়ো করে পালাতে হয়। বন্দুকটা সে গাছের কোটরে রেখে আসে। ইচ্ছে ছিল পরের দিন গিয়ে তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে। দুর্ভাগ্যবশত, ফেরার পথে তার অ্যাক্সিডেন্ট হল। ফলে তার আর ফেরা হয়নি। বন্দুকটা পুলিশ পরে উদ্ধার করেছে।

'কী করে ফেরা হবে? মাথার ওপর ঠাকুর তো আছেন।' এই প্রথম ছোড়দিদির গলার আওয়াজ শোনা গেল। সকলে ভুলেই গিয়েছিল তিনি ঘরের মধ্যে আছেন।

'একটা ধাঁধার কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। আমরা জানতে পারলাম না কে গৌরবাবুকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন লাইনে ফেলে দিয়েছিল।' গৌতম বলল।

'সব প্রশ্নের কী আর উত্তর পাওয়া যায়? কিছু রহস্য রহস্যই থেকে যায়।' আদিত্য দার্শনিকের গলায় বলল।

আরও ঘন্টাখানেক পরে যখন সকলে বাড়ি ফিরছে, আদিত্য নূপুরকে বলল, 'আমার আপিসে একবার দেখা কোরো।'

(৪)

পরদিন ভোর ছটা নাগাদ টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল আদিত্যর। ঘুমচোখে দেখল মোবাইলে কেয়া বাগচির নামটা ফুটে উঠেছে। আদিত্য ঠিক করল এখন ফোনটা ধরবে না। আর একটু ঘুমিয়ে নিয়ে পরে কেয়াকে ফোন করবে। ফোনটা বাজতে বাজতে এক সময় থেমে গেল। আদিত্য ফোনটাকে সাইলেন্ট মোডে দিয়ে পাশ ফিরতে ফিরতে টের পেল ফোনটা ভাইব্রেট করছে। সাড়ে আটটা নাগাদ চা-বিস্কুট খেয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে আদিত্য দেখল কেয়া বাগচি পাঁচটা মিসড কল করেছে। সে কেয়া বাগচির নম্বরটা ক্লিক করল।

'আপনাকে সকালে ফোন করেছিলাম। বোধহয় ফোনটা সাইলেন্ট মোডে ছিল। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে?' কেয়া বাগচির গলাটা একটু লাজুক শোনাল।

'বিবাদী বাগের কাছে আমার একটা আপিস আছে। ওখানে কি আসতে পারবেন?' আদিত্য সাবধানি গলায় বলল।

'না, না, অফিসে নয়। কাল শনিবারে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন?' কেয়ার গলাটা আগের থেকে সাহসী।

'আপনার সঙ্গে লাঞ্চ? সে তো খুব ভাল প্রস্তাব। অবশ্যই যাব। কখন? কোথায়?'

'আপনাকে কলেজ স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধীর মোড় থেকে তুলে নেব। আমি বাগবাজারের দিক থেকে আসব। আপনি সাড়ে বারোটার মধ্যে পাতিরামের সামনে আসতে পারবেন? আমি একটা উবার নিয়ে চলে আসব।'

'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করব।'

ফোনটা রেখে দেবার পর আদিত্য কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলস্য করল। ভাবল, আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। অনেক কাজ করেছে। একটা দিন সে বিশ্রাম নিতেই পারে। এইসব ভেবে সে আবার একচোট ঘুমিয়ে নেবার ফন্দি করছে এমন সময় আবার ফোনটা বেজে উঠল। এবার নূপুর মণ্ডল।

'আদিত্যদা, আজ কি তুমি অফিসে আসছ? এলে দেখা করতাম।'

'সামনের সপ্তাহে হয় না? আজ ভাবছিলাম আর আপিস যাব না।'

'আসলে আমি ব্যাঙ্গালোরে একটা চাকরি পেয়েছি। ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জয়েন করতে বলছে। ভাবছিলাম, সামনের সোম কি মঙ্গলবার চলে যাব। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে তো যেতে পারি না। তাই আজ যদি একটু সময় দাও খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। তুমি বারোটা নাগাদ চলে এস।'

আদিত্য ফোন রেখে বাথরুমে ঢুকল। বিশ্রাম তার কপালে নেই।

নূপুরের আসতে আসতে প্রায় সোয়া বারোটা হয়ে গেল। আদিত্য বারোটার আগেই আপিসে পৌঁছে গেছে।

'তুমি আমার কাছে কিছু টাকা পাবে।' একটু পরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল। সে একটা চেক এগিয়ে দিল নূপুরের দিকে। বলল, 'দেখে নাও তোমার নামের বানানটা ঠিক লিখেছি কিনা।'

'আচ্ছা আদিত্যদা, একটা কথা বলো। তোমার মক্কেলটাই তো ভুয়ো। তার টাকা কি আমার নেওয়া উচিত?' নূপুর চেকটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমার মক্কেল তো তোমাকে নিয়োগ করেনি। তোমাকে নিয়োগ করেছিলাম আমি। আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার অসুবিধে কোথায়?'

'আদিত্যদা, টাকাটা তুমি দিচ্ছ কোথা থেকে?' টাকাটা নিতে নূপুর এখনও ইতস্তত করছে।

'শোনো। টাকাটা নিতে তোমার কোনো নৈতিক সমস্যা থাকার কারণ নেই। যে টাকাটা তোমাকে দিচ্ছি সেটা আমার টাকা। আসলাম খানের কাছ থেকে আমি যে টাকাটা পেয়েছিলাম সেটা ফেরত দিয়ে দেব। কীভাবে ফেরত দেব সেটা অবশ্য জানতে হবে।'

'তাহলে এটা তো তোমার পকেট থেকে গেল। এটা আমি নেব না।' নূপুর চেকটা আদিত্যর দিকে বাড়িয়ে দিল।

'নূপুর, তুমি কিন্তু ভীষণ পাকামি করছ। চেকটা এক্ষুনি ব্যাগে পুরে নাও। নাহলে তোমার আসল গল্পটা পুলিশকে বলে দেব। জানতে পারলে পুলিশ কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না।' আদিত্য মিটিমিটি হাসছে।

বাধ্য মেয়ের মতো নূপুর মণ্ডল চেকটা ব্যাগে পুরে নিল। তার মুখের অভিব্যক্তিটা একেবারে পালটে গেছে। সে বলল, 'তুমি জান আসল গল্পটা? কী করে জানলে?'

'এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি যে কালীপুজোর রাত্তিরে তোমার জন্যেই কাদের মল্লিক চন্দ্রাকে গুলি করতে পারেনি। আর ফেরার পথে তুমিই কাদের মল্লিককে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন লাইনের ওপর ফেলে দিয়েছিলে। এর বেশি জানি না। ডিটেলটা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমি ঠিক বলছি তো?'

নূপুর উত্তর দিল না। সে মাথা নিচু করে নিজের আঙুল নিয়ে খেলছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বলল, 'আমিও তোমাকে গল্পটা বলতে চাই। কেন আমি লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম সেটাও বলব। তোমার কথা মতো গৌরবাবুকে আমি চোখে চোখে রাখছিলাম। তখন অবশ্য জানতাম না তার নাম কাদের মল্লিক। যাই হোক আমি ধরে নিয়েছিলাম গৌরবাবুর ওপর খারাপ লোকেদের নজর আছে। তাই তাকে আগলে

আগলে রাখতে হবে। কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝলাম গৌরবাবু লোকটাই গোলমেলে। রাত্তিরবেলা নানারকমের সন্দেহজনক লোকেদের সঙ্গে সে নদীর ধারে দেখা করত। বুঝলাম, তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে যাতে সে কোনও দুষ্কর্ম না করে। রাত্তিরে ইস্কুলের পেছন দিকে লরি এসে দাঁড়াত। লরিতে বস্তায় করে মাল তোলা হত। গৌরবাবু আর সফিকুলদা তার তদারকি করত। কালীপুজোর দিন কলকাতায় গিয়ে আমি এগুলো সব তোমাকে বলব ভেবেছিলাম কিন্তু সেটা হয়ে উঠল না। কালীপুজোর দিন দুপুরে গৌরবাবু বনবীথি থেকে বেরলেন। বেরিয়ে স্টেশনে যাবার অটো ধরলেন। আমি আর একটা অটোতে ওর পিছু নিলাম। উনি আমাকে চিনতে পারছিলেন না কারণ আমি বোরখা পরে ছিলাম। এটাও অবশ্য তোমার কাছ থেকেই শেখা। টিকিট কাউন্টারে ওর পেছনে দাঁড়ালাম। শুনলাম উনি পায়রাডাঙার টিকিট চাইছেন। আমিও পায়রাডাঙার একটা টিকিট কাটলাম। শেয়ালদা স্টেশনে নেমে আমি তোমাকে ফোন করলাম। গৌরবাবু সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা জানালাম। তাকে ফলো করে যে শেয়ালদা অব্দি এসেছি সেটাও বললাম। গৌরবাবু পায়রাডাঙার টিকিট কেটেছেন শুনে তুমি আমাকেও পায়রাডাঙা যেতে বললে। তুমি বললে তোমার মনে হয় উনি লাহিড়িদের বাড়ি যাবেন। তাই আমাকে সোজা লাহিড়িদের বাড়ি গিয়ে তার আশেপাশে লুকিয়ে থাকতে বললে। এই অব্দি গল্পটা তোমার জানা। আমি এর পর কী হল বলছি।'

'সেটাই তো শুনতে চাই।'

'আমার ভাগ্য ভাল গৌরবাবু পায়রাডাঙা স্টেশনে নেমে রিক্সায় না উঠে টোটোর লাইনে দাঁড়ালেন। মনে হল পাছে রিক্সাওলা ওঁর চেহারাটা পরে আইডেন্টিফাই করে ফেলে সেই ভয়ে উনি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে চাইছেন। আমার এতে খুব সুবিধে হল। আমি রিক্সা ধরে অনেক আগেই লাহিড়িদের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। তখন অন্ধকার নেমে আসছে। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা ঢিপির ওপর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। খানিক বাদে দেখি গৌরবাবু খুব সাবধানে লাহিড়িদের বাড়ির দিকে আসছেন। বাড়ির কাছে এসে উনি একটা নিমগাছে চড়লেন। দু-পা দুদিকে দিয়ে একটা মোটা ডালের ওপর বসলেন, যেভাবে লোকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়। অন্ধকার নেমে আসার জন্য আমি আমার লুকোনো জায়গা থেকে লাহিড়িদের বাড়ির ভেতরটা ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু রাস্তায় আলো জ্বলছিল বলে গাছের ওপর বসা গৌরবাবুকে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু পরে গৌরবাবু রিভলভর বার করলেন। মনে হল ওটা ওঁর কোমরে গোঁজা ছিল। রিভলভর হাতে নিয়ে গৌরবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমাকে ভীষণ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল। মনে হল আমি পিঁপড়ের ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। পিঁপড়ের কামড় সহ্য করে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা সময়ে লাহিড়িদের বাড়ির ভেতর বাজি পোড়ানো শুরু হল। বাজির আলোয় এবার বাড়ির ভেতরটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। একটি মেয়ে একজন বাচ্চাকে নিয়ে বাজি পোড়াচ্ছে। বাচ্চাটা একবার বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম গৌরবাবু মেয়েটির দিকে তাক করে বন্দুক তুলেছেন। আমি 'চোর চোর' বলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলাম। আমার চিৎকারে পাশের বাড়ি থেকে লোক বেরিয়ে এল। লাহিড়িদের বাড়িতে যে মেয়েটি বাচ্চার সঙ্গে বাজি পোড়াচ্ছিল সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বেগতিক দেখে গৌরবাবু গাছ থেকে নেমে উল্টোদিকের একটা গলিতে গা ঢাকা দিলেন। ততক্ষণে আশেপাশের বাড়ি থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এসেছে। দেখলাম গৌরবাবু সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে স্টেশনের পথ ধরলাম।'

'এই অব্দি তো ভালই বোঝা গেল। প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি শেয়ালদা স্টেশনে গৌরবাবুকে দেখে তাকে ধাক্কা মারলে কেন?'

নূপুর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর যখন কথা বলতে শুরু করল তখন তার গলার স্বর একেবারে পালটে গেছে। সে ঘোলাটে গলায় বলল, আদিত্যদা, তুমি যখন এতই জান, তখন এটাও নিশ্চয় খবর নিয়ে জেনেছ যে আমার ছোটবেলায় আমার বাবা আমার মাকে খুন করেছিল। সেই থেকে আমার একটা অসুখ হয়েছে। যদি কোথাও দেখি কোনও পুরুষ কোনও মহিলার গায়ে হাত তুলছে, আমার মাথায় খুন চেপে যায়।

তোমার কাছে স্বীকার করছি, ওই লোকটাকে আমি মেরেই ফেলতে চেয়েছিলাম। নেহাত কপালজোরে ও বেঁচে গেছে।' নূপুর মণ্ডলের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

(৫)

'আপনার কাছে আমার অনেক অনেক ঋণ। আপনি চন্দ্রাকে বাঁচিয়েছেন। আপনি না থাকলে মেয়েটা মরেই যেত।' কেয়া বাগচি কফির কাপে চুমুক দিল।

একটু আগে পার্ক স্ট্রিটের একটা বনেদি চিনে রেস্তোঁরায় মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত করে তারা এখন যেখানে কফি খেতে এসেছে সেখানকার কেক-পেস্ট্রি বিখ্যাত। রোববারের সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য এখানে লম্বা লাইন পড়ে। এই শনিবারের দুপুরে অবশ্য রেস্তোঁরা প্রায় ফাঁকা। মিষ্টি ছাড়া কেয়া বাগচি ভোজন সমাপ্তির কথা ভাবতেই পারে না। তাই এখানে আসা। ব্ল্যাক ফরেস্টের পর কফি। আদিত্য অবশ্য দার্জিলিং চা খাচ্ছিল।

'বললে বিশ্বাস করবেন না, এখন চন্দ্রাই আমার একমাত্র বন্ধু।' কেয়া বাগচি আবার কফির কাপে চুমুক দিল।

'সে কী? ফেসবুকে আপনার বন্ধুর সংখ্যা তো দেখলাম গিনিস বুকে ওঠার মতো।' আদিত্য অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল।

'না, না। তারা কেউ বন্ধু নয়, পরিচিত মাত্র। আগে অনেকে বন্ধু ছিল। এখন সংসারে জড়িয়ে পড়েছে। যোগাযোগই রাখে না। আমি তাদের দোষ দিই না।'

'সেদিক থেকে দেখলে অবশ্য চন্দ্রার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কারণটা বোঝা যায়। আপনাদের দুজনের কেউই সংসার করেননি।'

'আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ব্যাপারেই আলাদা। আমি বেশি কথা বলি, চন্দ্রা চুপচাপ। আমি সিনেমা পত্রিকা আর ফিজিক্সের পাঠ্যবই ছাড়া কিচ্ছু পড়ি না, চন্দ্রা নানা কিছু পড়ে—ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, পপুলার সায়েন্স। আমি সাজগোজ করতে ভালবাসি, চন্দ্রা একটা হালকা লিপস্টিক পর্যন্ত লাগায় না।'

'সেটাই আমার আশ্চর্য লাগে। চন্দ্রা না হয় ছোট বয়েস থেকেই ইন্টেলেকচুয়াল। কিন্তু আপনাকে দেখে তো একেবারে স্বাভাবিক মনে হয়। আপনি সংসার করেননি কেন?'

'ইন্টেলেকচুয়ালরা বুঝি স্বাভাবিক হয় না?' আদিত্যর মনে হল কেয়া বাগচি তার প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছে। আদিত্য আর ওই প্রসঙ্গে না গিয়ে চুপ করে রইল।

একটু পরে কেয়া বাগচি নিজে থেকেই বলল, 'সংসার শুরু করার একটা সময় থাকে। কোনও কারণে সেই সময়টা পেরিয়ে গেলে আর ওটা হয়ে ওঠে না। তখন কোনও কমিটমেন্টে যেতে ভয় করে। আপনার তো ব্যাপারটা জানা উচিত। আপনিও তো সংসার করেননি।'

আদিত্য মনে হল কথাটা মিথ্যে নয়। সে মুখে বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার চাল নেই চুলো নেই। আয়ের স্থিরতা নেই।'

'তাহলে গার্গীকে আপনার বন্ধু রত্না কেন বলেছিল আপনি পাগলের মতো আমার প্রেমে পড়ে গেছেন?' কেয়া বাগচি সরাসরি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বুলেটের মতো প্রশ্ন করল। সে মিটিমিটি হাসছে।

আদিত্য বিপাকে পড়েছে। সে আমতা আমতা করে বলল, 'আসলে ওরকম কিছু না বললে রত্না তাড়াতাড়ি আপনার খবরটা এনে দিত না। অথচ আপনি কেন বিয়ে করেননি এটা জানা তদন্তের স্বার্থে আমার একান্তই দরকার ছিল। আমি ভাবছিলাম, হয়ত আপনার কোনও বন্ধু আছেন যিনি সামনে আসেন না। আর যদি তাই হয়, কেন সামনে আসেন না? তিনি মাওবাদী দলটার সঙ্গে যুক্ত নন তো? চন্দ্রার অন্তর্ধানের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই তো? সত্যি বলতে কি, কোনও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আপনি যুক্ত আছেন এটা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই গার্গী যখন জানাল সে আপনার বন্ধুকে অনেকবার দেখেছে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

'তাহলে কি ধরে নেব শুধু তদন্তের স্বার্থে নয় অন্য কোনও কারণেও আপনি আমার অতীতটা জানতে চেয়েছিলেন?' কেয়া বাগচি প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

আদিত্য কেয়ার দিকে তাকাল। কেয়া আজ খুব সেজেছে। লাল শাড়ি। কপালে বড় লাল টিপ। কিন্তু পারফিউমটা বদলাল কেন? আদিত্যর মনে হল, বড় দেরি হয়ে গেছে। সে মুখে বলল, 'আপনি তো প্রথম দিনই বলেছিলেন আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম। বন্ধুর জন্যে বন্ধুর কষ্ট হবে না?'

মাস তিনেক পরের কথা। আদিত্যকে দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন করেছিল চন্দ্রা। খাওয়ার পরে সে আর আদিত্য চন্দ্রাদের দোতলার মস্ত বারান্দায় বসে গল্প করছিল। এখন আলিপুরের বাড়িতে চন্দ্রা একাই থাকে। তার সৎমা কমলিকা সেন পাকাপাকিভাবে হাজারিবাগ চলে গেছেন। চন্দ্রা তাঁকে অনেকবার থাকতে বলেছিল। বলেছিল, আইনত এই বাড়িতে সারা জীবন থাকার অধিকার তাঁর আছে। তিনি রাজি হননি। আলিপুরের বাড়ির একতলায় চন্দ্রা গরিব মেয়েদের জন্য একটা ইস্কুল খুলেছে। তাদের সে ইংরেজি আর অঙ্ক শেখায়। চেতলা এবং মোমিনপুরের বস্তি থেকে অনেক ছোট ছোট মেয়ে চন্দ্রার ইস্কুলে পড়তে আসে।

আদিত্য বলছিল, 'তুই রাজসাক্ষী হতে রাজি থাকলে পুলিশ তোর বিরুদ্ধে কোনও কেস আনবে বলে মনে হচ্ছে না। গৌতম অন্তত আমাকে তাই বলল। তোর মাথা থেকে অভিজিৎ সিং-এর ভূত নেমেছে? বিপ্লবের ভূত?'

চন্দ্রা মাথা নিচু করে রইল, উত্তর দিল না। চন্দ্রার অস্বস্তি দেখে আদিত্য প্রসঙ্গ পালটাল। জিজ্ঞেস করল, 'এতদিন পরে কলকাতায় সেটল করে তোর কেমন লাগছে?'

'প্রথম একমাস তো নস্টালজিয়ার সমুদ্রে ডুবে ছিলাম।' চন্দ্রা এতক্ষণে কথা বলল। 'টেরই পেলাম না কোথা দিয়ে একমাস কেটে গেছে। এখন একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছি। আর যত ধাতস্থ হচ্ছি তত মনে হচ্ছে একটা ভালগার আরামে অভ্যস্থ হয়ে যাচ্ছি। তাই নিয়ে মনে পাপবোধের শেষ নেই। এসব নিয়ে বেশি না ভাবার চেষ্টা করছি।'

'করছিস কী এখন? সময় কাটাস কী করে?'

'কী করছি? অ্যানারকিস্টদের লেখা পড়ছি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজ পড়ছি। গান্ধী পড়ছি। থারো পড়ছি। প্রপোটকিন পড়ছি। নিজের মতো করে একটা রাস্তা হাতড়ে হাতড়ে বার করার চেষ্টা করছি। ভায়োলেন্স-এ বিশ্বাস চলে গেছে। এখন সমাজতন্ত্রেও আর তেমন বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিমানুষকে বাদ দিয়ে যে কিছু হয় না, এই বিশ্বাসটা ক্রমশ মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে।'

'চন্দ্রা, তুই আর বদলালি না। সেই কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে যেমন আঁতেল ছিলি তেমনই রয়ে গেলি। জানিস তো আঁতেল মেয়েদের বিয়ে হয় না।' আদিত্য আবহাওয়াটা লঘু করে দিতে চাইল।

'বিয়ে আর আমার হল কই? আরে, বিয়ের কথায় মনে পড়ল। আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি। অ্যামেরিকা থেকে কৃশানু মুখার্জী, মানে আসল কৃশানু মুখার্জী, বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল। বলল, তোর সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'এটা আসল কী করে বুঝলি? আগেরটার মতো নকলও তো হতে পারে।'

'আরে না, না। এটা একেবারে আসল কৃশানু। আমি কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি। ঠিক আগের মতোই ম্যাদামারা আছে। মুখে গদগদ প্রেম। তোমাকে ছাড়া কী করে এতদিন কাটালাম ঈশ্বরই জানেন। এবার আমাদের আর কেউ আলাদা করতে পারবে না। এইসব ন্যাকা ন্যাকা কথা। জানিস তো ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে। কিন্তু যেই বললাম দেশে ফিরে এস, অমনি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, এতদিন এখানে আছি, অ্যামেরিকা ছেড়ে কোথায় যাব? এত দুর্বল লোককে বিয়ে করা যায়?'

চন্দ্রা বড়বড় চোখে আদিত্যর দিকে তাকাল। আদিত্যর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে হঠাৎ বলল, 'সেইজন্যেই তো অভিজিতের মতো শক্তপোক্ত লোকের সঙ্গে ঝুলে পড়তে চেয়েছিলাম।'

চন্দ্রা মিটিমিটি হাসছে। চন্দ্রাকে এত প্রগলভ আদিত্য আগে কখনও দেখেনি। আদিত্যও মুচকি হেসে বলল, 'ইন্টেলেকচুয়াল মেয়েরা একটু রাগেড পুরুষদের পছন্দ করে। দেখা যাচ্ছে, তুইও এক্সেপশান নোস।'

'অভিজিতের কোন খবর পাওয়া গেল?'

'এখন অব্দি পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। তবে আমি যতদূর জানি, পুরোদমে চেষ্টা চলছে।'

হঠাৎ চন্দ্রার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। যেন দরকারি কিছু মনে পড়েছে এমন মুখ করে সে বলল, 'বাজে লোকের কথা ছাড়। একটা বিশেষ কারণে তোকে খেতে ডেকেছিলাম। তোকে একটা জিনিস দেবার আছে। তুই কিন্তু না বলতে পারবি না।'

চন্দ্রা ঘরের ভেতর উঠে গিয়ে টেবিলে বসল। একটু পরে ফিরে এল একটা চেক নিয়ে। আদিত্যর হাতে চেকটা দিয়ে বলল, 'এটা তোর প্রফেশানাল ফি। তুই আমার জন্যে যা করেছিস তাতে এর থেকে অনেক বেশিই বোধহয় আমার দেওয়া উচিত ছিল।'

আদিত্য দেখল টাকার অঙ্কটা বিশাল। তদন্তের খরচ-টরচ বাদ দিয়েও এই টাকায় তার বছর খানেক চলে যাবে। সে গম্ভীর মুখে বলল, 'থ্যাঙ্কস চন্দ্রা। থ্যাঙ্কস আ লট। টাকা নিতে না বলব কেন? না বলার বিলাসিতাটা কি আমি অ্যাফোর্ড করতে পারি? তাছাড়া এটা তো সত্যি যে আমি তোকে ঘোর বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি।' আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'টাকাটা পেয়ে আমার খুব উপকার হল রে।'

পরে চেকটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে সে স্বগতোক্তি করল, 'গোয়েন্দা ব্যবসার যা অবস্থা চলছিল তাতে ভাবছিলাম গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে আলুর ব্যবসা করব। এখন মনে হচ্ছে আলুর ব্যবসার আইডিয়াটা কিছুদিন স্থগিত রাখা যায়।'

সন্ধেবেলা চন্দ্রার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিনিবাস ধরার জন্যে আদিত্য যখন স্টেট ব্যাঙ্ক মোড়ের দিকে এগোচ্ছে তখন তার মনটা খুব ফুরফুরে লাগছিল। হাতে অনেক কাজ রয়েছে। কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে চেকটা জমা দিতে হবে, বিমলকে আরও কিছু টাকা দিতে হবে, বলরামের ছেলের জন্যে পাঁচটা ইংরেজি এসে আর গোটা পঞ্চাশ ইংরেজি বাক্য রচনা লিখে দিতে হবে। এক ঝলক উত্তরের হাওয়া এসে আদিত্যর মুখে লাগছে। চলে যাবার আগে শীত আদর করছে তাকে। আদিত্য টের পেল, সে বেশ আছে।